বাংলা লোককাহিনীতে বাঙালি সংস্কৃতি

মোঃ ফয়েজ আলম

M.Phil.

RB
B
398.2 DU
ALB

Dhaka University Institutional Repository

M.Phil.

384755

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মো: ফয়েজ আলম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার তত্ত্বাবধানে, "বাংলা লোককাহিনীতে বাঙালি সংস্কৃতি" শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করছেন। এম. ফিল. গবেষক হিসাবে তার রেজিস্ট্রেশন নম্বর- ৫২/৯৪-৯৫. যোগদানের তারিখ ২৩. ০৭. ১৯৯৬।

তার এই অভিসন্দর্ভ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি এবং এ অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

২৩. ১১. ২০০১

(আবুল কাসেম ফজলুল হক)
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
এবং
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা লোককাহিনীতে বাঙালি সংস্কৃতি

মোঃ ফয়েজ আলম

384755

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
নভেম্বর ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান অভিন্দর্ভটি রচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে অনেকের সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করেছি। বইপত্রের জন্য বা পরামর্শের জন্য অনেকের কাছে যেতে হয়েছে। কেউ কেউ উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ করার প্রয়োজনীয় ধৈর্য্য ও আত্মবিশ্বাস যোগাতে সহায়তা করেছেন। তাঁদের কাছে আমি ঋণী।

অভিসন্দর্ভ রচনার কাজে আমি যাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি ঋণী তিনি আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। ১৯৯৬ সালের জুলাইয়ে তার তত্ত্বাবধানে এম. ফিল. গবেষণায় যোগদান করার পর থেকে দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবত তিনি পরিপূর্ণ ধৈর্যসহকারে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা, মতামত ও তথ্য দিয়েআমার দ্বারা বর্তমান অভিসন্দর্ভটির রচনা সম্ভব করে তুলেছেন। অভিন্দর্ভের খসড়া তৈরি হওয়ার পর তিনি তার সমালোচনা করেছেন, বিভিন্ন তথ্যের অভাব নির্দেশ করেছেন, উল্লেখ করেছেন সংশ্লিষ্ট বিসয়সমুহ সম্পর্কে প্রচলিত ভিন্ন মত ও মতবাদ। ফলে পুরো রচনাটি পড়ে ও বার বার যাচাই করে প্রয়োজনীয় সংশোধন-সংযোজন করার সুযোগ হয়েছে আমার। এই পাঁচ বছরে তার কাছে আমার যতটা ঋণ জমে উঠেছে তা পরিশোধযোগ্য নয়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষক জনাব ওবায়েদ জায়গীরদার আমাকে শুরু থেকেই উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটি ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন; বিভিন্ন সময়ে আমার গবেষণার প্রয়োজনেও কিছু বইপত্র কিনে তাঁর গ্রন্থাগারের সংগ্রহ বাড়িয়েছেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। প্রগতিশীল লেখক জনাব আজিজ মেহের এই গবেষণাকর্ম চালিয়ে যাওয়ার জন্য পাঁচ বছর ধরেই অফুরন্ত উৎসাহ যুগিয়ে এসেছেন আমাকে। তিনি প্রায়শ অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক স্যারের বাড়িতে এসে আমার কাজের খোঁজখবর নিয়ে এবং উৎসাহ যুগিয়ে আমাকে ঋণী করেছেন। রূপালী ব্যাংক লি.-এর প্রাক্তন ডিজিএম কাজী আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের উৎসাহ-উদ্দীপনাও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

গবেষণার কাজে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের বাংলা বিভাগের প্রায় সকল [illegible]রে নিকট থেকেই আমি সহায়তা লাভ করেছি। বিশেষ করে, গবেষণার প্রথম পর্যায়ে অধ্যাপক মোহাম্মদ [illegible], [illegible]অধ্যাপিকা সনজীদা খাতুন, অধ্যাপক আহমদ কবীর, অধ্যাপক ভীস্মদেব চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করে উপকৃ[illegible]ছি।

অধিকাংশ গ্রন্থের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগারের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। সহায়তার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানাই।

384755

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় : প্রস্তাবনা :: ২

লোককাহিনী / সংস্কৃতি / বর্তমান গবেষণায়
অনুসন্ধানের বিষয় / গবেষণার পরিধি, পদ্ধতি ও
অভিসন্দর্ভের বিষয়-বিন্যাস

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোককাহিনী ও সংস্কৃতি :: ১০

লোককাহিনী / লোককাহিনীর উদ্ভব ও বিকাশ / লোককাহিনীর
শ্রেণীবিভাগ / বাংলাদেশে লোককাহিনী সংগ্রহ ও গবেষণা /
সংস্কৃতি / জাতীয় সংস্কৃতি / লোককাহিনী ও সংস্কৃতি /
বাংলা লোককাহিনীর ভূগোল ও পরিবেশ

তৃতীয় অধ্যায় : লোককাহিনীতে বাঙালির সমাজ ও পরিবেশ :: ৪৭

বাঙালির সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন / রাজা ও রাজ্য /
সামাজিক পরিবেশ, শোষক শ্রেণী, বৃত্তি-বিন্যাস / পেশাভিত্তিক
বর্ণবাদ / বিয়ে ও দাম্পত্য জীবন / স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ক ও বাঙালির নৈতিকতা/
পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন / সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান /
নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান

চতুর্থ অধ্যায় : লোককাহিনীতে বাঙালির অধ্যাত্মবোধ ও লোকসংস্কার :: ৭৩

ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ধর্ম-দর্শন: বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম /
লোক-সংস্কার: (ক) যাদুবিদ্যা (খ) দৈত্য-পরী-রাক্ষস ও বিদেহী আত্মায়
বিশ্বাস (গ) ভবিষ্যত-দর্শন (ঘ) চিকিৎসা বিদ্যা

পঞ্চম অধ্যায় : লোককাহিনীতে বাঙালির ঘর-গৃহস্থালী ও জীবন-যাত্রা :: ৯৩

গৃহ ও পরিবেশ / যোগাযোগ ব্যবস্থা / পোষাক-পরিচ্ছদ,
সাজ-সজ্জা, অলংকার / আহার ও পানীয় / নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যাদি

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোককাহিনীতে বাঙালির শিল্পচর্চা ও বিনোদন :: ১০৪

মানস শিল্প : সঙ্গীত, নৃত্যকলা, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, সাহিত্য /
ব্যবহারিক শিল্প : বস্ত্র শিল্প , মৃৎ শিল্প, কাঠ শিল্প, অলংকার
নির্মাণ শিল্প / ক্রীড়া ও বিনোদন: শিকার, নাচগান, ক্রীড়া

সপ্তম অধ্যায় : বাংলা লোককাহিনী ও বাঙালির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য :: ১১২

গ্রন্থপঞ্জী :: ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

প্রস্তাবনা

Dhaka University Institutional Repository

লোককাহিনী

লোককাহিনীর উদ্ভব এমন এক সময়ে যখন মানুষের চিন্তা ও কল্পনা প্রকাশের জায়গাটা ছিলো সীমিত। উনিশ বা বিশ শতকের মতো ফুলে ফেঁপে উঠা প্রচার মাধ্যমে বা দল-নির্ভর শিল্পকেন্দ্রে পদ্ধতিসমৃদ্ধ সূক্ষ্মতায় নিজেকে আকাঙ্ক্ষিত রূপকল্পে প্রকাশ করার সুযোগ ছিলো না তখন। প্রাচীনযুগে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ভাস্কর্য, চিত্রকলা, বৈঠকী সঙ্গীত ইত্যাদির সীমিত বিকাশ ঘটলেও তা ছিলো শাসক ও শাসনকেন্দ্রের সাথে যুক্ত। সাধারণ মানুষ তার সাথে জড়িত ছিলো না। তাই তাদের উদ্দীপনা ও সৃজনশীলতা, উল্লাস ও দুঃখ, কল্পনা ও সৌন্দর্যবোধ এবং জীবন ও জগত সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের একমাত্র আয়তন খুঁজে পেয়েছিলো আধুনিক মানুষের ভাষায় 'Folklore' বা 'লোকঐতিহ্য' কিংবা 'লোকসংস্কৃতি' প্রভৃতি নামে চিহ্নিত সাংস্কৃতিক কাঠামোতে। লোককাহিনী Folklore-এরই বাককেন্দ্রিক অংশ।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের William Jonh Thoms সর্ব প্রথম Folklore শব্দটি ব্যবহার করেন। ফোকলোর বলতে যা বুঝায় তাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: (১) Material Folklore বা লোক শিল্প এবং (২) Formalised Folklore বা লোক-সাহিত্য। ১৮৪৬ সালে থমস কর্তৃক Folklore শব্দটি ব্যবহারের পর থেকে লোকমুখে প্রচারিত লোককাহিনী, ধাঁধাঁ, গীতিকা, প্রবাদ ইত্যাদি সব ধরনের Formalised Folklore এবং বংশ-পরম্পরায় প্রচলিত লোক শিল্প, ভাস্কর্য ইত্যাদি Material Folklore বা লোক-শিল্পও-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।[১]

ফোকলোরের শ্রেণী বিভাগ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। ড: মযহারুল ইসলাম ফোকলোরকে (ক) লোকসাহিত্য (খ) লোকাচার, বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠান ইত্যাদি কেন্দ্রিক ফোকলোর, (গ) লোক-শিল্প এবং (ঘ) লোক বিজ্ঞান ও কারিগরী--এ চারভাগে বিভক্ত করার প্রস্তাব করেন।[২] আবদুল হাফিজ লোকবিজ্ঞান, লোকশিল্প, লোক-সংস্কার, লোকনৃত্য, লোকখেলাধূলা ও লোকসাহিত্য নামে ছয়টি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন।[৩] তবে পাশ্চাত্যেও ফোকলোরের আলোচনায় দু'টি প্রধান শ্রেণী মানা হয়।

ফোকলোরের শ্রেণী বিভাজন নিয়ে বিতর্ক থাকলেও বিগত দেড় শতকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফোকলোর সংক্রান্ত ব্যাপক আলোচনা-গবেষণার মধ্য দিয়ে এর স্বরূপ ও পরিধি সম্পর্কিত মতামত মোটামুটি স্থিরীকৃত। ফোকলোর হলো একটি জনসমাজের বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত ঐতিহ্যগত সম্পদ—যা ভাষায় বা বস্তুতে প্রকাশিত। ডঃ ওয়াকিল আহমদের ভাষায় বলা যায়, " লোকমুখে তা প্রচারিত হয়, লোকশ্রুতিতে গৃহীত ও লোকস্মৃতিতে রক্ষিত হয়।"[৪] এভাবেই একটি মানব-সমাজ প্রজন্মক্রমে তাদের ফোকলোর লালন করে হাজার হাজার বছর ধরে বয়ে নিয়ে এসেছে। অবশ্য ফোকলোরের কোন কোন উপকরণ শুধু লোকশ্রুতিতে সংরক্ষণ করলে চলে না, চর্চার মাধ্যমে তা আয়ত্তও করতে হয়। যেমন খেলাধূলা, লোকসঙ্গীত ইত্যাদি।

---

[১] ডক্টর আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, *লোক-সাহিত্য* প্রথম খণ্ড, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৯৯৪; পৃ-২২।

[২] ডক্টর মযহারুল ইসলাম, *ফোকলোর: পরিচিতি ও পঠন-পাঠন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ-প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৩; পৃ-১৩ ১৬।

[৩] আবদুল হাফিজ, *বাঙলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫; পৃ-১৩।

[৪] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪; পৃ-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

ফোকলোরের পরিচয় দিতে গিয়ে Archar Taylor লিখেছেন যে, ফোকলোর হলো এমন সব উপাদান যা ঐতিহ্যক্রমে মুখে মুখে বা প্রথাচার ও চর্চার মাধ্যমে আমাদের হস্তগত হয়েছে। তা হতে পারে লোক-সঙ্গীত, লোককাহিনী, শ্লোক বা প্রবাদ কিংবা অন্যান্য ভাষিক উপকরণ; হতে পারে ঐতিহ্যগত যন্ত্রপাতি এবং বেড়া বা গেরো, 'হট ক্রস বান' বা 'ইষ্টার এগ', ঐতিহ্যগত প্রতীক যেমন--স্বস্তিকা। (Folklore is the material that is handed on by tradition either by word or mouth or by custom and practices. It may be folk songs, folk tales, riddles, proverbs or other materials preserved in words. It may be traditional tools and physicals objects like fences or knots, hot cross buns or easter eags, traditional symbols like swastika.)[১]

লোকসাহিত্য ফোকলোরের ভাষাকেন্দ্রিক অংশ; প্রজন্মক্রমে মুখে মুখে তা আমাদের কাছে হস্তান্তরিত। ভাষাতেই এর জন্ম ও বিকাশ এবং উদ্ভবকালে মুখের ভাষাই ছিলো এর অবলম্বন। প্রাচীন ও মধ্যযুগে লোককাহিনী লিখিত হয়ে লিখিত উৎস থেকে পুনরায় মৌখিক ঐতিহ্যে ফিরে আসার দৃষ্টান্তও আছে; এ প্রসঙ্গে *বেতাল পঞ্চবিংশতি* ও *জাতকের গল্প*-এর নাম করা যায়। তবে প্রকৃতপক্ষে আধুনিক মানুষের আগ্রহের ফলে উনিশ শতক থেকে লোকসাহিত্য লিখিতরূপে স্থিতি লাভ করতে থাকে।

লোকসাহিত্যের সবচেয়ে বর্ণময় অংশ হলো লোককাহিনী। লোকসাহিত্যের জগতে অনেকখানি আয়তন জুড়ে এর অবস্থান। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য কাহিনী-নির্ভরতা বা ঘটনা-নির্ভরতা। লোকসমাজের মানুষের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা সংশ্লিষ্ট বলে কল্পিত বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা, সংযোজন ও তাদের অর্থবোধক বিন্যস্তকরণের মধ্য দিয়ে এর বুনন সম্পন্ন হয়। এভাবে তা এক বা একাধিক মানুষের জীবনের যাপন বা কল্পিত জীবন-যাপন বর্ণনা করে।

মানুষের জীবনের বোধ্য সামগ্রিক রূপ শব্দ তথা ভাষার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব।[২] ভাষার মাধ্যমেই বিশেষত মুখের ভাষাতে মানুষের আত্মার সৃজনশীল স্পন্দন, তাদের উদ্দীপনা ও উল্লাস, দুঃখ ও সুখ অন্য মানুষকে যথাযথভাবে জানানো যায়। লোককাহিনীও মৌখিক ভাষা-নির্ভর। এ কারণে লোককাহিনীর ভাষায় মানুষের জীবন-যাপনের প্রত্যক্ষ ছাপ পড়ে, সকল মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন সঞ্চিত থাকে। এ জন্যই মুখের ভাষা-নির্ভর লোককাহিনীর বিস্তার ও সম্ভাবনা ব্যাপক।

লোককাহিনী বর্ণনা করে সংশ্লিষ্ট মানবগোষ্ঠীর এক বা একাধিক ব্যাক্তির জীবন-যাপনের সংগঠিত ও সংক্ষিপ্ত রূপ। এক অর্থে জীবনের যাপন প্রক্রিয়ার বিশেষ রূপই সংস্কৃতি। লোককাহিনী কাহিনী ছাড়া উপ-উৎপাদন হিসেবে এই সংস্কৃতির উপাদানসমূহকেও তুলে ধরে এবং সংস্কৃতির সামগ্রিক অবস্থানে সে সব উপাদানের গুরুত্বও নির্দেশ করে। বাংলা লোককাহিনীও এর ব্যতিক্রম নয়। মনোযোগী অনুসন্ধানে বাংলা লোককাহিনী থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির বহু উপাদান খুঁজে নেয়া সম্ভব।

---

[১] Archar Taylor, *Folklore and the Student of Literature Vol-2*, Pacific Spectator, 1948. P-216-233.

[২] দ্র: Martin Heidegger, *On Way to the Language*, Happer & Row, 1971.

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ ওয়াকিল আহমদ তার লোক সংস্কৃতি গ্রন্থে সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে সংস্কৃতি একাধারে জীবন-যাত্রার নিয়ম-পদ্ধতি, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, ধর্মকর্ম, প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ, শিক্ষাদীক্ষা, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি; অন্যদিকে, জীবন যাপনের যাবতীয় বস্তু উপকরণ তথা-- ঘরবাড়ি, খাদ্যদ্রব্য, আসবাবপত্র, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, বস্ত্র-অলংকার ইত্যাদি; তৃতীয়ত— মানস-ফসল যথা সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা,মূর্তি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি। এসব কিছুর সমন্বয় হলো সংস্কৃতির সাধারণ পরিচয়।

সংস্কৃতির সাম্প্রতিক ধারণা অনেক ব্যাপক যা মানুষের তাবত জীবনাচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট। সংস্কৃতি শুধু মানুষের বৃত্তির চর্চা বা অনুশীলন নয়, জীবন যাত্রার প্রকাশিত রূপও সংস্কৃতি—এমনকি তা হতে পারে আদিম মানুষের কোন বর্বর প্রথা বা আচার।

সংস্কৃতির সৃজন প্রক্রিয়ায় তাই মানুষের অন্তর্জগত ও বহির্জগত দুই-ই সমানভাবে সক্রিয়। মানুষ যা করে বা করতে চায় তা প্রথমে তার মানসজগতে ভাষা ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে জন্ম নেয়। পরে তা কার্যে রূপান্তরিত হয়। বলা যেতে পারে "সংস্কৃতির উৎস একদিকে মানুষের অন্তর্জীবন—তার চেতনা, তার আত্মসচেতনতা, তার নিজের চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তি, শ্রেয়সের চেতনা ও সজ্ঞান প্রয়াস; অপরদিকে বহির্জগত—সামাজিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, ঘটনাপ্রবাহের অন্তর্গত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও গতিধারা এবং ঐতিহ্য।"[১]

সংস্কৃতি সম্পর্কে পণ্ডিতদের মতামত ছাড়াও সাংগঠনিক ধ্যান ধারনা গড়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার গৃহীত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৮২ সালে মেক্সিকো শহরে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয় :

" ব্যাপকতর অর্থে সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতি বা সামাজিক গোত্রের বিশিষ্টার্থক আত্মিক, বস্তুগত, বুদ্ধিগত এবং আবেগগত চিন্তা ও কর্মধারার প্রকাশ। শিল্প ও সাহিত্য মাত্র সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয়। মানুষের জীবন ধারাও সংস্কৃতির অঙ্গ। মানুষের অধিকার, মূল্যবোধ, ঐতিহ্যও সংস্কৃতির অঙ্গ। . . . . .

একটি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে যে সমস্ত বিষয় গণ্য হবে তা হচ্ছে শিল্পীদের শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্যিকদের সাহিত্যসাধনা, স্থপতিদের নির্মানকর্ম, সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গীত, নৃত্য-শিল্পীদের নৃত্য-ব্যঞ্জনা, বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার এবং অনুসন্ধানকর্ম, মানুষের ধর্মবোধ এবং সেই সমস্ত মূল্যবোধের সুকৃতি যা জীবনকে অর্থ দান করে। অধিগম্য এবং অনধিগম্য সকল কর্ম, মানুষের ভাব প্রকাশের ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি, বিশ্বাস, ঐতিহাসিক নিদর্শন, নৃ-তত্ত্ব, গ্রন্থাগার --সব কিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।"[২]

---

[১] আবুল কাসেম ফজলুল হক, সংস্কৃতি: পুরাতন ও নতুন নিরিখে, *কর্ণফুল*, অক্টোবর ২০০০, পৃ-১৯।

[২] *বাংলাদেশ জাতীয় সংস্কৃতি কমিশন রিপোর্ট*, ১৯৮৯, পৃ-১৩-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গবেষণায় অনুসন্ধানের বিষয়

আমাদের দেশে লোককাহিনী সংগ্রহের ঐতিহ্য মোটামুটি দীর্ঘদিনের। সংগৃহীত লোককাহিনীর সংখ্যাও কম নয়। তা-সত্ত্বেও এ পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় লোককাহিনীর আলোচনা হয়েছে কম। উনিশ শতকের শেষ দিকে ইউরোপীয় পাদ্রীদের থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালের অনেকেই ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে বহু লোককাহিনী সংগ্রহ করেছেন। এ ছাড়া আছে বাংলা একাডেমীর বিশাল সংগ্রহ। বাংলা একাডেমী লোকসাহিত্য সংগ্রহ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন সংগ্রাহকের সংগৃহীত লোককাহিনীসমূহ খণ্ডের পর খণ্ডে যথারীতি সঙ্কলন ও প্রকাশ করে চলেছে।

এসব লোককাহিনীতে প্রোথিত রয়েছে আদি ও মধ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতির অনেক উপাদান। যেমন, "সওদাগরের জাহাজ ঘাড লাগাইছে—তামার ডংকাত বারী দিছে"[১]—প্রচলিত একটি লোককাহিনীর এই বাক্যটি থেকে তৎকালীন সওদাগরদের ঠাট সম্পর্কে কিছু তথ্য উদ্ধার করা যায়। অন্যান্য কাহিনীতেও সওদাগরদের প্রত্যাবর্তনের পর তামার বেল পিটিয়ে ঘোষণা দেয়ার কথা আছে। এ থেকে বোঝা যায় ঐ সময়ে এ ধরণের রেওয়াজ ছিলো। সওদাগর বাণিজ্য থেকে ফিরে এলে তামার ডংকায় (বেল) আঘাত করে তার প্রত্যাবর্তন ঘোষণা করা হতো, সেই সাথে তার প্রতিপত্তি ও অর্থকেন্দ্রিক কিছু অহংকারের কথাও জানানো হতো। তামার ডংকা পেটানোর এ ঘটনাকে আজকের দিনের বিউগল বাজানোর সঙ্গে তুলনা করা চলে।

আদি কথক যখন গল্প সৃষ্টি করেন তখন তাঁর কল্পনা নিজের চেনা অথবা জানা সমাজের পটভূমিতেই বিস্তার লাভ করেছিলো। এর পর থেকে যুগে যুগে আর সব কথকরা এসে সেই গল্প পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেন; তারাও নিজ নিজ সমাজ ও অভিজ্ঞতা থেকেই কল্পনার মাল-মশলার যোগান দেন। পৃথিবীর সব জাতি বা গোষ্ঠীর লোককাহিনীর মতো বাংলা লোককাহিনীতেও এসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। বাংলা লোককাহিনীর কথকরাও কাহিনী বলতে গিয়ে তার ভাঁজে ভাঁজে ছড়িয়ে দিয়েছেন সমকাল ও অব্যবহিত অতীত সমাজের যৌথ ও ব্যক্তিগত চিন্তা, রুচি, সমাজ-সংগঠন, সামাজিক ও পারিবারিক জীবন, তাদের স্বপ্ন ও কল্পনা, শিল্প ও শিল্পবোধ, গৃহসজ্জা, পোষাক-আশাক, খাদ্যাভ্যাস, আচার-প্রথা, বিনোদন, উৎসবাদি, তাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কার ইত্যাদি, এমনকি ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-উল্লাসও। বাংলা লোককাহিনীতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উচ্চারণে এলোমেলোভাবে বর্ণিত এসব সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ বাছাই ও যথারীতি বিন্যস্ত করে সংশ্লিষ্ট সময়ের বাঙালি সংস্কৃতির রূপটির পরিচয় লাভ করা সম্ভব। বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্যও তাই।

লোকজীবনের অভিজ্ঞতা ও লোকঐতিহ্য নানাভাবে প্রভাবিত করছে ও রূপদান করছে আধুনিক জীবনধারাকে ও আধুনিক সংস্কৃতিকে। বাংলা লোককাহিনীতে বর্ণিত বাঙালি সংস্কৃতি আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতিতে কিংবা বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতিতে কি ছাপ রেখেছে তা খুজেঁ দেখাও বর্তমান গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য। বলা বাহুল্য জাতীয়তাবোধ, জাতীয় চেতনা, জাতিরাষ্ট্রের ধারণা আধুনিক যুগের ব্যাপার।

---

[১] মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান(সম্পা), *বাংলাদেশের লোককাহিনী* - দ্বিতীয় খণ্ড, 'মতিলাল বাশ্‌শা', গ্রন্থ সুহৃদ প্রকাশনী, নরসিংদী ১৯৯৭, পৃ-৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার পরিধি, পদ্ধতি ও অভিসন্দর্ভের বিষয়-বিন্যাস

ইউরোপ-আমেরিকার এমনকি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলাদেশে লোককাহিনীর সংগ্রহ অপর্যাপ্ত। তবে সংখ্যার বিচারে এ পর্যন্ত সংগৃহীত লোককাহিনী একেবারে কম নয়। অবশ্য এর মধ্যে বিভিন্ন কাহিনীর পাঠান্তরও আছে। একটি লোককাহিনীতে সাংস্কৃতিক উপাদান অনুসন্ধানের জন্য তা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পাঠ করতে হয়। মূল কাহিনী, কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্র, ঐতিহাসিক উপাদানের উপস্থিতি এবং সময়ানুক্রমে বিভিন্ন কথকের মাধ্যমে তার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ইত্যাদি বিষয় খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার প্রয়োজন পড়ে। তাই এক একটি কাহিনীর মনোযোগী ও সতর্ক পাঠ পর্যাপ্ত সময় দাবী করে। এ কারণে বর্তমান গবেষণায় প্রকাশিত সকল বাংলা লোককাহিনী পাঠের আওতাভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। সে কাজের জন্য বিপুল সময় প্রয়োজন। তাই বাংলা একাডেমীর নির্বাচিত লোককাহিনী সংকলন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত কিছু সংখ্যক সংকলন, যেগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে সেগুলো বর্তমান গবেষণার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। সে সব সংকলনের তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে গ্রন্থপঞ্জীতে ।

বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনার প্রয়োজনে বিভিন্ন সংকলনভূক্ত মোট ৬২২টি লোককাহিনীকে বিবেচনার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। লোককাহিনীগুলোর শ্রেনীভিত্তিক পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

হাস্যরসাত্মক কাহিনী	:	২৩৪
পশুপক্ষীর কাহিনী	:	৭১
ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী	:	৬৬
কিংবদন্তী	:	৬৫
রূপকাহিনী	:	৫৯
রোমাঞ্চ কাহিনী	:	৪৮
বোকার কাহিনী	:	৪১
নীতিকাহিনী	:	২১
পুরাকাহিনী	:	১৩
সূত্রধারী কাহিনী	:	৪
মোট		৬২২টি

গবেষণায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সংকলন নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংকলনের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠিত মূল্যায়ন, আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার, সাংস্কৃতিক উপাদানের উপস্থিতি ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দেখা গেছে, যে সব সংকলনে কথকের ভাষা ও বাকভঙ্গি অবিকৃত রাখা হয়েছে সেগুলোতে তৎকালীন সমাজের সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের উপস্থিতি অধিক। কয়েকটি সংকলন পরিবর্তিত সাধু ভাষায় বর্ণিত কিন্তু কথকের বাকভঙ্গি ও শব্দচয়ন অক্ষুন্ন অবস্থায় ব্যবহৃত। এসব সংকলনেও প্রাচীন বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির উপাদান সন্তোষজনক। তবে গবেষণায় ব্যবহৃত দু'একটি সংকলনের

Dhaka University Institutional Repository

নাম করা যেতে পারে যেগুলো মূলত তাদের কাহিনীর জন্যই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সম্পাদক-সংগ্রাহক তার ভাষা ও কথনভঙ্গি এতোটাই বদলে দিয়েছেন যে এসব কাহিনীতে বর্ণিত ঘটনাবলী অনেকাংশেই আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। এসব কাহিনী সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য কাহিনীগুলোর অভিমুখ বা সার-বক্তব্য থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান আহরণ। এ প্রসঙ্গে দেওয়ান গোলাম মোর্তজার *"গৈ-গেরামের গল্পের আসর"*-এর নাম করা যেতে পারে।

পরিসংখ্যানে উল্লেখিত কিছু কাহিনীর এক বা একাধিক পাঠান্তরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে একই কাহিনীর বিভিন্ন পাঠান্তর কিছু নতুন উপাদানও আত্মীকৃত করে নিয়েছে কথক ও পরিবেশের রুচি অনুযায়ী। ফলে একই কাহিনীর বিভিন্ন পাঠ কমবেশি ভিন্নতর উপাদানের সন্ধান দিয়েছে।

গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ে সংস্কৃতির বিভিন্ন সংজ্ঞায় নির্দেশিত সূত্রানুযায়ী বাঙালির সংস্কৃতির কিছু বিষয় নির্দিষ্ট করে তাদেরকে চারটি ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল নিয়ে এই চারটি ভাগ অনুযায়ী অভিসন্দর্ভের চারটি অধ্যায় রচিত। অভিসন্দর্ভটি মোট সাতটি অধ্যায়ে সজ্জিত। এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ :

প্রথম অধ্যায়: **প্রস্তাবনা**। এতে আছে গবেষণার উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত।

দ্বিতীয় অধ্যায় : **লোককাহিনী ও সংস্কৃতি**। এ অধ্যায়ে ফোকলোর ও লোকসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করে লোককাহিনীর স্বরূপ ও শ্রেণীবিভাগ নির্ণয়, বাংলা লোককাহিনীর সংগ্রহ ও চর্চা, সংস্কৃতির স্বরূপ, সংস্কৃতির সাথে লোককাহিনীর সম্পর্ক, বাংলা লোককাহিনীর ভূগোল ও পরিবেশ আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: **লোককাহিনীতে বাঙালির সমাজ ও পরিবেশ**। এ অধ্যায়ে লোককাহিনীতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালির সমাজ ব্যবস্থা, রাজা ও রাজ্য, জাত-পাত বৃত্তিবিন্যাস, পরিবার, বিবাহ, দাম্পত্য জীবন, নৈতিকতা, সমাজে নারীর অবস্থান ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : **লোককাহিনীতে বাঙালির অধ্যাত্মবোধ ও লোকসংস্কার**। এখানে তুলে ধরা হয়েছে বাঙালির ঈশ্বর বিশ্বাস ও ধর্ম-দর্শন, লোকবিশ্বাস ও লোক-সংস্কার।

পঞ্চম অধ্যায় : **লোককাহিনীতে বাঙালির ঘর-গৃহস্থালী ও জীবনযাত্রা**। এ অধ্যায়টিতে বাঙালির জীবন যাত্রার ধরন ও ব্যবহৃত উপকরণাদি যেমন- গৃহসজ্জা, যানবাহন, আহার ও পানীয়, পোশাক-আশাক প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : **লোককাহিনীতে বাঙালির শিল্পচর্চা ও বিনোদন**। বাঙালির শিল্পচর্চা ও বিনোদন বিষয়ক তথ্যাদি এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

সপ্তম অধ্যায় : **বাংলা লোককাহিনী ও বাঙালির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য**। এ অধ্যায়টি অভিসন্দর্ভের উপসংহার স্বরূপ।

গ্রন্থের শেষভাগে সংযোজিত হয়েছে গ্রন্থপঞ্জী। গ্রন্থের তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে তিনটি ভাগ অনুসরণ করা হয়েছে। লোককাহিনীর মূল সংকলন গ্রন্থসমূহ এক সাথে, এরপর লোককাহিনী ও সংস্কৃতি বিষয়ক সহায়ক গ্রন্থাবলী এবং শেষে অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থসমূহ ও পত্রপত্রিকার তালিকা দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

একটি মানবগোষ্ঠী বা জাতিকে বিকাশ ও প্রবৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেই জাতির যৌথ মনোভঙ্গি (Collective Attitude), মূল্যবোধ, রুচি, শিল্পবোধ, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি সম্পর্কে ভাবুক ও কর্মীদের পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার, সেই সঙ্গে দরকার এগুলোর শেকড়ের পরিচয় জানা। তা না হলে সেই জাতির প্রকৃত শক্তি ও দুর্বলতাগুলোকে বোঝা সম্ভব হয় না। এ জন্যই কোন সমাজ বা মানবগোষ্ঠীকে বুঝতে হলে প্রথমেই তার সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনুসন্ধান জরুরী হয়ে পড়ে।

বর্তমান গবেষণায় লোকসাহিত্যের প্রধানতম শাখা লোককাহিনীতে বর্ণিত তথ্য অবলম্বনে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভাষিক রূপ ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ইতিহাস, শিল্পকলা ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে মিলিয়ে এসব উপাদানের সত্যাসত্য যাচাই করা হয়েছে। এভাবেই বিন্যস্ত হয়েছে সমগ্র আলোচনার কাঠামো।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বর্তমান গবেষণায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতির অনুসন্ধান করা হলেও তা লোক-সংস্কৃতি বা গণ-সংস্কৃতি নামে অভিহিত হয়নি। হাজার বছর পূর্বে নগরগুলোতে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ছিলো তুলনামূলকভাবে কম। সে সময় আজকের মতো সাংস্কৃতিক বিভাজন এতো স্পষ্ট ও ব্যাপক ছিলো না। সংস্কৃতির মূলধারার বাইরে যে দরবারী সংস্কৃতি ছিলো তা ছিলো আসলে কেবল শাসনকেন্দ্র ও শাসক গোষ্ঠীর সাথে জড়িত অর্থাৎ একেবারেই সংখ্যাল্প কিছু মানুষের বিষয়। তবে শাসকগোষ্ঠীর অভিপ্রায় জনজীবনের উপর আধিপত্য করেছে। কিন্তু সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে 'দরবারী' ও 'লোক' বিভাজনটি দেখা দেয়নি। তবু যে সব ক্ষেত্রে ব্যবধান সূচিত হয়েছিলো বলে তথ্য পাওয়া গেছে সেখানে দরবারী সংস্কৃতি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

লোককাহিনী ও সংস্কৃতি

Dhaka University Institutional Repository

লোককাহিনী

সাধারণ মানুষের মুখে মুখে উদ্ভূত ও বিকশিত হয়ে যুগ যুগ ধরে প্রজন্মক্রমে যে সব কাহিনী মোখিক গদ্যে কথিত ও প্রচারিত হয়ে আসছে সে সব কাহিনীকে লোককাহিনী বলা হয়। এটি প্রধানত মৌখিক ভাষার জিনিস। প্রাচীন ও মধ্যযুগে কোনো কোনো ভাষায় লোককাহিনী লিখিত হয়ে ক্লাসিক সাহিত্যের রূপ লাভ করেছে। আধুনিক কালে লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত হয়েছে অনেক কাহিনী। তা সত্ত্বেও মুখের ভাষাতেই এর প্রকৃত রসস্ফূর্তি।

অনেক ফোকলোরবিদ মনে করেন লিখিত উৎস থেকেও লোককাহিনী প্রচারিত হয়েছে। ডঃ মযহারুল ইসলাম লিখিছেন, "প্রাচীন লিখিত সাহিত্যের অনেক অংশ ধীরে ধীরে লোকসাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করে লোকসাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। সংস্কৃত ও বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষায় যে বিপুল কথাসাহিত্য এক সময় গড়ে উঠেছিলো তা ধীরে ধীরে লোকসাহিত্যের ভান্ডারে, লোককাহিনী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পৈশাচী ভাষায় লিখিত গুণাঢ্যের বা গুণাধ্যায়ের *বৃহৎকথা*, পালি ভাষায় গৌতম বুদ্ধের জীবনালেখ্য *জাতক*, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত *পঞ্চতন্ত্র*, *হিতোপদেশ*, *কথাসরিৎসাগর*, *বৃহৎকথামঞ্জরী*, *দশকুমার চরিত্র*, *বৈতাল পঞ্চবিংশতি* এমনকি *রামায়ন* ও *মহাভারত* এবং দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত তামিল কাব্য *সিলাপতিকরম*-এর বহু অংশ পরবর্তী কালে লোককাহিনীর জগতে আপন সামগ্রী হিসেবে গৃহীত হয়েছে।"[১]

মযহারুল ইসলাম এও উল্লেখ করেছেন যে, মৌখিক ঐতিহ্য থেকেই ঐসব গ্রন্থাদি প্রথমে লিখিত হয়েছে এবং পরে লিখিত নমুনা ধীরে ধীরে লোককাহিনী হিসাবে ছড়িয়ে পড়েছে। অবশ্য এ মত সর্বক্ষেত্রে অভ্রান্ত বলে মনে হয় না।

এ প্রসঙ্গে জাতকের কাহিনীগুলোকে দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যেতে পারে। জাতকের কাহিনী সম্পর্কে বৌদ্ধদের মত হলো গৌতম বুদ্ধ তাঁর পূর্বজন্মের কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন বিভিন্ন শিষ্যের কাছে। যাঁরা সরাসরি বুদ্ধের কাছ থেকে এসব গল্প শুনেন তাঁদের বেশ কয়েক প্রজন্ম পরে এগুলো প্রথম লিখিত হয়। বৌদ্ধদের হিসেবেই অন্তত এক/দেড়শ' বছর পরে এসব কাহিনী লিখিত হয়েছে। এই এক বা দেড়শ' বছর ধরে জাতকের কাহিনীগুলো লোককাহিনীরূপে মুখের ভাষাতেই টিকে ছিলো।

সে যুগে লেখার উপকরণ ছিলো দুর্লভ। একটি গ্রন্থের একটি বা দুটি কিংবা বড়জোর কয়েকটি অনুলিপি প্রস্তুত হতো। তাই সাধারণ মানুষের কাছে গ্রন্থ পৌছার কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। অন্যদিকে, জাতক কাহিনী লিখিত হওয়ার কালেও কাহিনীগুলো অধিকাংশ বৌদ্ধই জানতো এবং মুখে মুখে অন্যদের বলতো। এ অবস্থায় গুটিকয় লিখিত উৎস থেকে কাহিনীগুলো লোকমুখে প্রচারিত হওয়ার চেয়ে ইতোমধ্যে প্রজন্মক্রমে মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত ও প্রচলিত কাহিনীগুলো প্রচারিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। জাতক কাহিনী লিখিত হওয়ার পরে অন্তত আরো হাজার বছর ধরে মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমেই যে জাতকের কাহিনীগুলো সাধারণ মানুষ বংশ পরম্পরায় বয়ে নিয়ে এসেছে তাতে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। জাতক কাহিনীর লিখিতরূপও লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ।

---

[১] ড: মযহারুল ইসলাম, *ফোকলোর: পরিচিতি ও পঠন-পাঠন*, পূর্বোক্ত, পৃ-৩২।

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্যের অনেক গবেষকের মতে জাতক মূলত লোককাহিনীর সংকলন। তারা এর লিখিত রূপ অর্জনের সময় আরো পিছিয়ে দিয়ে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী বলে উল্লেখ করতে চান। T. W. Rhys Davids জাতকের কাহিনীসমূহকে বিশুদ্ধ লোককাহিনী বলেই উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন এগুলোর উৎপত্তি মুখের ভাষায়, পরে লিখিত রূপ লাভ করেছে। তিনি দাবী করেছেন যে মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমেই এগুলো পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিলো। ঈশপের অনেক কাহিনীকে তিনি জাতকের কাহিনীসমূহের রূপান্তর বলে মত প্রকাশ করেছেন।[১]

আমরা মনে করি প্রাচীনযুগে নয়, মধ্যযুগে শিক্ষা এবং লিখার উপকরণ কিছুটা সহজলভ্য হওয়ার পর কেবল ধর্ম-সম্পৃক্ত কাহিনীগুলো লিখিত ঐতিহ্য থেকে মৌখিক ঐতিহ্যে প্রচারিত হয়ে থাকতে পারে। যেমন জাতক কাহিনী ও মহাভারতের কাহিনীসমূহ। অন্যান্য কাহিনীর লিখিতরূপ প্রচারে সংগঠিত উদ্যোগ না থাকারই কথা। ফলে সে সব কাহিনীর মৌখিক রূপটিই প্রজন্মক্রমে হস্তান্তরিত হয়েছে। হয়তো কোন কোন কাহিনীর লিখিত রূপ মৌখিক রূপটিকে বড়জোর শাসন করে থাকতে পারে। তবে কম বা বেশি হোক লিখিত ঐতিহ্যও লোককাহিনীর বিকাশে ভূমিকা রেখেছে। এ জন্যই লোককাহিনীর সংজ্ঞায় লিখিত ঐতিহ্যের উল্লেখ না করে উপায় থাকে না।

ফোকলোর নিয়ে যে বিতর্ক আছে লোককাহিনীর সংজ্ঞা বা পরিচয় নিয়ে তেমন বিতর্ক নেই। লোককাহিনী "গদ্যে বিধৃত কিন্তু লিখিত বা অলিখিত ঐতিহ্যের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে হস্তান্তরিত হয়ে এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে পৌঁছেছে। অর্থাৎ লোককাহিনী বলতে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে তা পুরুষপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত সম্পদ এবং লিখিত বা মৌখিক গদ্যের ভাষায় তা প্রকাশ করা হয়।"[২]

লোককাহিনীতে এমন কিছু থাকে যা সহজেই সাধারণ মানুষের মনে দাগ কাটতে পারে। কাহিনীর মধ্য দিয়ে শ্রোতার মনে এমন সব নির্বিশেষ আবেগের উত্থান ও প্রশমন ঘটে যার সাথে ঐ সমাজের সকলেই একাত্ম বোধ করতে পারে। সাধারণত লোককাহিনী নির্দিষ্ট কোনো মানুষের কথা বলে না। বহু লোককাহিনী শুরু হয় এভাবে : *একদেশে এক রাজা ছিলো* . . . . . অথবা : *একদেশে এক বোকা লোক ছিলো* . . . . । এর পর সেই নির্বিশেষ চরিত্র বা চরিত্রসমূহের জীবনের এমন সব ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয় যার সাথে শ্রোতারা সহজেই মিশে যেতে পারে।

লোককাহিনীর সাথে সাধারণ মানুষের নৈকট্য বোধের আরেকটি কারণ হলো এর ভাষা। শ্রোতার নিজের ভাষায় কাহিনী বর্ণনা করা হয়, প্রয়োজনে ঘটনার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ উচ্চারণ থেকে শুরু করে সহায়ক অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য করার চেষ্টা করা হয়। তাই সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে ভাষিক নৈকট্য লোককাহিনীর জনপ্রিয়তার আরেকটি কারণ।

লোককাহিনীর অন্যতম বৈশিষ্ট হলো অসম্ভবকে সম্ভব করে ফেলার শক্তি। বাস্তব জীবনে শ্রোতা দু'বেলা দু'মুঠো খেতে না পেলেও লোককাহিনীর কথনকালে নায়কের স্থলে নিজেকে বসিয়ে বনের মধ্যে গুপ্ত ধনের সন্ধান পেয়ে প্রভূত সম্পদের মালিক হয়ে রাজকন্যাকে বিয়ে করে সুখে দিনযাপন করে, অথবা ভয়ঙ্কর এক রাক্ষসকে বধ করে বীরত্বের বহর দেখিয়ে লোকমুখে বাহবা কুড়ায়। এভাবেই লোককাহিনী মানুষ ও তার পরিপার্শ্বকে নিয়ে এমন এক সমাজের কাঠামো অবভাসিত করে যেখানে মানুষ, জন্তু-জানোয়ার, গাছপালা, পশুপাখি, পরী-জ্বীন, আকাশ-সাগর-- সবকিছুতেই

---

[১] দ্র:T. W. Rhys Davids, *Buddist Birth-Stories*, London 1878.

[২] আবদুল হাফিজ, *লোককাহিনীর দিক-দিগন্ত*, মুক্তধারা, ১৯৭৬, পৃ-২-৩।

Dhaka University Institutional Repository

কিছু মানবীয় ও কিছু অলৌকিক গুণাবলী আরোপ করে সম্ভব-অসম্ভবের দেয়ালটি ভেঙ্গে দেয়া হয়। সেখানে নিয়ত বঞ্চিত সাধারণ মানুষ ইচ্ছেমতো তার ক্ষোভ ও কামনার অবসান ঘটায়, তার কল্পনার লাগাম খুলে দিয়ে অপার আনন্দের সন্ধান করে। গ্রামাঞ্চলের প্রকৃতি-নির্ভর জীবনে, প্রাচীন ও মধ্যযুগে তো বটেই, এই আধুনিক যুগেও এ আনন্দটুকু কম পাওয়া নয়।

দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণের ক্ষমতা লোককাহিনীর অন্য এক বৈশিষ্ট্য। ইউরোপ বা আমেরিকার কোনো কোনো লোককাহিনী আমাদের দেশে প্রচলিত হয়ে আমাদের লোককাহিনী হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে পারে। আবার উল্টোটাও ঘটতে পারে। এ প্রসঙ্গে ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী বলেছেন : লোককথার এমন একটি প্রাণশক্তি আছে যার ফলে তা অতি সহজেই যুগ-যুগান্তরে দেশ-দেশান্তরে বিস্তার লাভ করতে পারে। কোন কোন ফোকলোর-তাত্ত্বিক অনুমান করে থাকেন ইউরোপ মহাদেশের অধিকাংশ ফোকটেল একদিন ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে মৌখিক অথবা লিখিত ঐতিহ্যের মাধ্যমে প্রচার লাভ করেছিলো। উদাহরণ স্বরূপ পঞ্চতন্ত্র ও জাতকের কাহিনীর কথা বলা যায়।[১]

কাহিনী বয়ান লোককাহিনীর এবং আধুনিক কথাসাহিত্যেরও প্রধানতম বৈশিষ্ট। কিন্তু কথাসাহিত্য ও লোককাহিনীর পার্থক্য ব্যাপক। লোককাহিনী মূলত মুখের ভাষা-নির্ভর, কথা সাহিত্য লিখিত জিনিস। কথাসাহিত্য অধুনিক যুক্তিবোধ ও কার্যকারণ সূত্র মেনে চলে, লোককাহিনী বরং যুক্তি ও বাস্তবতার দেয়াল অতিক্রম করে আত্মার তৃষ্ণার প্রশমন ঘটায়; তবে লোককাহিনীতে অভিজ্ঞতার কথাও থাকে। স্রষ্টার বিশেষ রীতির শব্দচয়ন ও বাক্যগঠনের সাহায্যে কথাসাহিত্যকে অনন্য করে তোলার চেষ্টায় এর কৃতিত্ব নির্ভর করে, লোককাহিনীতে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য শব্দ ও বাক্যাবলীর প্রয়োগই সাফল্যের একটি কারণ। কথাসাহিত্য শুধু কাহিনী বলে না, প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ও কাহিনীর বিশ্লেষণাত্মক উপস্থাপনের মাধ্যমে এসব ঘটনার বাস্তব বিন্যাসের এবং ক্রমিক সংঘটনের অর্থের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করে। লোককাহিনীর প্রধান লক্ষ্য বিনোদন উপলক্ষে একটি বিশেষ আবেগের প্রশমন বা আকাঙ্ক্ষা মোছন, অথবা কোনো প্রথা বা আচারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ। তাই এর উপস্থাপন পরম্পরাযুক্ত এবং সরল কাঠামোতে বিন্যস্ত। এসব বৈশিষ্ট্য থেকে লোককাহিনী ও আধুনিক কথাসাহিত্যের পার্থক্য উপলব্ধি করা যেতে পারে।

বর্তমান গবেষণায় লোকসাহিত্যের যে সব সৃষ্টিকে লোককাহিনী বলে অভিহিত করা হয়েছে তার নাম নিয়ে গবেষকদের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজীতে যাকে 'ফোকটেল'(Folktale) বলে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য কাহিনী পরিবেশন। বাংলায় একে কি নামে অভিহিত করলে প্রকৃত অর্থ উপস্থাপন করা যায় সে বিষয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ডঃ আশরাফ সিদ্দিকীর মত প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে। কারণ তিনিই এদেশে লোককাহিনীর প্রথম বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা করেন। ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী 'লোককাহিনী' ও 'লোককথা' দু'টো পরিভাষাই ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে ফোকটেলকে লোককাহিনী কিংবা লোককথা এই উভয়বিধ নামে ডাকা যায়। তবে তিনি সচরাচর

[১] ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত; পৃ-২৩০-৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

লোককাহিনী শব্দটিই ব্যবহার করেছেন।[১]ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর "লোকসাহিত্য" প্রবন্ধে 'লোককথা' পরিভাষাটি গ্রহণ করেছেন।[২]

ডঃ মযহারুল ইসলাম বলেছেন, " ফোকটেলের প্রাণই হলো কাহিনী--কাহিনী ছাড়া লোককাহিনী হয় না--তাকে অন্য কোনো কিছু দিয়ে পুরণ করা যায় না। কথা কথাবার্তা হিসেবেও ব্যবহৃত--কথাসাহিত্যে তার স্ফূর্তি নানাভাবে দেখা যায়---লোককাহিনীতে এমন কথার কোনো অবকাশ নেই--সেখানে কাহিনীর ঠাসবুননী। সুতরাং ফোকটেলকে লোককথা না বলে লোককাহিনী বলাই সঙ্গত।"[৩]

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য কোনো ব্যাখ্যায় না গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, ইংরেজিতে যাকে ফোকটেল বলে বাংলায় তাকে লোককথা বললে কথাটির যথার্থ অনুবাদ হয়, তবে সংক্ষেপে কথা বলেও উল্লেখ করা যায়।[৪]

আবদুল হাফিজ ইংরেজি ফোকটেলের পারিভাষিক নামকরণে 'লোককাহিনী' শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। লক্ষ্যণীয় যে এঁদের অনেকেই মৌখিক গদ্যের মাধ্যমে প্রজন্মক্রমে প্রচারিত কাহিনীগুলোকে ইংরেজি ফোকটেলের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে এর নামকরণের পক্ষপাতী। কিন্তু ইংরেজি ফোকটেল শব্দটিই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে বিস্তৃত হয়েছে । এক সময় ফোকটেল বলতে বোঝাতো হাউসহোল্ড টেলস। বর্তমানে এর অর্থ অনেক বিস্তৃত হয়েছে । ভবিষ্যতেও যে এর অর্থ নতুন করে প্রসারিত হবে না তা কে বলতে পারে ?

আমরা ফোকটেলের সমার্থক বাংলা শব্দ হিসাবে 'লোককাহিনী' ব্যবহারের পক্ষপাতী; বর্তমান অভিসন্দর্ভে 'লোককাহিনী' পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়েছে। কথাতে আছে ভাষার চাতুর্য, শব্দ ও বাক্যের বিচিত্র কৌশল ও বিন্যাস। শুধু কাহিনী নিয়ে কথাসাহিত্য হতে পারে না। কিন্তু লোককাহিনীতে কাহিনীই প্রধান। তাছাড়া সাধারণের ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যের প্রয়োগ সেখানে প্রায় অনিবার্য। কাহিনীকে বিচিত্র উপায়ে আকর্ষণীয় করে পরিবেশন করাই তার লক্ষ্য, কথার কারুকাজের প্রয়োজন নেই। আর শ্রোতার দিক থেকে দেখতে গেলেও কাহিনীই তাদের প্রধান আকর্ষণ। সুতরাং ফোকটেলকে লোককাহিনী বললেই পরিভাষাটি অর্থবোধক এবং সঙ্গত হয়।

এখানে প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়ে আলোকপাত করা দরকার। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, গ্রামাঞ্চলের যে-নিরক্ষর মানবগোষ্ঠীর মুখের ভাষায় বাংলা লোককাহিনীর জন্ম ও বিস্তার সেই মানবগোষ্ঠী এর একটা নাম দিয়েছিলো। অন্তত বিগত এক শ বছর ধরে তারা লোককাহিনী বা ফোকটেলকে কিস্‌সা নামেই ডাকতো। বর্তমান কালের গবেষকরা কিস্‌সা বলতে বুঝেন প্রধানত রূপকাহিনী। কিন্তু লোককাহিনীর আকর বৃহত্তর ময়মনসিংহে বিশেষত নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, কুমিল্লার উত্তরাঞ্চল প্রভৃতি এলাকায় সব ধরনের লোককাহিনীকে 'কিস্‌সা' নামে অভিহিত করা হয়। সৌখিন কথকদের মুখেই শোনা যায় 'পরীর কিস্‌সা', 'রাক্ষসের কিস্‌সা', 'টেডনের(চালাক) কিস্‌সা', 'জোলার(বোকার) কিস্‌সা', ইত্যাদি শ্রেণীভেদ। লোককাহিনীর এ নাম বাদ দিয়ে ইংরেজি ফোকটেলকে ভিত্তি ধরে নতুন নাম দেয়া এবং তা নিয়ে দীর্ঘ বিতর্কের সূত্রপাত করার কোনো প্রয়োজন কি আদৌ আছে ? কিস্‌সা বলতে সাধারণত পূর্ণাঙ্গ কাহিনী বোঝায়, ছোটো বা বড় যাই হোক। আমরা ইচ্ছে করলে নীতিকাহিনী ও হাস্যরসাত্মক

---

[১] দ্রঃ আশরাফ সিদ্দিকী, *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫।

[২] ডক্টর এনামুল হক, *লোকসাহিত্য, মণীষা-মঞ্জুষা*, প্রথম খণ্ড, মুক্তধারা, ১৯৭৫,পৃ-৭২।

[৩] ডঃ মযহারুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৪।

[৪] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, ১ম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, ২য় সংস্করণ, ১৯৫৭, পৃ-৩৯৭।

Dhaka University Institutional Repository
কাহিনীর ক্ষুদ্রত্বকে মেনে নিয়ে লোককাহিনীর ভান্ডারকে কিস্‌সা নামেও অভিহিত করতে পারি। তাতে এর প্রাচীন ঐতিহ্য-পরিচয় বজায় থাকে, উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়।

লোককাহিনীর উদ্ভব ও বিকাশ

বিনোদনের উপায় হিসাবে লোককাহিনী সাধারণ মানুষের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। আদিকাল থেকেই মানুষ মুখে মুখে বর্ণিত এসব কাহিনী শুনে আনন্দ পেয়ে আসছে। গ্রামাঞ্চলে আজো দেখা যায় হেমন্তের ফসলের মৌসুম শেষ হয়ে গেলে শীতার্ত সন্ধ্যায় অথবা বসন্তের রাতে কিস্‌সার আসর বসেছে, ঘুমোবার আগে মা-বাবা কিংবা দাদা-দাদী কিসসা শুনিয়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ভাবাবেগের খোরাক যোগাচ্ছেন যেন এই ফাঁকে নিদ্রাদেবী এসে তাদের হরণ করে নিয়ে যায়।

আধুনিক কথা সাহিত্য বিকশিত হওয়ার পূর্বে প্রতিটি সমাজেই লোককাহিনী উদ্ভূত ও বিকশিত হয়ে। অতি প্রাচীন কালে লোককাহিনী সৃষ্টি হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিনোদনের উপায় হিসেবে লোককাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। হয়তো লোককাহিনীতে শিক্ষণীয় কিছু বিষয়ও থাকতো, যা সম্ভবত গৌণ ব্যাপার বলে গণ্য হতো।

ঠিক কবে লোককাহিনীর উদ্ভব হয়েছিলো তা সঠিক করে বলা সম্ভব নয়। আন্দাজ করা যায় যোগাযোগের অর্থবোধক মাধ্যম হিসেবে ভাষার বিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে লোককাহিনীর উদ্ভব হয়। লোককাহিনীর প্রচলন সম্পর্কে স্টিথ থম্পসন মন্তব্য করেছেন যে, তাদের ওখানে অর্থাৎ পশ্চিমে অন্তত তিন বা চার হাজার বছর আগে এমনকি আরো আগে থেকে সমাজের প্রতিটি স্তরে কাহিনী-বয়ান শিল্পের চর্চা ছিলো। (When we confine our view to our own occidental world, we see that for atleast three or four thousand years, and doutbless for ages before, the art of story telling has been cultivated in every rank of society.")[১]

অনেকের মতে ভারতীয় উপমহাদেশে লোককাহিনীর ঐতিহ্য আরো প্রাচীন। খ্রিষ্টের জন্মের আগে লিখিত রূপ লাভ করেছে এমন লোককাহিনীর সংখ্যা এখানে অনেক। আন্দাজ করা যায় ভারতীয় উপমহাদেশে অন্তত সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বেও লোককাহিনীর চর্চা ছিলো।

বাংলা লোককাহিনীর উদ্ভবও প্রাচীনকালের ঘটনা। বাংলা লোককাহিনীর বয়স দক্ষিণ ও উত্তরভারতীয় লোককাহিনীগুলোর চেয়ে কম হতে পারে, তবে এগুলোও প্রাচীনকালের সৃষ্টি। বাংলাদেশে আর্য আগ্রাসনের অনেক আগেই যে লোককাহিনীর উদ্ভব হয়েছিলো তাতে সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে আর্য আগ্রাসন, বিভিন্ন ধর্মীয় ও

---

[১] Stith Thompson , *The Folktale* , New York, Holt Reinehart and Winston, page-3.

Dhaka University Institutional Repository

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যধারী রাজবংশের শাসন, ইসলামের বিস্তার প্রভৃতি কারণে নতুন লোককাহিনী যেমন আমদানী হয় তেমনি পুরানো লোককাহিনীসমূহেরও ব্যাপক রদবদল ঘটে। তবে লোককাহিনীর পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কোনো না কোনো পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই ঘটে থাকবে। বিভিন্ন ধর্ম ও রাজবংশের বিস্তারের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে। সাংস্কৃতিক আবহে পালাবদলের প্রভাব পড়ে লোককাহিনীতেও। এভাবে বাংলা লোককাহিনীর যে বিশাল ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তাতে বাঙালি সংস্কৃতির মূল থেকে শুরু করে বিভিন্ন পরিবর্তনের ছাপ খুঁজে বের করাও সম্ভব।

মটিফ ও টাইপ

মটিফ ও টাইপ কাহিনীর অভ্যন্তরিস্থ বৈশিষ্ট্য, যা নিয়ে গড়ে উঠে লোককাহিনীর পুরো শরীর। লোককাহিনী বিজ্ঞানসম্মতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন কাহিনীর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করা। কাহিনীর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নিরূপণের জন্য কাহিনীর অভ্যন্তরিস্থিত বৈশিষ্ট্যসমূহ খুজে বের করে পরস্পর তুলনা করতে হয়। এসব বৈশিষ্ট্যই হলো মটিফ ও টাইপ।

মটিফ : স্টিথ থম্পসনের মতে মটিফ হলো কাহিনীর ক্ষুদ্রতম উপাদান ঐতিহ্যের মধ্যে যার বেঁচে থাকার ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতা অর্জন করতে হলে উপাদানটির মধ্যে একটি অসাধারণ ও আকর্ষণীয় কিছু থাকতে হবে।

সব মটিফই তিনটি শ্রেণীতে পড়ে। প্রথম হলো কাহিনীর নায়ক-নায়িকা, যেমন--দেবতা বা অসাধারণ প্রাণী কিংবা মানুষ। দ্বিতীয় দফায় পাওয়া যায় ঘটনাপ্রবাহের পশ্চাৎপটে অবস্থিত কতগুলো বিষয় বা বস্তু, যেমন--মন্ত্রপুত তরবারী বা তাবিজ, অদ্ভুত বিশ্বাস ইত্যাদি। তৃতীয় দফায় পড়ে একক বৈশিষ্ট্যময় ঘটনা।

মটিফ কাহিনীর ক্ষুদ্রতম অংশ, তবে সব ক্ষুদ্রতম অংশ মটিফ নয়। যেগুলো ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কথকের হাতে পড়েও পরিবর্তিত না হয়ে হস্তান্তরিত হয় সেগুলোই মটিফ।

টাইপ : স্টিথ থম্পসনের সংজ্ঞানুযায়ী, " টাইপ হলো স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত কাহিনী। এরকম কাহিনীকে একটি সম্পূর্ণ কাহিনী হিসেবেই পরিবেশন করা হয় এবং তা তার ব্যাখ্যার জন্য অন্য কোনো কাহিনীর উপর নির্ভর করে না। এমন হতে পারে যে সত্যি সত্যি এ কাহিনী অন্য একটি কাহিনীর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পরিবেশিত হয়। কিন্তু সে কাহিনী যদি এককভাবেও পরিবেশিত হয় তবে সেটি হলো তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রমান।" [১]একটি টাইপ-এ এক বা একাধিক মোটিফ থাকতে পারে।

---

[১] আবদুল হাফিজ, *লোককাহিনীর দিক-দিগন্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ-৮।

Dhaka University Institutional Repository
সুতরাং বলা যায় টাইপ হলো এক বা একাধিক মোটিফ বিশিষ্ট পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত একক কাহিনী যার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে এবং যার অর্থ বোঝার জন্য অন্য কাহিনীর উপর নির্ভর করতে হয় না এবং লোকমুখে কাহিনীটি অন্য একটি কাহিনীর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পরিবেশিত হলেও যার স্বতন্ত্র অস্থিত্ব অন্যত্র বেঁচে থাকে।

যেমন নীল-বত্রিশ-এর কিস্‌সার রাক্ষস হত্যার ঘটনা। এ কাহিনীতে দেখা যায় রাক্ষসকে কাটলে যেখানেই রাক্ষসের রক্ত পড়ে সেখান থেকেই নতুন একটি রাক্ষস গজায়। অবস্থা দেখে ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী বলে যে, যদি নীল রাক্ষসকে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করার সময় বলে যে 'ডাইনে কাইটা বাঁয় থু (রাখ)/ রাক্ষস পাত্ হ পাত্ হ' তাহলে আর নতুন রাক্ষস জন্মাবে না। নীল এ কথা শুনে এভাবেই রাক্ষসকে নিপাত করে। এ কাহিনীটি অন্য লোককাহিনীতেও এভাবেই পাওয়া যায়। সেখানে শুধু পাত্র-পাত্রী ভিন্ন। একে একটি টাইপ বলা যায়।

গত শতাব্দীর শেষ থেকেই লোককাহিনী বৈজ্ঞানিকভাবে শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য কাহিনীর অভ্যন্তরস্থিত বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্ণয় এবং তাদেরকে আলাদাভাবে বিচার করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ফিনল্যান্ডের পণ্ডিত এন্টি আর্ণে সর্বপ্রথম এ কাজে হাত দেন। এ শতাব্দীর গোড়ায় তিনি টাইপের অস্থিত্ব ও স্বরূপ চিহ্নিত করে ৫৪০ টি টাইপ সংগ্রহ করেন। এসব টাইপ সঙ্কলিত হয় তার *The Types of Folktale* গ্রন্থটিতে। পরে স্টিথ থম্পসন তা সংশোধন করে ১৯২৮ সালে আর্নে-থম্পসন টাইপসূচী *Type Index of Folktale* গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে সমগ্র পৃথিবীর লোককাহিনীকে মোটামুটি ২৪৯৯টি টাইপ-এ বিভক্ত করা হয়। অন্যদিকে থম্পসন এককভাবে সংগ্রহ করেন ১২ হাজার মোটিফ। সেগুলো তার ছয় খন্ডে প্রকাশিত *Motief Index of Folktale* গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে ।

লোককাহিনীর শ্রেণীবিভাগ

বিভিন্ন পণ্ডিত-গবেষক লোককাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবিভাগ প্রদান করেছেন। ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী লোককাহিনীর আলোচনায় উপকথা, নীতিকথা, রঙ্গকথা বা হাসির গল্প, বীরকথা, রূপকথা, রোমাঞ্চকথা, সৃষ্টিকথা বা Etiological Tale, গালগল্প, ক্রমবর্ধমান বা সূত্রমূলক গল্প প্রভৃতি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন।[১]

ডঃ মযহারুল ইসলাম লোককাহিনীকে পুরাকাহিনী, কিংবদন্তী, রূপকাহিনী, পরীকথা, নীতিবাচক লোককাহিনী বা উপকথা বা উপকাহিনী, প্রাণিবাচক লোককাহিনী বা পশুকাহিনী, ভৌতিক লোককাহিনী, বোকাদের লোককাহিনী, হাস্যকৌতুকময় লোককাহিনী, সাংসারিক লোককাহিনী, শিকলী কাহিনী, ব্রতকথা, লোকগল্প, সত্য ঘটনাশ্রয়ী ক্ষুদ্র কাহিনী বা এ্যানেকডটস (এর দু'টো ধরন ক. এ্যানেকডটস খ. কিংবদন্তী)--এই কয় ভাগে ভাগ করেছেন।[২]

আবদুল হাফিজ লোককাহিনীর শ্রেণীবিভাগ করেছেন এভাবে : ১. ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী ২. পুরান কাহিনী ৩. পশুপক্ষীর কাহিনী ৪. নীতিকাহিনী ৫. হাস্যরসাত্মক ক্ষুদ্র কাহিনী ৬. রোমাঞ্চকর কাহিনী ৭. বীরকাহিনী ৮. স্থানিক কাহিনী ৯. সূত্রধারী কাহিনী ১০. ক্রমপুঞ্জিত কাহিনী ১১. রূপকাহিনী ।[৩]

---

[১] ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, *লোক-সাহিত্য* প্রথম খণ্ড, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ-২৪০-২৪৩।

[২] ডঃ মযহারুল ইসলাম, *ফোকলোর: পরিচিতি ও পঠন-পাঠন*, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৪-৫৬।

[৩] আবদুল হাফিজ, *বাঙলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য*, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

এ ছাড়াও কেউ কেউ অন্য ধরনের শ্রেণীবিভাগ প্রদান করেছেন। লোককাহিনীর শ্রেণীবিভাগে এ ধরনের মতবৈচিত্রের একটি কারণ হলো কোনো কোনো লোককাহিনীতে দুই বা ততোধিক শ্রেণীর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। ফলে এসব লোককাহিনীকে একাধিক শ্রেণীতে ফেলা যায়। মযহারুল ইসলাম কিংবদন্তীর মধ্যে বীরকাহিনীকেও অন্তর্ভূক্ত করেছেন। অথচ ড: আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুল হাফিজ, আবদুল খালেক এবং অন্য অনেকেই বীরকাহিনী ও কিংবদন্তীকে আলাদা দু'টো শ্রেণী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মযহারুল ইসলাম ভৌতিক কাহিনী, পরীকাহিনী, লোকগল্প ইত্যাদি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন। এগুলো অন্যরা স্বীকার করেননি।

মযহারুল ইসলাম কিংবদন্তীকে একবার স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসেবে আরেকবার আনেকডটসের উপশ্রেণী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বীরকাহিনীকে তিনি আলাদা শ্রেণীর মর্যাদা দেননি। কিন্তু কেবল বীরত্বকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিশুদ্ধ দু'একটি বীর কাহিনী এখনো পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চলে কথিত হয় বলে বর্তমান গবেষক জানেন। কিংবদন্তীর সাথে সেসব কাহিনীর কোনো সাদৃশ্য নেই। তেমনি শুধু ভয়ের উপাদানের জন্য ভৌতিক কাহিনীর শ্রেণীটিকেও স্বীকার করা যায় না। কারণ ভয় অনেক লোককাহিনীরই অন্যতম উপাদান। আবার পরীকাহিনীকে আলাদা শ্রেণীতে না ফেলে রূপকাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কেননা পরী, জ্বীন, রাক্ষস, সাপ, বাঘ ইত্যাদির প্রাধান্য বিবেচনা করে লোককাহিনীর শ্রেণীবিভাগ করলে কয়েক'শ শ্রেণী তৈরি হওয়ার আশঙ্কা আছে ।

আবদুল হাফিজের শ্রেণীবিভাজন অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিযুক্ত। তবে তিনি বোকাদের কাহিনীসমূহকে হাস্যরসাত্মক কাহিনীর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। কিন্তু এ দু'ধরনের কাহিনীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। বোকাদের কাহিনী সব সময় পূর্ণাঙ্গ একটি কাহিনী। এতে বোকার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, বোকামীর জন্য তার জীবনের নানা দু:খ-কষ্ট ইত্যাদিকেও গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্তু হাস্যরসাত্মক কাহিনীতে নির্মল হাসি যোগানোই প্রধান ব্যাপার। এমনকি তা একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী নাও হয়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে বোকাদেরকে জোলা (নেত্রকোনা), আড়ুয়া (সিলেট) প্রভৃতি নামে ডাকা হয়। সেইসব অঞ্চলে বোকার কাহিনীকে যথাক্রমে জোলার কিস্‌সা এবং আড়ুয়ার কিস্‌সা ইত্যাদি বলা হয়। কিন্তু হাস্যরসাত্মক কাহিনীকে অনেক অঞ্চলেই হাসির কিসসা নামে অভিহিত করা হয়। কাজেই এ দু'শ্রেণী আলাদা রাখাই যুক্তিসঙ্গত হতো।

লোককাহিনীর শ্রেণীবিভাজন বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য নয়। অভিসন্দর্ভে পরোক্ষ বিষয় হিসাবে শ্রেণী অনুযায়ী লোককাহিনী চিহ্নিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ জন্য কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গবেষণায় আবদুল হাফিজ সাহেবের শ্রেণীবিভাগ ব্যবহার করা হয়েছে। তা নিম্নরূপ:[১]

১. ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী (Explanatory Tales)

ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী এ ধরণের কাহিনীকে বলেছেন সৃষ্টিকথা। তার মতে এগুলো লোকপুরাণ বা Myth-এর আঞ্চলিক সংক্ষিপ্ত রূপ। আবদুল হাফিজ সাহেবের মতে ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনীর উদ্ভব লোকসংস্কার থেকে। তিনি বলেন ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী প্রধানত বিশেষ বিশেষ ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়। কেন আকাশটা উপরে উঠলো, কেন

[১] আবদুল হাফিজ, *বাঙলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য*, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৪-৫০।

Dhaka University Institutional Repository
ধানের চারা চালের বদলে ধান ফলালো, মুসলমানদের জন্য শুকরের মাংস কেন নিষিদ্ধ হলো ইত্যাদি ঘটনার ব্যাখ্যা দেয় ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী। এ ধরণের লোককাহিনী বাংলায় যথেষ্ট আছে।

২. পুরাণকাহিনী (Myths)

সাধারণত বিশ্বজগতের সৃষ্টি রহস্য ভেদ করার উদ্দেশ্যে মানুষের কাল্পনিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে এ ধরণের কাহিনী গড়ে উঠেছে বলে মনে করা হয়। ইংরেজীতে একে Myth বলা হয়।

কেউ কেউ পুরাণকে Myth থেকে আলাদা করে দেখতে চান। যেমন ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী একে বলতে চান লোকপুরান, মযহারুল ইসলাম বলেছেন পৌরাণিক লোককাহিনী। অর্থাৎ তারা পুরাকাহিনীকে পৌরাণিক লোককাহিনী বলে পুরানের জন্য আরেকটি জায়গা করে দিতে চান।

পুরানকাহিনীতে সাধারণত স্রষ্টা/দেবতা/ঈশ্বর/ আল্লাহ/নবীর উপস্থিতি থাকে এবং সৃষ্টির কোনো না কোনো ব্যাপার নিয়ে কাহিনী বিকশিত হয়। এর সাথে জড়িত থাকে ধর্মীয় চেতনা বা প্রকৃতির বিচিত্র রহস্যের কাল্পনিক ব্যাখ্যা।

৩. পশুপক্ষীর কাহিনী (Animal Tales)

এসব কাহিনীতে মনুষ্যেতর প্রাণীর ওপর মানবিক বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয় এবং তার মাধ্যমে সম্পন্ন বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা থাকে। এতে শিয়াল, কুকুর, সাপ, পাখি, বানর, বাঘ প্রভৃতি প্রাণী একটি আরেকটিকে প্রতারণা করে হাস্যরসের সৃষ্টি করে। প্রতারণা ছাড়া অন্য কিছুও কাহিনীর বিষয়বস্তু হতে পারে।

৪. নীতিকাহিনী (Fables)

পশুপক্ষীর কাহিনীতে যদি কোনো একটি নীতিকথা প্রতিপন্ন করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয় তবে একে নীতিকাহিনী বলে। মযহারুল ইসলাম বলেছেন এর দৈর্ঘ্য কম বলে একে উপকাহিনীও বলা যায়।

৫. হাস্যরসাত্মক ক্ষুদ্র কাহিনী (Anecdots)

এসব কাহিনীর মূল লক্ষ্য হাস্যরস পরিবেশন। এসব কাহিনীর মধ্যে টেডনের (চালাক) কাহিনীগুলোতে শেষদিকে টেডনের করুণ পতন হাস্যরসের উদ্রেক করে। কাহিনীর প্রধান ব্যাপার হাস্যরস, এতে কোনো চরিত্রই বিশেষ প্রাধান্য পায় না। কাহিনীগুলো সাধারণত ক্ষুদ্র হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৬. রোমাঞ্চকর কাহিনী (Novella)

আবুদল হাফিজ মনে করেন আমাদের দেশে এ ধরনের কাহিনী খুব বেশি নেই। ডঃ আশরাফ সিদ্দিকীও রোমাঞ্চবর কাহিনীর উদাহরণ টানতে গিয়ে বিদেশী সংগ্রহের দ্বারস্থ হয়েছেন। বাংলাদেশে জনপ্রিয় হাতেম তাই-এর পুঁথির কোনো কোনো কাহিনী এ শ্রেণীভুক্ত হতে পারে। রোমাঞ্চকর কাহিনী রূপকল্পে রূপকাহিনীর মতই। তবে পার্থক্য হলো রোমাঞ্চকর কাহিনীতে অবিশ্বাস্য ঘটনার ঠাসবুনুনী নেই, থাকলেও সেগুলোর বৈশিষ্ট্য এমন যে শ্রোতা সেগুলোকে এক কথায় অবিশ্বাস্য বলে খারিজ করে দিতে পারে না।

৭. বীরকাহিনী (Hero Tales)

ড: আশরাফ সিদ্দিকী একে বলেছেন বীরকথা। তাঁর মতে, কোনো কোনো গল্পে একটি মাত্র বীর বা অসম সাহসী চরিত্র নানারূপ অসাধ্য সাধন করে লোকচিত্ত জয় করে থাকে। সংস্কৃত বেতাল পঞ্চবিংশতি, বিক্রমাদিত্য চরিত্র প্রভৃতি গল্পকে তিনি বীরকথা বলেছেন। এ ধরনের কাহিনীকে ইংরেজিতে হিরোটেল বলা হয়। মুসলমানদের মধ্যে হানিফার কাহিনী এ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে।

৮. স্থানিক কাহিনী (Legands)

কিবদন্তীকে আবদুল হাফিজ এ নামে শ্রেণীভুক্ত করেছেন। সাধারণত প্রকৃত ঘটনার সাথে বিভিন্ন লোকের কল্পনা মিশ্রিত হয়ে স্থানিক কাহিনী গড়ে উঠে। এ ধরণের কাহিনী কোনো ব্যাক্তির বিশেষ কোনো ঘটনা, কোনো স্থান প্রভৃতি নিয়ে সৃষ্টি হয়। তার সাথে যুক্ত হয় বিভিন্ন সময়ের, সমাজের, ব্যক্তির রুচিমাফিক কল্পনা। লোককাহিনীর কথক এবং শ্রোতা ধরে নেয় কাহিনীটি সত্য।

৯. সূত্রধারী কাহিনী (Formula Tales)

এসব কাহিনীতে একটি সূত্র সঙ্গীতের স্থায়ী পদের মতো আবৃত্ত হতে থাকে, তবে সেই সাথে এর আকারও বৃদ্ধি পায়। যেমন কাক ও চড়ুইয়ের গল্পে কাক চড়ুইয়ের কলিজা খাওয়া জন্য মুখ ধুতে গিয়ে পানি সংগ্রহের সময় বিভিন্ন স্থানে গিয়ে একটি সূত্র আবৃত্তি করে।

১০. ক্রমপুঞ্জিত কাহিনী (Cumulative Tales)

এ ধরনের কাহিনী খেলাচ্ছলে বলা হয়ে থাকে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কৌতুহল মিটানোর জন্য মূল কাহিনীর সঙ্গে অন্যান্য কাহিনী জুড়ে পরিবেশন করা হয়। এভাবেই কাহিনী ক্রমশ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। ফলে এ ধরনের কাহিনীতে অসঙ্গতি দেখা দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

১১. রূপকাহিনী

রূপকাহিনীর পরিচয় প্রসঙ্গে ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী লিখেছেন : বাংলায় যাকে আমরা রূপকথা বা পরীকাহিনী বলি তা আসলে ইংরেজী Fairy Tales-এর ভাষান্তর। Fairy Tale পরীর গল্প বোঝালেও সব গল্পেই কিন্তু পরী নেই। রাক্ষস খোক্কসের পুরীতে এবং Never Never Land -এ গমন, রাজপুত্র বা বাদশাজাদা কর্তৃক অসাধ্য সাধন, ভিন্ন দেশের রাজকন্যা বা বাদশাজাদীকে বিবাহ, দৈব সাহায্য, ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা ইত্যাদি ইত্যাদিই রূপকথার বৈশিষ্ট।"[১]

লোককাহিনীর প্রখ্যাত গবেষক স্টিথ থম্পসনের উদ্ধৃতি দিয়ে আবদুল হাফিজ লিখেছেন, "জার্মানরা যাকে Marchen বলে বাংলায় তাই রূপকাহিনী। . . . .Marchen হলো এক ধরণের কাহিনী যার নির্দিষ্ট দৈর্ঘ আছে, আর আছে মটিফ বা অনুকাহিনীর পরম্পরা। এ কাহিনীর ঘটনা ঘটে অবাস্তব পৃথিবীতে—যে পৃথিবীতে না আছে নির্দিষ্ট স্থান, না নির্দিষ্ট চরিত্র, তদুপরি তা অত্যদ্ভুত ব্যাপারে পরিপূর্ণ থাকে। এই অসম্ভবের দুনিয়ায় নিরহঙ্কার নায়ক তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে বাদশাহী পায় আর শাহজাদীকে বিয়ে করে।"[২]

স্টিথ থম্পসন তার সংজ্ঞায় যেসব বৈশিষ্ট উল্লেখ করেছেন তার সাথে বাংলায় রূপকাহিনী নামে অভিহিত লোককাহিনীসমূহের হুবহু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলা রূপকাহিনী যথেষ্ট দীর্ঘ, অতিলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ, নির্দিষ্ট স্থান-কাল-পাত্রহীন, কিছু সংখ্যক শাখাকাহিনী পরস্পর গ্রথিত।। বাংলা লোককাহিনীতে এ ধরনের কাহিনীর সংখ্যা অনেক।

লোককাহিনীর শ্রেণীবিভাজন অবশ্যই একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। কোনো একটি শ্রেণীর দু'একটি বৈশিষ্ট্য অন্য একটি শ্রেণীতে আবিষ্কার করা সম্ভব। যেমন পশুকাহিনীতে শুধু নীতিকথা যুক্ত হলেই তা হয়ে যায় নীতিকাহিনী। তেমনি ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী ও পুরাণের মধ্যেও প্রচুর সাদৃশ্য বিদ্যমান। তাই বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে পার্থক্যের সুতোটা খুবই সূক্ষ্ম।

---

[১] ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, *লোক-সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ-২৪১

[২] আবদুল হাফিজ, *লোককাহিনীর দিক-দিগন্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ-৬।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের শেষে ইউরোপীয় ধর্মযাজক ও রাজকর্মচারীদের উদ্যোগে উপমহাদেশে লোককাহিনী সংগ্রহ শুরু হয় । অবশ্য এ সময় ব্রিটিশ শাসকগণ এ ধরনের কাজকর্মে উৎসাহ দিয়ে আসছিলেন। কারণ তাঁরা উপলব্ধি করছিলেন উপমহাদেশে শাসন-শোষণ দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে প্রতিটি অঞ্চলের জনগণের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সামাজিক রীতিনীতি, দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ জরুরী। এই সৌখিন লোককাহিনী সংগ্রাহকরা, আন্তরিক আগ্রহ বা শাসকবর্গের উৎসাহ--যে কারণেই হোক, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোককাহিনী সংগ্রহ, সম্পাদনা, প্রকাশ ও আলোচনার সূত্রপাত করেন। ফলে এ বিষয়ে দেশীয়দেরও আগ্রহ দেখা দেয়।

ভারতের জনসমাজের নৃতত্ত্ব ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহী ব্রিটিশদের উদ্যোগে কলিকাতা থেকে জাতিতত্ত্ব বিষয়ক দুটি পত্রিকা *The Indian Antiquary* ও *Descriptive Ethnology of Bengal* ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হয়। যতদূর জানা যায় সে বছরই বাংলা লোককাহিনীর প্রথম মুদ্রিত আকারে প্রকাশ। *The Indian Antiquary* পত্রিকার ১ম খণ্ডে জি. এইচ ডামান্ট *Bengali Folklore From Dinajpur* নামক প্রবন্ধে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত বেশ কিছু লোককাহিনী প্রকাশ করেন। একই সময়ে ই. টি ডেল্টন কর্তৃক Descriptive Ethnology of Bengal-এ বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী সম্পর্কে একটি বিস্তৃত আলোচনা এবং কিছু লোককাহিনী প্রকাশিত হয়। এর সাথে একটি সারগর্ভ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিলো যদিও তা বাংলা লোককাহিনীর তাত্ত্বিক আলোচনা নয়। বাংলা লোককাহিনীর প্রথম সংগ্রাহক হিসাবে উপরোক্ত দু'জন ইউরোপীয় বিশেষ কৃতিত্বের দাবীদার।

বাঙালি খ্রিষ্টান পাদরি লালবিহারী দে'র *Folk Tales of Bengal* লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ সালে। এতে বেশ কিছু বাংলা লোককাহিনী অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে তাঁর সংগৃহীত ও সম্পাদিত লোককাহিনীগুলো পারস্পরিক মিশ্রণের দোষে দুষ্ট বলে উল্লেখ করেন অনেকে। অনেক কাহিনী তিনি স্মৃতি থেকে লিখেছেন বলেও জানিয়েছেন। তা ছাড়া তিনি কথকদের নাম পরিচয় উল্লেখ করেননি।

এইচ.এইচ রিজলের বাঙালি জাতিতত্ত্ব বিষয়ে দু'খন্ডে প্রকাশিত গ্রন্থ *The Tribes and Castes of Bengal*-এ অনেকগুলো বাংলা লোককাহিনী অন্তর্ভুক্ত হয়। এটি কলিকাতা থেকে ১৮৯২ সালে প্রকাশিত হয়।

পাদরি উলিয়াম ম্যাককুলোচের *The Bengali House-hold Tales* গ্রন্থটি বেরোয় ১৯১২ সালে, লন্ডন থেকে। এটি দক্ষিণ বাংলার ২৮টি লোককাহিনীর সংকলন। অনেক ফোকলোরবিদ ম্যাককুলোচের এই সংকলনটির প্রশংসা করেছেন। কয়েকটি কারণে ম্যাককুলোচের সংকলনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ: প্রথমত, কাহিনীগুলো সংগৃহীত হয়েছে মৌখিক ঐতিহ্য থেকে; দ্বিতীয়ত, ভারতের বিভিন্ন সংগ্রহ থেকে কাহিনীগুলোর সম্ভাব্য ভাষ্য প্রদান; তৃতীয়ত, একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিশিষ্ট সংযোজন।

Dhaka University Institutional Repository

এ ছাড়া কাশীন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর *Popular Tales of Bengal* (কলিকাতা-১৯০৫), শোভনা দেবীর *The Oriental Tales* (লন্ডন ১৯১৫), ফ্রান্সিস ব্রাডলি বার্টের Bengali Fairy Tales (লন্ডন ১৯২০) প্রভৃতি প্রথম যুগের বাংলা লোককাহিনী সংকলন হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৭ থেকে পরবর্তী সময়ে লোককাহিনী সংগ্রহে অগ্রগতি দেখা দেয়। বিশেষত বাংলা একাডেমী বিভিন্ন অঞ্চলে সংগ্রাহক নিয়োজিত করে প্রচুর সংখ্যক লোককাহিনী সংগ্রহ করে। ১৩৭০ সাল থেকে *লোক সাহিত্য সংকলন* শিরোনামে বিভিন্ন খণ্ডে একটি সংকলন প্রকাশ করতে থাকে। বাংলা একাডেমীর লোকসাহিত্য সংকলনগুলোর পরিচয় নেয়ার পূর্বে পঞ্চাশের দশক থেকে এ পর্যন্ত বাংলা একাডেমী ও বিভিন্ন প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত অন্যান্য সংকলন গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা দরকার।

১৯৫৩ সালে "পাকিস্তানের লোককাহিনী" নামক একটি সংকলন প্রকাশিত হয় পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা কর্তৃক। এ গ্রন্থে পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের লোককাহিনীসহ বাংলাদেশের পাঁচটি কাহিনী গ্রন্থিত হয়। কাহিনীগুলো প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন গাঁথার গদ্যরূপ।

১৩৬৪ সালে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয় পল্লী কবি রওশন ইজদানীর *মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য*। এতে লোকসাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা ছাড়াও কয়েকটি লোককাহিনী সংযোজিত হয়। পরবর্তীকালে রওশন ইজদানীর মত আরো দু-একজন একই গ্রন্থে লোককাহিনী ও তার আলোচনা সন্নিবেশিত করে প্রকাশ করেছেন।

এর পর কবি জসীমউদ্দিনের সংগৃহীত ও সম্পাদিত, তিতাস বুক ঢাকা কর্তৃক ১৯৬০ সালে প্রকাশিত *বাঙালীর হাসির গল্প*-এর উল্লেখ করা যায়। এতে অন্তর্ভুক্ত হয় বাংলাদেশের ২৭টি হাসির গল্প। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হয় ২৪টি গল্প; ১৩৮১ সালে আদিল ব্রাদার্স তা প্রকাশ করে। মুহাম্মদ মনসুর উদ্দিনের *শিরনী*-র বাংলা একাডেমী সংস্করণের প্রকাশ কাল ১৯৮১। তবে গ্রন্থটি বিভাগ পূর্বকালেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো। এতে মোট তিনটি লোককাহিনী সংকলিত হয়।

ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী কর্তৃক সংগৃহীত, কিশোরগঞ্জ এলাকার ৩০টি লোককাহিনীর সংকলন *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে। এ বইটির প্রকাশক বাংলা একাডেমী। আশরাফ সিদ্দিকীর সংকলনটিতে অনেকগুলো জনপ্রিয় কাহিনী প্রকাশিত হয়। তিনি আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তে সাধু বাংলায় কাহিনীগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন। বাংলা একাডেমী থেকে *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী*-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৫ সালে। দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনীর সংখ্যাও ৩০টি যার মধ্যে হাস্যরসাত্মক ১৯টি কাহিনী যুক্ত হয়েছে। এ সংকলনের কাহিনীগুলোও সাধু ভাষায় লিখিত। তবে উদ্ধৃতিতে আঞ্চলিক বাক্‌ভঙ্গি ব্যবহার করা হয়েছে। আশরাফ সিদ্দিকী দ্বিতীয় খণ্ডে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা যুক্ত করেছেন যা লোককাহিনীর গবেষকদের প্রভূত উপকারে আসবে বলে ধরে নেয়া যায়।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জমানের সম্পাদনায় *যশোহরের লোককাহিনী* ১৯৭৮ সালে এবং *ঢাকার লোককাহিনী* প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালে। উভয় সংকলনের প্রকাশক বাংলা একাডেমী। *যশোহরের লোককাহিনী* -তে মোট পাঁচটি কাহিনী অন্তর্ভুক্ত হয়। *ঢাকার লোককাহিনী* সাত খণ্ড 'চূড়ামণি'সহ মোট তিনটি লোককাহিনীর সংকলন। তবে চূড়ামণি

Dhaka University Institutional Repository
কাহিনীটি সাতটি বিভিন্ন কাহিনীর সমন্বয়। ফলে এ গ্রন্থের লোককাহিনীর সংখ্যা দাড়ায় নয়-এ। সম্পাদক গ্রন্থটিতে কথকদের সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ একটি ভূমিকা যুক্ত করেছেন। প্রথম ও তৃতীয় কাহিনী সাধু ভাষায় লিখিত হওয়া সত্ত্বেও আঞ্চলিক বাক্‌ভঙ্গি ব্যবহার করার ফলে কাহিনীগুলোর রসস্ফূর্তিতে ব্যাঘাত ঘটে না। এটি বাংলা লোককাহিনীর একটি উৎকৃষ্ট সংকলন বলে গণ্য হতে পারে।

অন্যান্য লোককাহিনী সংকলনের মধ্যে হোসেন উদ্দিন হোসেনের *যশোর জেলার কিংবদন্তী* (ঢাকা বুক সোসাইটি, ১৯৭৪), ডঃ আশরাফ সিদ্দিকীর *কিংবদন্তির বাংলা* (খান ব্রাদার্স, ১৯৭৬), শামসুল ইসলামের *বাংলাদেশের কিংবদন্তী* (বুক সোসাইট, ১৯৭৬) ও *ভাটিদেশের কিংবদন্তী* (ঢাকা কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ১৯৭৯), নুরুল ইসলাম পাটোয়ারীর সম্পাদনায় *বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি: কথকতা* (ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৬), হাবিবুল্লাহ পাঠান কর্তৃক সম্পাদিত *বাংলাদেশের লোককাহিনী* (তিন খণ্ড, গ্রন্থ সুহৃদ প্রকাশনী, ১৯৯৬, '৯৭ ও '৯৮) প্রভৃতির নাম করা যায়। হাবিবুল্লাহ পাঠানের তিন খণ্ড সংকলনে মোট ৭২ টি কাহিনী সংকলিত হয়েছে। এসব কাহিনী নেত্রকোনা, নরসিংদী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে প্রচলিত মৌখিক রূপ থেকে গৃহীত এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত। সংগ্রাহক-সম্পাদক প্রতিটি খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত কাহিনীর মোটিফ ও টাইপ উল্লেখসহ কথকদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেছেন। হাবিবুল্লাহ পাঠানের উপরোক্ত সংকলনটি আমাদের লোককাহিনী সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য কাজ বলে বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে।

বাংলাদেশে লোককাহিনীর সংগ্রহ সম্পর্কে উপরের আলোচনা খুবই সংক্ষিপ্ত। এর বাইরেও কিছু সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্যে এবং ভূমিকার কলেবরের কথা বিবেচনায় রাখায় প্রকাশিত সমস্ত লোককাহিনীর সংকলন আলোচনায় আনা সম্ভব হয়নি।

এ যাবত যেসব লোককাহিনী সংকলন আলোচিত হলো তার অনেকগুলো সাধু ভাষায় লিখিত। আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তে সাধু বা চলতি ভাষায় লোককাহিনী লিপিবদ্ধ করলে তার মাধুর্য ও রস ক্ষুণ্ন হয়। যে আঞ্চলিক ভাষার মৌখিক ঐতিহ্যে কাহিনী লালিত হয় তা থেকে বিচ্ছিন্ন করলে কাহিনীর অভ্যান্তরস্থ স্বতস্ফূর্ত প্রাণাবেগ আড়ষ্ট হয়ে তার সংক্রমণ ক্ষমতা অনেকটাই হারিয়ে ফেলে।

লোককাহিনী সংগ্রহ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা একাডেমী ১৩৭০ সাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বিভিন্ন সংগ্রাহকের মাধ্যমে বহু লোককাহিনী সংগ্রহ করেছে। লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার উপকরণের সাথে সে সব লোককাহিনীও সম্পাদন করে *লোক সাহিত্য সংকলন* নামে বিভিন্ন খণ্ডে সেগুলো প্রকাশ করে চলেছে। (এখন *লোক সাহিত্য সংকলন*-এর পরিবর্তে *ফোকলোর সংকলন* নামটি ব্যবহৃত হচ্ছে।) লোক সাহিত্য সংকলনের যে সব খণ্ডে লোককাহিনী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলো হলো : ২য় খণ্ড, ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৮ম খণ্ড, ১০ম খণ্ড, ২৪শ খণ্ড, ৩০শ খণ্ড, ৩১শ খণ্ড, ৩২শ খণ্ড, ৩৩শ খণ্ড, ৩৫শ খণ্ড, ৩৮শ খণ্ড, ৩৯শ খণ্ড, ৪২শ খণ্ড এবং বাংলা একাডেমীর ফোকলোর সংকলন-৭১।

বাংলা একাডেমীর *লোকসাহিত্যে সংকলনের* ২য় ও ৩য় খণ্ডে মোট তিনটি মাত্র কিস্‌সা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে দুটি পরস্পরের পাঠান্তর। ৮ম খণ্ডে বিভিন্ন অঞ্চলের জোলার কিস্‌সা, ১০ খণ্ডে কিংবদন্তী, ২৪শ খণ্ডে সওদাগরের কাহিনী, ৩০ খণ্ডে শিয়ালের কিস্‌সা, ৩২শ খণ্ডে রূপকথা, ৩৫শ ও ৪২শ খণ্ডে পশু-পাখির কিস্‌সা ইত্যাদি লোককাহিনী

Dhaka University Institutional Repository
সংকলিত হয়েছে। প্রকাশিত লোককাহিনী ছাড়াও বাংলা একাডেমীর সংগ্রহে আছে প্রায় এক হাজারেরও অধিক লোককাহিনী।

লোককাহিনীর সংগ্রহের তুলনায় বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছে খুবই কম; বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আলোচনা করেছেন হাতেগুনা দু'একজন মাত্র। আসলে লোককাহিনীর বিভিন্ন দিক নিয়ে পদ্ধতি-নির্ভর গবেষণার ঐতিহ্য এখনো আমাদের দেশে গড়ে উঠেনি।

বাংলা লোককাহিনী নিয়ে প্রথম আলাচনা করেন দীনেশচন্দ্র সেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতায়। এই বক্তৃতাগুলো পরে "দি ফোক-লিটারেচর অব বেঙ্গল" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এর পর এ বিষয়ে কিছু কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে যার কোনটিতেই লোককাহিনীর পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ নেই। তবে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর *গল্পের রূপান্তর* এবং *গল্পের জন্মান্তর* প্রবন্ধ দু'টি দেশান্তরে লোককাহিনীর বিস্তার এবং এর রূপান্তর সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ।

আমাদের দেশে পঞ্চাশের দশকে লোককাহিনীর আলোচনা শুরু হয়। ১৩৫৭ সালের কার্তিকে দিলরুবা পত্রিকায় অধ্যাপক আবু তালিব *কয়েকটি পল্লী গ্রাম্য গল্প* প্রবন্ধে পাঁচটি গল্প প্রকাশ করেন। ১৩৬০ সালের মাঘ মাসে আজাদ পত্রিকায় রওশন ইজদানী লিখেন *মোমেনশাহীর লম্বা কিস্‌সা*। এতে তিনি কিস্‌সার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে তাদের পরিচয় তুলে ধরেন। ১৩৬৪ সালে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয় তার *মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য* গ্রন্থটি। এতে বেশ কিছু কাহিনী এবং সে সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পায়। তবে রওশন ইজদানী পাড়াগাঁয়ের কথকদের মনোভঙ্গি মেনে নিয়েই লোককাহিনীর আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। পদ্ধতিগত বৈজ্ঞানিক আলোচনা সেখানে অনুপস্থিত। লোককাহিনীর শ্রেণীবিন্যাসে তিনি একেবারেই বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য-নির্ভর। যেমন তিনি 'পাড়াগাঁয়ের লম্বা কিস্‌সা', 'শিলকী কিস্‌সা' ইত্যাদি নামে কিছু কাহিনী পরিবেশন করেছেন।

১৩৭০ সাল পর্যন্ত লোককাহিনী সম্পর্কে আরো কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে প্রায় অর্ধেক-সংখ্যক প্রবন্ধের লেখক আশরাফ সিদ্দিকী। অন্যান্য প্রবন্ধকারের মধ্যে রওশন ইজদানী, আতোয়ার রহমান ও আবু তালিব উল্লেখযোগ্য।

বাংলা লোককাহিনী বিষয়ে গ্রন্থাকারে প্রথম বিস্তৃত আলোচনা করেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর *বাংলার লোকসাহিত্য* গ্রন্থে। অবশ্য রওশন ইজদানীর *মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য* গ্রন্থটিও-এর সমসাময়িক। ভট্টাচার্য মহাশয়ের *বাংলার লোকসাহিত্য* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। বাংলায় ভট্টাচার্য মহাশয়ই প্রথমবারের মতো লোককাহিনীর সংজ্ঞা প্রদান এবং বিভিন্ন ধাঁচের কাহিনীর স্বাতন্ত্র্য-নির্ণায়ক বৈশিষ্টসমূহ নির্দিষ্টকরণ ও লোককাহিনীর শ্রেণীবিন্যাসের চেষ্টা চালান। তবে তাঁর আলোচনায় প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি-নির্ভরতার চেয়ে সজ্ঞা ও আবেগ বেশি প্রভাব ফেলেছে।

Dhaka University Institutional Repository
আমাদের দেশে প্রথমবারের মতো লোককাহিনীর বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা করেন ড: আশরাফ সিদ্দিকী। তাঁর *লোক-সাহিত্য* গ্রন্থটি বাংলাদেশে লোককাহিনীর প্রথম রীতিসম্মত আলোচনা। এতে লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখা এবং লোককাহিনী সম্পর্কে দেশ বিদেশের পণ্ডিতদের মতামতসহ বিশ্লেষণ সংযোজিত হয়। অন্যদিকে, বাংলা লোককাহিনীর প্রথম তুলনামুলক আলোচনা করেন জার্মান পন্ডিত ডি. টি. র‍্যালফ তাঁর "এ কম্পারেটিভ স্টাডি অব বেঙ্গল ফোকটেল" গ্রন্থে। এটি ইন্ডিয়ান ফোকলোর সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

ড: মযহারুল ইসলাম বাংলা লোককাহিনী সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে। তাঁর *পূর্ব-পাকিস্তানের লোককাহিনী* প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। এটি টাইপ, মটিফ ও আলোচনাসহ লোককাহিনীর সংকলন। তিনি তাঁর *লোককাহিনী সংগ্রহের ইতিহাস* গ্রন্থটিতে ১৮৩৮ ও ১৯৬০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে লোককাহিনী সংগ্রহের প্রচেষ্টার ইতিহাস বিধৃত করেছেন। *ফোকলোর: পরিচিতি ও পঠন-পাঠন* গ্রন্থটিতে লোককাহিনী বিষয়ে মযহারুল ইসলামের আলোচনায় পাণ্ডিত্যের ছাপ লক্ষ্যনীয়। ওখানে তিনি লোককাহিনীর পঠন-পাঠনের আন্তর্জাতিক রীতিনীতির আলোচনাসহ লোককাহিনী সম্পাদন ও সংগ্রহ-পদ্ধতি এবং লোককাহিনীর বিশ্লেষণে বিশ্বের বরেণ্য গবেষকদের তত্ত্ব সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন।

১৯৭৫ সালে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয় আবদুল হাফিজের *বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য* গ্রন্থটি। এই গ্রন্থটিতে লোককাহিনী বিষয়ে কিছু আলোচনা সংযোজিত হয়েছে। 'মনো:সমীক্ষণ ও লোককাহিনী' এবং 'লোকসংস্কার ও ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী' অধ্যায় দুটিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন লেখক। 'লোকসংস্কার ও ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী' অধ্যায়ে বেশ কিছু ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনীও প্রকাশ করেছেন।

আবদুল হাফিজের *লোককাহিনীর দিক্-দিগন্ত* বাংলায় লোককাহিনীর আলোচনায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। আন্তর্জাতিক তত্ত্ব ও গবেষণাসমূহ বিবেচনায় রেখে তিনি তাঁর *লোককাহিনীর দিক-দিগন্ত* বইটিতে লোককাহিনীর আন্তর্জাতিক ও এদেশীয় পঠন-পাঠনের নাতিদীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরেন। লেখক গ্রন্থের 'লোককাহিনীর তুলনামূলক আলোচনা' অধ্যায়ে এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক মতামত প্রদানসহ তুলনামূলক আলোচনার পদ্ধতিটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যাখা করেছেন। বইটি মুক্তধারা কর্তৃক ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয়।

লোককাহিনী সংগ্রহ ও গবেষণার প্রথম পর্যায় থেকে শুরু করে ৬০-এর দশক পর্যন্ত এ বিষয়ে যে সব মতামত, তত্ত্ব ও পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায় বইটিতে। লোককাহিনীর উদ্ভব, দেশান্তরে প্রচার প্রভৃতি বিষয়ে আবদুল হাফিজের বইটিতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। লোককাহিনী বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কেও তিনি আলোকপাত করেছেন। আবদুল হাফিজের বইটি শুধু লোককাহিনী সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক তত্ত্ব ও তথ্যাবলীর জন্যই বিশিষ্ট নয়, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার মৌলিক ধ্যানধারনাও সিরিয়াস পাঠকের মনোযোগ দাবী করে।

লোককাহিনী সম্পর্কে আরো অনেকেই লিখেছেন। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক আবু তালিব, আতোয়ার রহমান, আবদুল জলীল, আমিনুল হক প্রমুখের নাম করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository
বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তু নিয়ে ইতোপূর্বে কোনো কাজ হয়নি। এ বিষয়ে অধিকতর সাজুয্যপূর্ণ প্রকাশনা হলো সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদের *ছড়ায় বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি* গ্রন্থটি। তবে মোহাম্মদ শাহেদ শুধু লোক-ছড়ায় তার গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখেননি, আধুনিক ছড়া থেকে প্রাপ্ত তথ্যও ব্যবহার করেছেন। সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদের গবেষণা ছাড়া বাংলা লোকসাহিত্যের ভিত্তিতে বাঙালি সংস্কৃতির অনুসন্ধান আর হয়নি। তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে অনেকে আলোচনা করেছেন। এসব প্রকাশনার দু-একটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করছি।

বাংলার লোকসংস্কৃতি বিষয়ে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ডঃ মুহম্মদ আবদুল হাই কর্তৃক ইংরেজিতে লিখিত *Traditional Culture in East Pakistan* প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এতে লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, লোকশিল্পকলা, খেলাধূলা ইত্যাদি নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়। এটি বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোকসম্পাতকারী একটি গ্রন্থ। তবে তা বাঙালি সংস্কৃতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও পদ্ধতিভিত্তিক আলোচনা নয়।

বাংলার আদিবাসীদের সংস্কৃতি নিয়ে আবদুস সাত্তার বিস্তর লিখেছেন। তাঁর *আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য* (বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), *আরণ্য সংস্কৃতি* (মুক্তধারা, ১৯৭৭), *গারোদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য* (বাংলা একাডেমী, ১৯৮০) প্রভৃতি গ্রন্থ উপজাতি সংস্কৃতি নিয়ে মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। এ ক্ষেত্রে মাহমুদ শাহ কোরায়শীর *Tribal Culture in Bangladesh* (ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী. ১৯৮৪) আরেকটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

সংস্কৃতি সম্পর্কিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আহমদ শরীফের *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ* (মুক্তধারা, ১৯৭৭) উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। লেখকের পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা ও বিশ্লেষণ বাঙালি সংস্কৃতির মূল সন্ধানের পথে যে কোনো গবেষকের সহায়ক হবে। তা ছাড়া আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে সাহিত্যের সাক্ষ্য ব্যবহার করে তিনি এ বিষয়ক গবেষণায় তথ্যের উৎস বৃদ্ধি করেছেন।

বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনায় ডঃ ওয়াকিল আহমদের *বাংলার লোকসংস্কৃতি* একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। বইটি বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয়। সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ে অনুপুঙ্খ পরিচয়-সমৃদ্ধ একটি বিশাল ভূমিকাসহ আটটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তিনি বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলাচনা করেছেন। তিনি উভয় বাংলার লোকসংস্কৃতিকেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। চিত্র ও নকশা, লোকনৃত্য, লোকবাদ্যযন্ত্র, লোকাচার, ব্যাধি ও মৃত্যু, চাষাবাদ ও ফসল, গবাদি পশু, লৌকিক পীরবাদ, লোকবিশ্বাস-লোকসংস্কার এবং লৌকিক খেলাধূলা—এ কয়টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁর গ্রন্থে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে বহু নতুন তথ্য উন্মোচিত হয়ছে গ্রন্থটিতে। বাঙালির লোকসংস্কৃতি বিষয়ে ওয়াকিল আহমদের বইটি সম্ভবত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা।

ইংরেজি ভাষায় লিখা, এম.এ. রহিমের *Social and Cultural History of Bengal* -এর মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান-কৃত বাংলা অনুবাদ *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* মধ্যযুগের বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ১৯৮২ সালে বাংলা একাডেমী থেকে বইটি প্রকাশিত হয়েছে। লেখক গবেষণায় অন্যান্য উৎসের পাশাপাশি সাহিত্য থেকে প্রাপ্ত প্রচুর তথ্যও ব্যবহার করেছেন। বইটিতে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজের সমাজ সংগঠন, ধর্মবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, আনন্দোৎসব প্রভৃতি সম্পর্কে

Dhaka University Institutional Repository

বিস্তারিত আলোচনা সংযোজিত হয়েছে। তিনি বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশের প্রক্রিয়া সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। তাঁর গ্রন্থটি বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটি আকর গ্রন্থ বলে বিবেচিত হতে পারে।

তবে এসব গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার সাথে বর্তমান গবেষণার ব্যাপক পার্থক্য রয়ে গেছে। আমাদের লক্ষ্য লোককাহিনীতে বর্ণিত তথ্যের ভিত্তিতে বাঙালির সংস্কৃতির রূপটি তুলে ধরা। তাই সংস্কৃতির প্রায় অধিকাংশ উপাদান সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে এখানে। অন্যদিকে, পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলোতে সংস্কৃতির বিশেষ বিশেষ দিকের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ডঃ আহমদ শরীফ ও সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ব্যাতিত অন্যদের সবাই সম্ভাব্য সব উৎস--যেমন ইতিহাস, সংরক্ষিত নমুনা, প্রাচীন লিপিমালা, জীবিত নমুনা, চিত্রাবলী প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন। বর্তমান গবেষণায় শুধু লোকাহিনীকেই উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে । এটি গবেষণার সীমাবদ্ধতাও বটে।

তবে বাঙালির সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ে উপরোক্ত পণ্ডিতদের আলোচনা-মতামত বর্তমান গবেষণায় পরোক্ষভাবে সহায়তা করছে। বিশেষ করে এসব গ্রন্থের পরিবেশিত তথ্যের সাথে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের সত্যসত্য যাচাইয়ের সুযোগ হয়েছে।

সংস্কৃতি

মানববিদ্যার বিভিন্ন ধারণা ও পরিভাষাসমূহের মধ্যে অন্যতম জটিল ও অস্পষ্ট একটি পরিভাষা হলো 'সংস্কৃতি'। এ জটিলতার দু'টো দিক আছে। অপেক্ষাকৃত সরল ও সাময়িক সমস্যাটি হলো অনেকে সংস্কৃতি বলতে কেবল শিল্পকলাকেই বুঝিয়ে থাকেন। চিত্রকলা, সাহিত্য, সঙ্গীত, ভাস্কর্য, নৃত্য, অভিনয় প্রভৃতিকেই তারা সংস্কৃতির বিবেচনায় গ্রহণ করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে সংস্কৃতির এরকম সীমাবদ্ধ পরিচয় প্রতিষ্ঠার পেছনে প্রচার মাধ্যমের বিশেষ ভূমিকা আছে। আমাদের দেশের প্রচার মাধ্যমসমূহের প্রচার অনুযায়ী সংস্কৃতি হল গতানুগতিক নাচ-গান, বিচিত্রানুষ্ঠান, সিনেমা, কবিতা, নাটব, উৎসব ইত্যাদি।"[১]

এর বিপরীতে সংস্কৃতির জীবন-সম্পৃক্ত বৃহত্তর বিস্তৃতির বিষয়ও ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষিত হয়েছে। ফলে সংস্কৃতি সম্পর্কে নিছক বিনোদন ও মানস-সৃষ্টি কেন্দ্রিক মতামত শিক্ষিতজনদের মধ্যে পরিত্যক্ত হতে শুরু করেছে। এবং এ পরিবর্তনের ফলেই দেখা দিয়েছে অপেক্ষাকৃত জটিল একটি সমস্যা। তা হলো সাম্প্রতিক কালে সাধারণ আলোচনায় সংস্কৃতিকে 'সামগ্রিক জীবন-যাপন প্রক্রিয়া', 'জীবন-যাপন পদ্ধতি', 'মানব-সৃষ্ট সবকিছু', 'মানুষের সমস্ত কর্মকান্ড' ইত্যাদি অস্পষ্ট ও প্রান্তহীন ধারণায় অভিহিত করা হচ্ছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য ইত্যাদির আলোচনায় সহায়ক পরিভাষা হিসেবে সংস্কৃতির এরূপ সংজ্ঞা দিয়ে কাজ চালানো সম্ভব। কিন্তু বর্ণনা বা বিশ্লেষণের বিষয়ই হয় যদি কোনো একটি মানবগোষ্ঠী বা জাতির 'সংস্কৃতি' তাহলে প্রথমেই সংস্কৃতি পরিভাষাটির সুস্পষ্ট সীমারেখা-চিহ্নিত ভাষিক ধারণা অর্জনের প্রয়োজন যা ঐসব অভিধার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

সংস্কৃতি সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের মতামত গুরুত্বের সাথে বিবেচ্য। কারণ এরাঁই সচেতন ও আন্তরিকভাবে

[১] আবুল কাসেম ফজলুল হক, সংস্কৃতি: পুরাতন ও নতুন নিরিখে, *কর্ষণ*, অক্টোবর ২০০০, পৃ-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজবদ্ধ মানবগোষ্ঠীর আচার ও কর্মকান্ড হিসেবে সংস্কৃতিকে পর্যবেক্ষণ করেন, ব্যাখ্যা করেন এবং ভাষায় তাকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেন।

সমাজবিজ্ঞানী জোনসের মতে মানবসৃষ্ট সবকিছুর সমষ্টি হলো সংস্কৃতি। গ্রাহাম ওয়ালেস বলেছেন সংস্কৃতি হলো সংশ্লিষ্ট মানবগোষ্ঠীর চিন্তাধারা, মূল্যবোধ ও জীবনযাত্রার বস্তুগত ভিত্তির সমষ্টি। এঁরা সংস্কৃতিকে বিশেষরূপে মানব-সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মার্কসবাদীরা শ্রম ও উৎপাদনকে মানব-সভ্যতার মূল বিষয় ধরে সমাজের যৌথ কর্মকান্ডের ওপর নির্ভর করে সমাজ সংগঠনকে দু'ভাবে ভাগ করেন। ১. মৌলকাঠামো বা ভিত্তি; এতে আছে শ্রম, বিনিয়োগ উৎপাদন-ব্যবস্থা ও বন্টন প্রক্রিয়া এবং ২. উপরিকাঠামো : এতে অন্তর্ভূক্ত আছে মৌলকাঠামো কর্তৃক প্রভাবিত অন্যান্য কার্যক্রম। যেমন, রাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা--সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, চিত্রকলা ইত্যাদি। তারা দ্বিতীয় কাঠামোর আওতাভুক্ত কর্মকান্ডকে সংস্কৃতি বলে অভিহিত করেন।

দেখা যাচ্ছে জোনস বা ওয়ালেসের সংজ্ঞায় যেখানে সংস্কৃতিকে সার্বিক জীবনাচরণের সাথে যুক্ত করে, মার্কসীয় তত্ত্ব সেখানে সংস্কৃতিকে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল এবং তা থেকে উদ্ভূত কিছু বলে মনে করেন। অবশ্য ষাট ও সত্তরের দশকে লন্ডন-কেন্দ্রিক লেফ্‌ট রিভিউ ক্লাবের চিন্তাধারার প্রভাবে মার্কসবাদী সংস্কৃতি-চিন্তায় অনেক পরিবর্তন এসেছে।

সংস্কৃতি সম্পর্কে ই বি. টাইলর-এর অভিমত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তার মতে কোনো সমাজের সভ্য হিসেবে জ্ঞান, বিশ্বাস, নৈতিকতা, আইন, প্রথা ও বিবিধ অনুশীলন ও অভ্যাস যা আয়ত্ত করা হয় তার সবই হচ্ছে সংস্কৃতি।[১] টাইলর-এর সংজ্ঞার ব্যাপকতা সহজেই লক্ষ্যনীয়।

বাংলা ভাষায় সংস্কৃতি চর্চার ঐতিহ্য একশ বছরের চেয়েও পুরানো। উনিশ শতকে বাঙালি সমাজের কেউ কেউ ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে এসে জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের মত ইংরেজি Culture ধারণাটিকেও আত্মস্থ ও বাংলায় ব্যাখ্যা করার উদ্যোগ নেন। সর্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংরেজী Culture শব্দটির পরিভাষা নির্ণয় এবং অর্থ ব্যাখ্যা করেন। তা করতে গিয়ে তিনি অনুশীলনতত্ত্ব নামে একটি মতবাদ প্রচার করেন। অনুশীলন তত্ত্বের মূল কথা হলো মানুষের জৈবিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের পারস্পরিক সামঞ্জস্যমূলক প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতাই মানুষের ধর্ম এবং তাই সুখ। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন মানুষের বৃত্তিসমূহের ইতিবাচক বিকাশ হলো Culture বা অনুশীলন।

এরপর থেকে সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক আলোচনার অবতারণা হয়েছে। এর অনেক পরিভাষাও সৃষ্টি হয়েছে। যেমন যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি Culture-কে কৃষ্টি বলে অভিহিত করেছেন। এছাড়া বৈদগ্ধ্য, চিত্তোৎকর্ষ, তমুদ্দিন ইত্যাদি পরিভাষাও বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত হয়েছে। বিশের দশকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মারাঠী থেকে 'সংস্কৃতি' শব্দটি গ্রহণ করেন ইংরেজি Culture -এর প্রতিশব্দ হিসেবে।

---

[১] দ্রঃ E. B Tylor, *Primitive Culture*, London, 1873.

Dhaka University Institutional Repository

হুমায়ুন কবিরের অভিমত অনুযায়ী সংস্কৃতি হলো 'Expression of Life' - ক্রমশ উন্নততর জীবন ব্যবস্থার অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি।[১]

আমাদের দেশের এ-কালের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ মোতাহের হোসেন চৌধুরী সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে, সংস্কৃতি মানে হলো জীবনের বৈচিত্রের স্বাদ নিয়ে সুন্দর ও মহতভাবে বাঁচা। প্রকৃতি-সংসার ও মানব-সংসারের মধ্যে অসংখ্য অনুভূতির শিকড় চালিয়ে দিয়ে বিচিত্র রস টেনে নিয়ে বাঁচা।

লক্ষ্যণীয় যে, সংস্কৃতি সম্পর্কে উপরোক্ত আলোচনাসমূহের সারকথা হলো সংস্কৃতি মানে সুন্দর ও ভালো ভাবে বাঁচার জন্য জীবনের ইতিবাচক চর্চা বা অনুশীলন এবং সে জন্যে মানুষের বৃত্তিসমূহের সুন্দর বিকাশ। সংস্কৃতি সম্পর্কিত উপরোক্ত ধারাণাটি সাম্প্রতিক চিন্তাধারার তুলনায় একপার্শ্বিক যা শুধু সংস্কৃতির একটি তাত্ত্বিক দিক উন্মোচিত করে।

সংস্কৃতির সাম্প্রতিক ধারণা অনেক ব্যাপক যা মানুষের তাবত জীবনাচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট। সংস্কৃতি শুধু মানুষের বৃত্তির চর্চা বা অনুশীলন নয়, জীবন যাত্রার প্রকাশিত রূপও সংস্কৃতি—এমনকি তা হতে পারে আদিম মানুষের কোন বর্বর প্রথা বা আচার।

মার্কসবাদী লেখক গোপাল হালদার সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিরূপণে মার্কসবাদী চিন্তাধারা থেকে কিছুটা সরে গিয়ে মানুষের আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড ও আচরণ এবং মনোজাগতিক সকল সৃষ্টিকেই সংস্কৃতির আওতাভূক্ত করেন। তিনি বলেন সংস্কৃতি হচ্ছে প্রকৃতির দাসত্ব হতে মুক্ত হওয়া, অর্থাৎ জীবিকা আয়ত্ত এবং সহজসাধ্য করা। এখানে জীবিকা আয়ত্ত ও সহজ করার মধ্যে মানুষের উৎপাদন ব্যবস্থা, বসবাস, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সামাজিক রীতিনীতিও এসে পড়ে। তিনি আরো পরিষ্কার করে বলেন, "সংস্কৃতি বলিতে তাই শুধু যে ঘরবাড়ি ধন-দৌলত, যানবাহন বুঝায় তাহাও নয়। শুধু যে রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান বুঝায় তাহাও নয়। সংস্কৃতি বলিতে মানস সম্পদও বুঝায়--চিন্তা,কল্পনা, দর্শন, ধ্যান-ধারণা, এই সবও বুঝায়—তাহাও আমরা জানি। আসলে বাস্তব ও মানসিক সমস্ত 'কৃতি' বা সৃষ্টি লইয়াই সংস্কৃতি--মানুষের জীবন সংগ্রামের মোট প্রচেষ্টার এই নাম।"[২]

সংস্কৃতি সৃজন প্রক্রিয়ায় তাই মানুষের অন্তর্জগত ও বহির্জগত দুই-ই সমানভাবে সক্রিয়। মানুষ যা করে বা করতে চায় তা প্রথমে তার মানসজগতে ভাষা ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে জন্ম নেয়। পরে তা কার্যে রূপান্তরিত হয়। বলা যেতে পারে "সংস্কৃতির উৎস একদিকে মানুষের অন্তর্জীবন—তার চেতনা, তার আত্মসচেতনতা, তার নিজের চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তি, শ্রেয়সের চেতনা ও সজ্ঞান প্রয়াস; অপরদিকে বহির্জগত—সামাজিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, ঘটনাপ্রবাহের অন্তর্গত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও গতিধারা এবং ঐতিহ্য।"[৩]

সংস্কৃতি সম্পর্কে পণ্ডিতদের মতামত ছাড়াও সাংগঠনিক ধ্যান ধারনা গড়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার গৃহীত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৮২ সালে মেক্সিকো শহরে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর আন্ত র্জাতিক সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয় :

---

[১] Humayun Kabir, *The Indian Heritage*, Bombay, 1962, p-37-38।

[২] গোপাল হালদার, *সংস্কৃতির রূপান্তর*, মুক্তধারা ১৯৭৪, পৃ-৪১।

[৩] আবুল কাসেম ফজলুল হক, সংস্কৃতি: পুরাতন ও নতুন নিরিখে, পূর্বোক্ত, পৃ-১৯।

Dhaka University Institutional Repository

" ব্যাপকতর অর্থে সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতি বা সামাজিক গোত্রের বিশিষ্টার্থক আত্মিক, বস্তুগত, বুদ্ধিগত এবং আবেগগত চিন্তা ও কর্মধারার প্রকাশ। শিল্প ও সাহিত্য মাত্র সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয়। মানুষের জীবন ধারাও সংস্কৃতির অঙ্গ। মানুষের অধিকার, মূল্যবোধ, ঐতিহ্যও সংস্কৃতির অঙ্গ। . . . . .

একটি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে যে সমস্ত বিষয় গণ্য হবে তা হচ্ছে শিল্পীদের শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্যিকদের সাহিত্যসাধনা, স্থপতিদের নির্মানকর্ম, সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গীত, নৃত্য-শিল্পীদের নৃত্য-ব্যঞ্জনা, বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার এবং অনুসন্ধানকর্ম, মানুষের ধর্মবোধ এবং সেই সমস্ত মূল্যবোধের সুকৃতি যা জীবনকে অর্থ দান করে। অধিগম্য এবং অনধিগম্য সকল কর্ম, মানুষের ভাব প্রকাশের ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি, বিশ্বাস, ঐতিহাসিক নিদর্শন, নৃ-তত্ত্ব, গ্রন্থাগার —সব কিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।"[১]

ইউনেস্কোর উপরোক্ত সংজ্ঞায় সংস্কৃতির যে সমস্ত ধারনা দেয়া হয়েছে তা বিশেষভাবে বিবেচ্য। এ প্রসঙ্গে আমরা টাইলরের সংজ্ঞাও স্মরণ করতে পারি। টাইলর সংস্কৃতিকে তিনটি শ্রেণীতে ফেলে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন : ১. বস্তু সংস্কৃতি (Material Culture) ২. আচারমূলক সংস্কৃতি (Functional Culture) ৩. মানস সংস্কৃতি (Spiritual Culture)।[২] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও টাইলরের সংজ্ঞা অনুসরণ করে সংস্কৃতির পরিচয় নির্ধারণ করেছেন।[৩]

টাইলরের অনুসরণে ডঃ ওয়াকিল আহমদ সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন: সংস্কৃতি একাধারে জীবন-যাত্রার নিয়ম-পদ্ধতি, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, ধর্মকর্ম, প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ, শিক্ষাদীক্ষা, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি; অন্যদিকে, জীবন যাপনের যাবতীয় বস্তু উপকরণ তথা— ঘরবাড়ি, খাদ্যদ্রব্য, আসবাবপত্র, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, বস্ত্র-অলংকার ইত্যাদি; তৃতীয়ত— মানস-ফসল যথা সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা,মূর্তি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি। এসব কিছুর সমন্বয় হলো সংস্কৃতির সাধারণ পরিচয়।[৪]

ডঃ ওয়াকিল আহমদের সংজ্ঞায় সংস্কৃতির ব্যাপকতর পরিধি স্পষ্ট হয়ে উঠে। এ সংজ্ঞাটিতে টাইলর, গোপাল হালদার, ও ইউনেস্কো নির্দেশিত সকল সাংস্কৃতিক উপাদান উপস্থিত। সমাজ-কাঠামো—মানুষের জীবনযাত্রার রীতিনীতি, জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত উপকরণাদি এবং তার আত্মার সৃজনশীল অভিব্যক্তি—তিনটি দিকই সংজ্ঞাটিতে নির্দেশিত।

বর্তমান গবেষণায় সংস্কৃতির উপদানসমূহ নির্ধারণের জন্য ই. বি. টাইলর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, ইউনেস্কো এবং ডঃ ওয়াকিল আহমদ-এর সংজ্ঞার সাহায্য নেয়া হয়েছে এবং সংস্কৃতির এ পরিধি মেনেই প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণসমূহের অবতারণা করা হয়েছে।

---

[১] *বাংলাদেশ জাতীয় সংস্কৃতি কমিশন রিপোর্ট*, ১৯৮৯, পৃ-১৩-১৫।

[২] দ্র: E. B. Tylor, *Primitive Culture*, London, 1873.

[৩] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,*ভারত সংস্কৃতি*, কলিকাতা, ১৩৭০, পৃ-১১৩-১১৫।

[৪] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ ২-৩

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক কালে, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিভিন্ন অঞ্চল ও মানব-গোষ্ঠীর দূরত্ব অভাবনীয়ভাবে হ্রাস করে দিয়েছে। তেমনি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং জাতীয়তাবাদের বিকাশের কারণে একই অঞ্চলে ও একই ভাষাভাষী বিভিন্ন গোত্র বা ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর স্বাতন্ত্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থানও বৃহত্তর একক রাজনৈতিক-সামাজিক পরিচয়ের মধ্যে অনেকখানি বিলীন হয়ে গেছে। পৃথিবীর দেশে দেশে ভৌগলিক নৈকট্য, ভাষা, ধর্ম বা রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা---যে কারণেই বৃহত্তর জাতীয়বাদী ঐক্যের সূচনা হয়ে থাকুক না কেন তা শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণী-গোত্রের ও ধর্মের মানুষদেরকে একটি একক রাজনৈতিক ও জাতীয় পরিচয়ের পাশাপাশি অভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিচয়েও আবদ্ধ করে। এই বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধই জাতীয় সংস্কৃতির মূল। বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের, গোত্রের মানুষদের স্ব-স্ব স্বাতন্ত্রিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ পরস্পরকে প্রভাবিত পরিবর্তিত করে যে নতুন একক সাংস্কৃতিক ভিত্ জন্ম নেয় তাই আধুনিক কালের জাতীয় সংস্কৃতি।

বহু গোত্র-ধর্মের এবং বহু ভাষাভাষী মানুষের সম্মিলনে নতুনতর একক সাংস্কৃতিক ঐক্য অর্জনের বড় নজির ভারতীয় সংস্কৃতি। পরিষ্কার করে বললে বলতে হয় প্রধানত রাষ্ট্রীয় (পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মানুষদের জাতীয় সংস্কৃতি) এবং কখনো কখনো কেবল রাজনৈতিক ঐক্যবোধ (যেমন ১৯৭১ পূর্ব বাংলাদেশের জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐক্য) বিবিধ স্রোতের মানুষকে একই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে গ্রথিত করেছে। সংস্কৃতি প্রসঙ্গে আলোচিত ইউনেস্কোর মেক্সিকো সম্মেলন- ১৯৮২-তে সংস্কৃতি সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্ত মূলত জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতি এবং আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান তৈরি হয়েছে। তবে "কোন জাতির সংস্কৃতি ভুঁইফোড়ের মত অকস্মাৎ গজিয়ে উঠে না; জাতীয় জীবনের দীর্ঘ কালের সাধনা ও সৃষ্টির সংরক্ষণ দ্বারা এর স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ রূপ গড়ে তোলা সম্ভব।"[১] আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিও দীর্ঘকালীন ঐতিহ্যের লালন ও চর্চার মাধ্যমে দিয়ে বিভিন্ন স্রোতের মানুষের স্ব-স্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়কে কখনো মিশ্রণ কখনো আত্মীকরণের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। এতে যেমন আছে আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ছাপ, তেমনি বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের বিশিষ্টাত্মক চিহ্ন, তুর্কো-আফগান-মোঘল ঐতিহ্য এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির বিচিত্র বর্ণের সর্বগ্রাসী ছায়া। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ, '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, '৭১ সালের যুদ্ধ— এসবই প্রভাব ফেলেছে আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। তাই বর্তমান গবেষণার অনুধ্যেয় বাঙালি সংস্কৃতির সাথে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে এক করে দেখা সম্ভব নয়।

অধিকাংশ লোককাহিনীর উৎপত্তি প্রাচীন ও মধ্যযুগে। তাই বর্তমান অভিসন্দর্ভে বর্ণিত বাঙালি সংস্কৃতি মূলত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতি। সে সময় বাঙালির মন ও সংস্কৃতি দ্রুত ও ব্যাপক পরিবর্তনের মুখ দেখেনি। প্রথমে আর্য হিন্দু জনগোষ্ঠী পরে মুসলিম শাসকবর্গের আগমণে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এসেছে তা লোককাহিনী থেকেই চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। এরপরও দেখা গেছে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনেকখানিই তার অস্ট্রিক পূর্ব-পুরুষের দান। কিন্তু আজকের জাতীয় সংস্কৃতির উপর দুর্মর পাষাণের মত চেপে বসা পুঁজিবাদ ও পশ্চিমা সংস্কৃতির সর্বগ্রাসী প্রভাবের কারনে আমাদের অতীত পরিচয়টুকুও কষ্ট করে খুঁজে বের করতে হয়।

---

[১] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃ-১৬-১৭

Dhaka University Institutional Repository

লোককাহিনীর তথ্য অনুযায়ী বাঙালির যে সাংস্কৃতিক পরিচয় বিধৃত হয়েছে বর্তমান অভিসন্দর্ভে তা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি নয়। কিন্তু দীর্ঘকালীন পরিবর্তন ও ভিনদেশী প্রভাব সত্ত্বেও লোককাহিনীর বাঙালি সমাজের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের কিছু কিছু অক্ষুন্ন রয়ে গেছে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিতে। আমাদের আত্ম-পরিচয়ের বিষয়টুকু ভালোভাবে বুঝে নেয়ার জন্য সেই শিকড়ের দিকে ফিরে তাকানোর প্রয়োজন আছে।

লোককাহিনী ও সংস্কৃতি

"সকল দিক দিয়েই সংস্কৃতি হলো ভাষা": *To Write an Intransitive Verb* গ্রন্থে রোঁলা বার্থ(Roland Berth) উপস্থাপন করেন এই অনুসিদ্ধান্তটি।[১] বার্থের যুক্তি ছিলো সংস্কৃতির যে কোনো পর্যায়েই হোক না কেন তা ভাষার মতই কতগুলো চিহ্ন দ্বারা গড়ে ওঠে এবং বিশেষ কাঠামো পায়। ভাষা যেমন কিছু চিহ্নের মধ্য দিয়ে শব্দ, বাক্য ইত্যাদির আকারে অর্থ সঞ্চারের ক্ষমতা লাভ করে, তেমনি সংস্কৃতিও নির্দিষ্ট কিছু চিহ্নের সমন্বয়ে বোধগম্য কাঠামো গড়ে তোলে। অবশ্য বার্থের এই বক্তব্যের ভিত্তি ছিলো নৃ-তাত্ত্বিক ক্লদে লেভি স্ট্রশের এই ধারণা যে, পৃথিবীর যাবতীয় মানবসমাজের সংগঠন ভাষিক সংগঠনের অনুরূপ।

বার্থের মতানুযায়ী ভাষিক সংগঠনের আলোকে সংস্কৃতি বিশ্লেষণযোগ্য কি না সে বিতর্কে না গিয়ে অনুসিদ্ধান্তটির সাধারণ ভাষিক অর্থকে গুরুত্ব দেয়ার জন্যই এখানে বার্থের উক্তিটি উদ্ধৃত করা হলো। বার্থের বক্তব্যের সাধারণ অর্থের সূত্র ধরেও বলতে পারি, বর্তমান গবেষণায় সংস্কৃতি আসলে শেষ পর্যন্ত একটি ভাষিক ধারণা মাত্র। কেননা মানুষের সকল চিন্তার মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। আমরা যখন বলি 'মেয়েটি সুন্দর' তখন আমরা সেই সুন্দর মেয়েটি বা তার সৌন্দর্যের কোনো উপাদান প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ বা উপলব্ধি করতে পারি না। আমরা তখন লম্বা শরীর, মসৃণ ত্বক, আকর্ষণীয় মুখাবয়ব, সুসম দেহসৌষ্টব ইত্যাদি ভাষিক চিত্রকল্প গুলোর সাহায্যে সেই সৌন্দর্যকে মেনে নিই বা উপলব্ধি করি। অর্থাৎ মেয়েটিকে ভাষার সাহায্য ছাড়া বোঝা যাচ্ছে না, অন্যকে বুঝানোও যাচ্ছে না। এভাবে, মানুষের তাবত কর্ম, চিন্তা-ভাবনা, আবেগ অনুভূতিকে আমরা ভাষার সাহায্যে উপলব্ধি করি এবং অন্যের কাছে উপস্থাপন করি।

এভাবে দেখলে বলা যায় সংস্কৃতি সম্পর্কিত যে কোনো আলোচনাই শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনো ভাষা কাঠামোয় নির্দিষ্ট ভাষিক বর্ণনায় বিন্যস্ত তথ্য, ধারণা ও বিশ্লেষণের সমাহার। লোককাহিনীও একটি মানবগোষ্ঠীর বিশেষ ধরনের ভাষিক অভিব্যক্তি। বাস্তব-কাল্পনিক, সম্ভব-অসম্ভব, মানবিক-মানবেতর—সব ধরনের ক্রিয়া কর্মের বর্ণনার সমন্বয়ে লোককাহিনী গড়ে ওঠে। এর উদ্ভব ও বিকাশের মাধ্যম হলো ভাষা। এর লিখিত দলিলও ভাষার মাধ্যমেই আমাদের কাছে পৌঁছেছে। সংস্কৃতির যা কিছু সেখানে আছে তাও ভাষিক ধারণা হিসেবেই আছে।

দ্বিতীয়ত, লোককাহিনীর ভাষা মুখের ভাষা। মৌখিক ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট হলো এর মাধ্যমে কাহিনী গ্রথিত হলে কথক বিভিন্ন চরিত্রের কার্যকলাপের বর্ণনার সময় তাদের কণ্ঠস্বর, রুচি, নির্দিষ্ট বাক্যভঙ্গি—সবই যথাযথ প্রকাশ করার

---

[১] দ্রঃ Roland Berth, *To Write an Intransative Verb*, Maclay & Donald, Paris/London, 1972.

Dhaka University Institutional Repository
চেষ্টা করেন। সেখানে কথকের কণ্ঠস্বর অন্যান্য চরিত্রের কণ্ঠস্বরকে প্রভাবিত করে না। কিন্তু লিখিত ভাষায় লেখক তাঁর নিজের মতো করে ঘটনার বর্ণনা দেন, অন্যান্য চরিত্রের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এর অর্থ হলো মুখের ভাষায় আমরা পাচ্ছি বহু ব্যক্তির কণ্ঠস্বর অর্থাৎ তাদের ভাষাভঙ্গি। ভাষার মৌখিক রীতির এই বিশেষ গুণের জন্যই বাখতিন প্রমুখ মুখের ভাষা ও তার প্রকাশকে (যেমন লোকসাহিত্য) বেশি গুরুত্ব দেন। বাখতিন মনে করেন কোনো সমাজ ও তার নানা উপাদান সম্পর্কে সর্বোচ্চ তথ্য লাভের জন্য সেই সমাজের মানুষের মুখের ভাষা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অবলম্বন।[১] কারণ বিভিন্ন চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠস্বর ও বর্ণনাভঙ্গির মধ্য দিয়ে আমরা পাচ্ছি সমকালীন সমাজ ও জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি ও মূল্যায়ন। ভাষাই যেহেতু সকল মানবিক কর্মকান্ড প্রকাশের ও উপলব্ধির মাধ্যম তাই সে সব ব্যক্তির ভাষাভঙ্গির মধ্য দিয়ে আমরা তাদের রুচি, চিন্তা ও কল্পনা সম্পর্কে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ তথ্য লাভ করছি। মুখের ভাষার এই বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে বর্তমান গবেষণায় আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত লোককাহিনীকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

বার্থ, লেভি স্ট্রশ, বাখতিন প্রমুখের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে আমরা বলতে পারি, জীবন বা জীবনের সমস্ত কর্মকান্ড সংস্কৃতি নয়। জীবনের নির্দিষ্ট কিছু প্রবণতা, সেইসব প্রবণতায় উদ্দীপ্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং তার বস্তুগত ও অন্যান্য ফলাফলের সমন্বিত ভাষিক প্রকাশই হলো সংস্কৃতি । লোককাহিনীতে সংস্কৃতি নিজস্ব কাঠামোতে প্রকাশিত থাকে না বরং কিছু বিচ্ছিন্ন ভাষিক তথ্য হিসেবে উপস্থিত থাকে। বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য হলো সে সব তথ্য একত্রে সন্নিবেশিত করা এবং যথারীতি বিন্যস্ত করে সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির ভাষিক পরিচয় উদ্ধার করা।

বাংলা লোককাহিনীর ভূগোল ও পরিবেশ

যে ভৌগলিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে লোককাহিনীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে তা শাসন করে কাহিনীটির আভ্যন্তর ও বহির্কাঠামোকে। উদ্ভকালে সংশ্লিষ্ট মানব-সমাজের রূপ, তাদের বিশ্বাস, আচার-প্রথা, জীবন-ধারণ পদ্ধতি সবকিছুই তাতে প্রভাব ফেলে এবং প্রতিফলিত হয়। এমনকি বাইরে থেকে আসা কাহিনী দীর্ঘদিন ধরে একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক পরিবেশে কথিত হওয়ার ফলে তাতেও নতুন সমাজ ও ভৌগলিক পরিবেশের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ছাপ পড়ে; কাহিনীতে বর্ণিত উপকরণাদি, রীতিনীতি, মোটিফ ইত্যাদিও পরিবর্তিত হতে পারে। তাই যে অঞ্চলে বা সমাজে লোককাহিনীটি প্রচলিত আছে তার ইতিহাস ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনার বিভিন্ন পর্যায়ে দেখা গেছে লোককাহিনীতে প্রাপ্ত অনেক তথ্য এদেশের ইতিহাস ও ভূগোলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সে কারণে বাংলা লোককাহিনীতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ ও যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এদেশের ভূগোল ও ইতিহাসও প্রাসঙ্গিক স্থান লাভ করেছে। এখানে প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ভূগোল ও ইতিহাস, তার বাসিন্দাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি, তাদের ধর্ম, সমাজ-ব্যবস্থা ও ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সন্নিবেশিত হল।

---

[১] Maria Sevtsova, *Dialogism and Bakhtin's Theory of Culture*, NeyWork Literary History, Vol-23, No-3, The John Hopkins University, Summer, 1992

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ

বাংলাদেশের অধিকাংশ ভূ-ভাগের সৃষ্টি হয়েছে নদীবাহিত পলি দ্বারা। উত্তরের পর্বতমালা থেকে নেমে আসা ছোটো বড় বহু নদী হাজার হাজার বছর ধরে পানির সাথে পলি বয়ে এনে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছে এই বিশাল বদ্বীপটিকে। বিশেষজ্ঞদের মতে এখন থেকে কমবেশি তিন লক্ষ বছর আগেই বাংলাদেশের অধিকাংশ পলল ভূমি জেগে উঠেছিলো। অন্তত ত্রিশ হাজার বছর পূর্বে আকস্মিক ভু-তাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয় উত্তর ও পূর্ব সীমান্তবর্তী পাহাড়শ্রেণী এবং মাঝখানের উঁচু সমভূমি এলাকা। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেটের পাহাড়ি এলাকা, গাড়ো পাহাড়, বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুরের সীমান্তবর্তী অঞ্চল এবং বরেন্দ্রভূমি পলিগঠিত অবশিষ্ট অঞ্চল থেকে অনেক পুরাতন।

বর্তমান বাংলাদেশ বলতে আমরা যে দেশটিকে বুঝি, হাজার বছর আগেও তার সাথে তৎকালীন রাজনৈতিক অঞ্চলগুলোর সীমানা ও আকারে অভাবনীয় পার্থক্য ছিলো। সে সময়ে, এমনকি খ্রিষ্টের জন্মের আগে থেকে ভিন্ন নামে এদেশের নানা রাজনৈতিক সত্তা ছিলো।

অতি প্রাচীন কাল থেকে মধ্যযুগের অধিকাংশ সময় সমগ্র বাংলাদেশের কোনো একক নাম ছিলো না । এর বিভিন্ন এলাকা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিলো। এ প্রসঙ্গে ড: মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন, "বাংলা অতি প্রাচীন দেশ। ঋগ্বেদের(আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর) শাখা ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে বঙ্গ নামে এই দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন বঙ্গভূমি 'বঙ্গ', 'পুন্ড্র', 'গৌড়', 'রাঢ়', 'সুম্ম', 'তাম্রলিপ্ত', সমতট প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিলো। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্ক কর্তৃক এই জনপদগুলিকে গৌড় নামে একতাবদ্ধ করিবার প্রয়াস দেখা যায়। শশাঙ্কের পর হইতে পুন্ড্র, গৌড় ও বঙ্গ এই তিন জনপদ যেন বাংলাদেশের সমার্থক হইয়া উঠে।"[১] এ বিষয়ে প্রায় সকল পণ্ডিত-গবেষক একই রকম কথা বলেছেন।

প্রাচীন সংস্কৃত ও বাংলা রচনায় 'বঙ্গ', 'পুন্ড্র', 'গৌড়', 'রাঢ়', 'সুম্ম', 'তাম্রলিপ্তি', 'সমতট', 'হরিকেল' প্রভৃতি নামে যে সব জনপদের কথা উল্লেখ আছে সে সবের পরিবর্ধন-পরিবর্তন ও সংযোজনের মধ্য দিয়েই বর্তমান বাংলার ভৌগলিক-রাজনৈতিক বিকাশ ঘটেছে। এসব জনপদের বাসিন্দারাই আজকের বাঙালি জাতির আদিপুরুষ। ইতিহাসে এসব জনপদের যে পরিচয় পাওয়া গেছে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু তথ্য তুলে ধরা যেতে পারে।

বঙ্গ: বঙ্গ ও বঙ্গাল দেশের উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীন আর্য সাহিত্যেও । এ থেকে দেশটির প্রাচীনতা সম্পর্কে নি:সন্দেহ হওয়া যায়। বর্তমান কালের দক্ষিণবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের কিয়দংশ নিয়ে এ জনপদ বিস্তৃতি লাভ করেছিলো। তবে বিভিন্ন সময়ে এর সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে। দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে বঙ্গ ছাড়া অন্য রাজ্যের অস্তিত্বের প্রমাণও পাওয়া গেছে। তবে অধিকাংশ সময়ে পশ্চিমে ভাগিরথী, উত্তরে পদ্মা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এই চৌহদ্দির মধ্যে দেশটির ভৌগলিক আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। প্রাচীন শিলালিপিতে বিক্রমপুর ও নাব্য নামে বঙ্গের দুটি অংশের উল্লেখ পাওয়া গেছে। এগুলো যথাক্রমে বর্তমান বিক্রমপুর এবং বরিশাল-ফরিদপুরের নিম্নাঞ্চলকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকবে।

---

[১] ড: মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫, পৃ-১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন বঙ্গের নির্দেশিত সীমান এবং পূর্ব দিকে কুমিল্লা-ত্রিপুরা ও সিলেট অঞ্চল নিয়ে বিভিন্ন সময়ে হরিকেল ও সমতট নামে দুটি জনপদ ছিলো বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। এ দুটি জনপদ কখনো বঙ্গের অন্তর্গত ছোটো জনপদ আবার কখনো বা স্বতন্ত্র অঞ্চল হিসেবে বিকশিত হয়েছে।

খুব সম্ভবত ভাগিরথীর তীর থেকে শুরু করে পূর্বে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশের সমুদ্রোপকুলবর্তী অঞ্চল কিছুকাল সমতট হিসেবে পরিচিত ছিলো। তবে প্রাচীনযুগের শেষ এবং মধ্যযুগের শুরুতে সমতট কুমিল্লা ও ত্রিপুরা পর্যন্তও বিস্তৃত ছিলো। সমতটের তুলনায় হরিকেল জনপদ বা রাজ্য ছিলো স্বল্পায়ূ। সিলেটের নিম্নাঞ্চল এবং কুমিল্লা-ত্রিপুরার উত্তর সীমানায় ছিলো এর বিস্তৃতি।

সপ্তম শতকের একেবারে গোড়ায় (৬০৬/৭) হিন্দু সামন্ত শশাঙ্ক ক্রমে পূর্ববর্তী গুপ্ত রাজ্যের বিভিন্ন অংশ জয় করে বঙ্গ-গৌড়ে বিরাট রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তিনি প্রথমে উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র জনপদ গৌড়ের স্বাধীন শাসক অথবা সামন্ত ছিলেন ।

বানভট্টের হর্ষচরিত গ্রন্থে শশাঙ্ককে গৌড়াধিপতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজ্যবর্ধন নিহত হওয়ার পর শশাঙ্ক আরো জনপদ দখল করেন। ক্রমে তিনি আশপাশের সমস্ত জনপদ দখল করে এক বিরাট এলাকার রাজা হয়ে বসেন যা গৌড় নামে পরিচিতি লাভ করে। তার রাজ্যের মধ্যে সম্ভবত বঙ্গই ছিলো ছিলো সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। শশাঙ্ক ৬৩৭ সালের দিকে মারা যান।

শশাঙ্কের মৃত্যুর শ' খানেক বছর পরে আনুমানিক ৭৫০ সালে এ অঞ্চলের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী গোপাল। তিনি পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। সমগ্র পাল বংশের শাসনকালে (৭৫০-১১২০ খ্রী.) তাদের রাজ্য গৌড় হিসেবেই পরিচিত ছিলো। তবে সেন আমলে (১০৯৫- ১২০৩/৪) শশাঙ্কের পূর্বোক্ত গৌড় রাজ্য তিনটি স্বতন্ত্র নামে বিভক্ত ছিলো বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলো হলো সাতগাঁও (ভাগিরথীর তীর থেকে পূর্বে বরিশাল-ফরিদপুরের নিম্নাঞ্চল), সোনারগাঁও (বর্তমান সোনারগাঁওসহ বৃহত্তর ঢাকা) এবং লক্ষণাবতী (উত্তরবঙ্গ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ)। বখতিয়ার খিলজী এ অঞ্চল দখল করে নেয়ার পর (১২০৩/৪) থেকে প্রথম দেড়শ বছর অর্থাৎ চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ দেশটি তিনটি ভিন্ন নামেই পরিচিত ছিলো। তখন এ দেশ দিল্লীর অধীনস্থ প্রদেশ হিসেবে তিন অঞ্চলের জন্য তিনজন ভিন্ন শাসকের অধীনে শাসিত হতো।

১৩৩৮ সালে সোনারগাঁও-এর শাসনকর্তার মৃত্যুর পর তার বর্মরক্ষক ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ সোনারগাঁ দখল করে সর্বপ্রথম দিল্লীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। একইভাবে লক্ষণাবতীতে ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে শামুসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অতপর তিনি প্রথমে সাতগাঁও এবং ফখরুদ্দীনের মৃত্যুর পর সোনারগাঁও দখল করেন। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সাতগাঁও ও সোনারগাঁও প্রভৃতিসহ বিহার ও কামরূপের কতকাংশ জয় করে বিরাট এক রাজ্য গড়ে তোলেন। এ অঞ্চলের বাসিন্দারা প্রায় সকলেই ছিলো বাংলাভাষী। তিনি বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর যুক্ত অঞ্চলকে বাঙ্গালা এবং তার অধিবাসীদেরকে বাঙ্গালী নামে অভিহিত করেন। এবং দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে নিজে উপাধি নেন শাহ-ই-বাঙ্গালাহ্ বা বাংলার শাহ্। তখন থেকে সমগ্র দেশটি এককভাবে বাঙ্গালা নামে পরিচিত হতে শুরু করে।

Dhaka University Institutional Repository

পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র: পুণ্ড্র নামের একটি জনগোষ্ঠীর (নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী নয়, খুব সম্ভবত সামাজিকভাবে এরা পুণ্ড্র হিসেবে পরিচিত ছিলো) আবাসস্থল ছিলো পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র জনপদ। মৌর্য আমলের শিলালিপি থেকে দেখা যায় তখন পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র জনপদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাসনকেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। গুপ্ত আমলের শিলালিপি এবং চীনা পরিব্রাজকদের লেখা থেকে জানা যায় বর্তমান বগুড়া, রাজশাহী, এদের সংলগ্ন বর্তমান ভারতের কিয়দংশ এবং দিনাজপুরের দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র অঞ্চল বিস্তৃত ছিলো।

মৌর্য শাসনামলে পুণ্ড্রভুক্তির (ভুক্তি- শাসনতান্ত্রিক বিভাগ) অন্তর্গত পুণ্ড্রবর্ধন নগর খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে। এটি বর্তমান বগুড়ার মহাস্থানগড়ে অবস্থিত ছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। পুণ্ড্রনগর পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র জনপদের রাজধানী ছিলো। শশাঙ্কের আমলে পুণ্ড্রভুক্তি গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সেনামলে এ অঞ্চল লক্ষ্মণাবতীর অন্তর্ভুক্ত হয়। ক্রমে পুণ্ড্র নামটি লোপ পায়।

বরেন্দ্র ছিলো পুণ্ড্রের অন্তর্গত ক্ষুদ্র এক অংশের নাম। সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত*-এর বিবরণ অনুযায়ী গঙ্গা ও করোতোয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলই ছিলো বরেন্দ্র জনপদ। বরেন্দ্রী একটি অঞ্চল বিশেষের নাম হিসেবে এখনো ব্যবহৃত হয়।

রাঢ়: রাঢ়ের অবস্থান ছিলো ভাগিরথীর পশ্চিম তীরে। জৈন ধর্মগুরু মহাবীর সম্ভবত রাঢ়ে ধর্মপ্রচারের জন্য এসেছিলেন। তিনি রাঢ়ের লোকদের নিষ্ঠুর ও অসভ্য আচরণের কথা উল্লেখ করে গেছেন। এ থেকে রাঢ় জনপদটির অস্তিত্ব প্রায় ৩০০০ বছর আগে থেকে ছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। রাঢ়ের রাজধানী ছিলো কোটি বর্ষ। রমেশচন্দ্র মজুমদার মত প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বনগ্রামে প্রাচীন কোটিবর্ষ অবস্থিত ছিলো ।[১]

রাঢ় অঞ্চল কখনো কখনো সুম্ম নামে পরিচিত ছিলো। মহাবীর জনপদটিকে রাঢ় ও সুম্ম নামে উল্লেখ করছেন। রাঢ় দক্ষিণে দামোদর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো।

এছাড়া সমতট, হরিকেল, পট্টিকেরা প্রভৃতি নামেও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন সময়ে পরিচিত ছিলো। সে সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্বে কিছুটা আলোচনা করেছি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বঙ্গ ও বঙ্গাল দেশ দুটি প্রাচীন কাল থেকে বিদ্যমান ছিলো। তবে তখন এ দুটি জনপদের নামে বাংলাদেশের এক এক অংশকে বোঝাতো। শশাঙ্কের আমলে বঙ্গ জনপদটির ভৌগলিক ও রাজনৈতিক বিস্তৃতি ঘটে। তবে বঙ্গ নামের দেশটি বৃহত্তর পরিসরে ভৌগলিক-রাজনৈতিক রূপ পায় স্বাধীন সুলতানী যুগের শুরুতে, শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ-এর প্রচেষ্টায়। শামুসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের বাঙ্গালাহ্ মোটামুটি ব্রিটিশ-শাসিত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর সীমানার কাছাকাছি ছিলো। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে বাংলার এক বিরাট অংশ ভারতের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমান বাংলাদেশ গড়ে উঠে দেশটির অবিশিষ্ট বৃহত্তর অংশ নিয়ে।

---

[১] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, আদিযুগ, পঞ্চম সংস্করণ,জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবিলিশার্স প্রাইভেট. লি., কলিকাতা, ১৩৭১, পৃ-৮।

Dhaka University Institutional Repository

এ যাবত আলোচনায় দেখা গেছে বঙ্গ ও বঙ্গাল নামে দুটি দেশের অস্তিত্ব ছিলো অতি প্রাচীন কাল থেকেই। সাধারণভাবে আন্দাজ করা যায় এ দুটি নামের কোন একটি থেকেই কোনোভাবে বাংলা নামটির উৎপত্তি হয়ে থাকবে।

বাংলা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে দুটি মত প্রচলিত আছে। মধ্যযুগের ঐতিহাসিক আবুল ফজল *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, বঙ্গ থেকে বাঙ্গালা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। তার মতে প্রাচীন কালে নিচু ভূমির দেশ বঙ্গ-এর মানুষেরা তাদের জমিতে বড় বড় আল বা বাঁধ নির্মাণ করে বন্যা প্রতিরোধ করতো। আল শব্দটি বঙ্গ-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বঙ্গাল শব্দটির উৎপত্তি হয়। পরে ফারসির প্রভাবে তা বাঙ্গালা-য় রূপান্তরিত হয়।

ড: মুহম্মদ এনামুল হক আবুল ফজলের এ ব্যাখ্যা সমর্থন করেন। তার মতে বঙ্গ, সুম্ম, রাঢ় প্রভৃতি নামগুলো প্রথমে ছিলো গোষ্ঠীভিত্তিক অর্থাৎ বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের আবাসস্থল বোঝাতেই এ সব নাম প্রথমে ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। পরে সেগুলো বিভিন্ন স্থানের নাম হিসাবে পরিচিতি পায়। তদ্রুপ বঙ্গ নামের জনগোষ্ঠী যে অঞ্চলে বাস করতো সে অঞ্চল তাদের নাম অনুসারে বঙ্গ হিসেবে পরিচিত হয়। এই বঙ্গ গোষ্ঠীর নাম থেকে বাংলা নামের উৎপত্তি হয়েছে।

ড: রমেশচন্দ্র মজুমদার ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, "খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী এবং সম্ভবত আরো প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গ ও বঙ্গাল দুটি পৃথক দেশ ছিলো এবং অনেক প্রাচীন লিপি ও গ্রন্থে এই দুইটি দেশের একত্র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বঙ্গ দেশের নাম হইতে আল যোগে অথবা অন্য কোন কারণে বঙ্গাল অথবা বাংলা নামের উদ্ভব হইয়াছে ইহা স্বীকার করা যায় না। বঙ্গাল দেশের নাম হইতেই যে কালক্রমে সমগ্র দেশের বাংলা নামকরণ হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" [১]

ডঃ আবদুল করিম রমেশচন্দ্রের মতের বিরোধিতা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে বঙ্গ থেকেই নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তুর্কি-আফগান-মোঘল শাসকদের কালে বাঙ্গালাহ্, বাঙ্গালা, বাংলা ইত্যাদি শব্দের উদ্ভব হয়েছে।

রমেশচন্দ্র বঙ্গ ও বঙ্গাল দেশ দুটির প্রাচীনতার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি এ দুটি দেশের প্রাচীনত্বের তুলনা করেননি। আসলে দেখা যায় ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ দেশের উল্লেখ আছে কিন্তু সেখানে বঙ্গাল দেশের উল্লেখ নেই। বঙ্গাল শব্দটি আরো নতুন, সম্ভবত খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকেই এর প্রথম ব্যবহার হয়। তখন বঙ্গ ও বঙ্গাল শব্দ দুটি পাশাপাশি অবস্থিত দুটি জনপদকে বোঝাতো। বঙ্গ-এর পূর্বোক্ত সীমানারই দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত নিচু অংশ বঙ্গাল দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। উত্তরের অংশের নাম বঙ্গই ছিলো। এ থেকে বঙ্গ শব্দটির অধিকতর প্রাচীনত্ব এবং বঙ্গের একাংশে বঙ্গাল রাজ্যের উৎপত্তি বিষয়ে আন্দাজ করা যায়। সেক্ষেত্রে বঙ্গ থেকে আল বঙ্গাল শব্দের উৎপত্তি হতে কোন বাধা ছিলো বলে মনে হয় না।

বিষয়টি আমাদের গবেষণার অন্তর্ভুক্ত নয়। তাছাড়া তথ্যের অভাবে এ বিষয়ে স্পষ্ট মতামত দেয়াও সম্ভব নয়। তবে আমরা এটুকু সত্য বলে গ্রহণ করতে পারি যে বঙ্গ শব্দটি থেকেই বাংলা নামের উৎপত্তি।

---

[১] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ-২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন আমলের বঙ্গভূমি ও তার বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা কিছু তথ্য পেয়েছি। তবে দেশটির রাজনৈতিক ইতিহাস জটিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বহিরাগত শাসক গোষ্ঠী এ দেশ দখল করে শাসন করে গেছে। প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত এর রাজনৈতিক ইতিহাসকে তিনটি ভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে : (১) প্রাচীন যুগ, (২) মধ্যযুগ ও (৩) আধুনিক যুগ। এ সময় পরিসরে এদেশের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নলিখিতভাবে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে।

অতি প্রাচীনকালের বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়নি। খ্রিষ্ট-পূর্ব চতুর্থ অব্দ থেকে অর্থাৎ মৌর্য আমল (৩২০- ১৮৫ খ্রী পূ.) থেকে এ অঞ্চলের শাসন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। মৌর্য আমলে বর্তমান উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ প্রাচীন রাঢ়, পুন্ড্র প্রভৃতি জনপদ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তভুক্ত ছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। তখন বগুড়ার বর্তমান মহাস্থান গড়ে অবস্থিত প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন নগরী পুন্ড্রভুক্তির বা পুন্ড্র নামক শাসন বিভাগের কেন্দ্র ছিলো। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে গুপ্ত আমল পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস আবার অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়।

গ্রীক লেখকের দু একটি গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী জানা যায় তখন এ অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য ছিলো যার নাম ছিলো গঙ্গরিডি। তারা শৌর্যে বীর্যে খ্যাতিমান ছিলো। এ রাজ্যের বাসিন্দারা বস্ত্র শিল্পেও বিশেষ অগ্রসর ছিলো। কিন্তু তখনকার শাসক ও সাধারণ সমাজ সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ নেই সে সব গ্রন্থে।

গুপ্ত আমলের(৩১৯ - ৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দ) শুরু থেকে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তখন বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর শশাঙ্ক গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন আনুমানিক ৬০৬/৭ খ্রিষ্টাব্দে। ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্তী একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এদেশে নির্দিষ্ট শাসক ও শাসনবিহীন অবস্থা বিরাজ করছিলো যাকে ঐতিহাসিকরা মাৎস্যন্যায়ের যুগ বলে অভিহিত করেছেন।

এরপর গোপালের মাধ্যমে পাল বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। পাল বংশের শাসনকাল ৭৫০ থেকে ১১৩৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এদিকে ১০৯৫ সাল থেকেই সেন বংশের আদি পুরুষেরা ক্ষমতা সংহত করতে থাকে। শেষ দিকের পাল শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে তারা বাংলা দখল করে নেয়। ১২০৩/৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সেন শাসন টিকে ছিলো। এ সময় বখতিয়ার খিলজী লক্ষণাবতী দখল করেন। পরবর্তী একশ বছরের মধ্যে বর্তমান বাংলাদেশের সমগ্র এলাকা মুসলমানদের দখলে আসে। বখতিয়ারের বঙ্গ বিজয় থেকে পরবর্তী প্রায় দেড়শ বছর বাংলা দিল্লীর অধীনে শাসিত হয়।

১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বাংলার ইতিহাস স্বাধীন সুলতানী আমলের। ১৩৩৮ সালে সোনারগাঁয়ের শাসনকর্তার মৃত্যুর পরে তাঁর বর্মরক্ষক ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ সোনারগাঁ দখল করে সর্বপ্রথম দিল্লীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের মৃত্যুর পর ১৩৫২/৫৩ সালের মধ্যে লক্ষণাবতীর স্বাধীন শাসক শামসুদ্দীর ইলিয়াস শাহ সমগ্র বাংলা তার রাজ্যভূক্ত করে নিতে সমর্থ হন। সেই থেকে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা স্বাধীন রাজ্য হিসেবে শাসিত হয়। এ সময়ে যে সব শাসক বংশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলো সে গুলো হলো :

Dhaka University Institutional Repository

১. ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ ও আলী শাহ - ১৩৩৮ থেকে ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত

২. শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ এবং ইলিয়াস শাহী বংশ - ১৩৪২ থেকে ১৪১২।

৩. বায়োজীদ শাহী বংশ -১৪১২ থেকে ১৪১৪।

৪. রাজা গণেশ ও তার বংশধরগণ - ১৪১৪ থেকে ১৪৩৬।

৫. মাহমুদ শাহী বংশ ১৪৩৬ থেকে ১৪৮৭।

৬. হাবশী বংশ - ১৪৮৭ থেকে ১৪৯৩।

৭. হোসেন শাহী বংশ - ১৪৯৩ থেকে ১৫৩৮।

১৫৩৮ সালে বাংলার শেষ স্বাধীন শাসক গিয়াস উদ্দীন মাহমুদ শাহ মৃত্যু বরণ করার পর থেকে ১৫৭৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ আফগান শাসকদের অধীনে ছিলো। ১৫৭৬ হতে ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা দিল্লীল মুঘল শাসকদের দ্বারা নিয়োজিত সুবেদারদের অধীনে শাসিত হয়। ১৭১৭ সালে মুর্শিদ কুলি খাঁ বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হওয়ার পর নবাব উপাধি গ্রহণ করেন। দিল্লীর অকর্মণ্য শাসকদের দুর্বলতার কারণে তাঁর পরবর্তী নবাবগণও কার্যত স্বাধীনভাবেই বাংলাদেশ শাসন করেন। ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত এ পরিস্থিতি অব্যাহত ছিলো।

বাঙালি জাতি

পলিমাটি দ্বারা গঠিত উর্বর বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল দীর্ঘদিন গভীর অরণ্যে ঢাকা ছিলো। প্রত্ন-প্রস্তর যুগের মানুষের ব্যবহার্য কিছু জিনিস এদিক সেদিক পাওয়া গেছে। কিন্তু তা একেবারেই সামান্য। সে কারণে এ অঞ্চলে মানুষের বসবাসের ইতিহাস রচনা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

ঠিক কবে থেকে পলিমাটি গঠিত বদ্বীপ বাংলাদেশে মানব বসতি গড়ে ওঠে সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছা সম্ভব হয়নি। তার কারণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের অভাব। তবে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাচীন যুগের মানুষদের ব্যবহৃত কিছু কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ায় এটুকু নিসন্দেহ হওয়া গেছে যে, পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মত বাংলাদেশেও প্রত্ন-প্রস্তর যুগের মানুষের বাস ছিলো।

১৯৫৮ সালে রাঙ্গামাটিতে পাওয়া গেছে একটি পাথরের কাটারি। বিশেষজ্ঞদের ধারণা এর বয়স ১০ হাজার বছরের মতো। ১৯৬৩ সালে ফেনীর ছাগলনাইয়ায় আবিষ্কৃত হয়েছে পাথরের একটি হাত কুঠার। এর বয়সও দশ হাজার বছরের মতো বলে বিশেষজ্ঞরা আন্দাজ করেছেন।

নরসিংদী জেলার বেলাবো উপজেলার ওয়ারী-বটেশ্বর গ্রাম দুটোতে ১৯৩৩ সালে আবিষ্কৃত হয় লোহার কিছু বর্শাফলক, কুঠার এবং মাটির ও পাথরের গোলা। এসব জিনিস নব্যপ্রস্তর যুগের বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম ও বর্ধমান জেলার অজয়, কুনুর ও কোপাই নদীর তীরবর্তী বিভিন্ন স্থান থেকে স্টীটাইট পাথরের একটি সীলসহ বেশ কিছু নারীমূর্তি ও মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলোর বয়স প্রায় তিন হাজার বছরেরও বেশি বলে মত দিয়েছেন বিশেজ্ঞরা। এসব নিদর্শন থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে প্রায় দশ হাজার বছর আগে থেকেই অঞ্চলে লোক-

Dhaka University Institutional Repository
বসতি ছিলো। অজয় ও কুনুর নদী তীরবর্তী মানবগোষ্ঠীর ব্যবহৃত জিনিসপত্র থেকে প্রমাণ পাওয়া গেছে, এরা পশুপালন, চাষবাস, পাথর ও তামার ব্যবহার জানতো। এরা যখন বাংলাদেশের এ অঞ্চলে সভ্যতা গড়ে তোলে তখনও আর্যরা পূর্ব-ভারতে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। সুতরাং অজয়-কুনুর নদী তীরবর্তী মানবগোষ্ঠী যে আর্যদের থেকে ভিন্ন সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। অর্থাৎ আমরা জানতে পারি বাংলাদেশে একটি মানব গোষ্ঠীর বসবাস আর্য প্রভাবের অনেক আগে থেকেই ছিলো।

সে মানবগোষ্ঠীর নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় সম্পর্কে বিভিন্ন পন্ডিত ভিন্ন ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। এর মধ্যে হার্বার্ট রিজলের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। তিনিই উপমহাদেশের মানুষদের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় সম্পর্কে প্রথম অনুসন্ধান শুরু করেন। তিনি দৈহিক মাপের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষদের মোট সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করেন এবং বাঙালি মানবগোষ্ঠীকে মঙ্গোল-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেন।[১] তবে রিজলের শ্রেণীবিভাগ পরবর্তীতে নানা কারণে বাতিল হয়ে গেছে। বাঙালির গোল মাথার উপর ভিত্তি করে তিনি তাদেরকে মোঙ্গল-দাবিড় বলে অভিহিত করার পক্ষপাতী। রমাপ্রসাদ চন্দ এই মতের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন বাঙালির গোল মাথা মোঙ্গলদের প্রভাব নয়, আলপাইনদের প্রভাব প্রমাণ করে। তিনি মনে করেন পামীর টাকলামাকন অঞ্চল থেকে অতি প্রাচীন কালে আলপাইন নরগোষ্ঠীর মানুষ প্রথমে পশ্চিম ভারতে পরে আস্তে আস্তে পুর্ব ভারত তথা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি উল্লেখ করেছেন আলপাইন ছাড়া বাঙালিদের মধ্যে বেদ-বর্ণিত চওড়া নাকের কালো রঙের নিষাদ জাতির রক্ত মিশেছে প্রচুর পরিমাণে।[২]

রমাপ্রসাদ চন্দের যুক্তি ছাড়াও অনেক কারণে রিজলের মত গ্রহণঅযোগ্য। মোঙ্গলদের চোখের কোনায় এপিকানথিক ভাঁজ বাঙালিদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। মোঙ্গলদের সাথে বাঙালির ত্বকের পার্থক্যও সহজে চোখে পড়ে। তবে বাঙালি জনপ্রবাহে মোঙ্গল নরগোষ্ঠীর কিঞ্চিৎ প্রতিনিধিত্ব আছে।

ডঃ বিরজা শঙ্কর গুহ উপমহাদেশের বাসিন্দাদের সম্পর্কে যে নৃতাত্ত্বিক শ্রেণীবিন্যাস উপস্থিত করেন তা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি উপমহাদেশীয় মানুষদের ৬টি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেন এবং এদের একটি উপশ্রেণী আলপাইন শাখার নরগোষ্ঠীর সাথে বাঙালির সাদৃশ্য সর্বাধিক বলে মত প্রকাশ করেন।[৩] ডি এন মজুমদারের নৃতাত্ত্বিক শ্রেণী বিন্যাস ভিন্ন হলেও বাঙালির মধ্যে আলপাইন নরগোষ্ঠীর প্রাধান্যের ব্যাপারে তিনিও একমত প্রকাশ করেছেন।[৪] বিরজা শঙ্কর গুহ বাঙালির নৃতাত্ত্বিক উৎস নির্ণয়ে এ জাতির উপর প্রটো-অষ্ট্রালয়েডদের বিশেষ প্রাধান্যের কথাও উল্লেখ করেছেন। নিম্নশ্রেণীর বাঙালিদের শারীরিক গঠন পর্যবেক্ষণ করলে গুহর মতের সত্যতা পাওয়া যায়।

নীহাররঞ্জন রায়ও বাঙালির উপর প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর প্রভাব সম্পর্কে একমত। তিনি সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুন্ডা, ভূমিজ, মালপাহাড়ী প্রভৃতি মানুষদের উদাহরণ টেনে বলেন যে, এদের মধ্যে আদি-অষ্ট্রেলীয় বা ভেড্ডিড ধারা প্রবল,

---

[১] Herbert Risley, *The People of India*, Thacker Spink & Co, Calcutta, 1908, p-39-42.

[২] Roma Prasad Chanda, *The Indo-Aryan Races*, Rajshahi Varendra Research Society, 1916, p-65-78।

[৩] B. S. Guha, *An Outline of Racial Ethnology in India*, Calcutt Asiatic Society of Bengal, 1937, p-14-15

[৪] D. N. Majumdar, *Races and Cultures of India*, Bombay, 1961, p-10-20.

Dhaka University Institutional Repository

তবে বাঙালির সর্বস্তরেই কমবেশি ভেড্ডিড রক্তের প্রাধান্য চোখে পড়ে। নীহাররঞ্জন রায় অবশ্য আলপাইন নরগোষ্ঠীর মানুষদের প্রভাবকে খুব বেশি গুরুত্ব দেননি।[১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় ঐতিহাসিক-নৃতাত্ত্বিকরা একটি ব্যাপারে একমত যে বাঙালি আর্য বা দ্রাবিড় নয়, একটি স্বতন্ত্র মানবগোষ্ঠী হিসেবেই বিকশিত হয়েছে। তাদের আলোচনার সূত্র ধরে আমরা বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা সংগঠিত করে নিতে পারি।

আর্যদের ভারতে প্রবেশের আরো অনেক আগে থেকে এদেশের মানুষের বাস ছিলো। এরা ছিলো আদি-অস্ট্রেলীয় বা ভেড্ডিড শ্রেণীর মানুষ। এদের মাথা প্রায় গোল, নাক চওড়া, গায়ের রঙ্ কালো, আকৃতি মধ্যম ধরণের, শক্তপোক্ত গড়নের শরীর। মহেঞ্জোদারোর ভগ্নস্তূপে এই শ্রেণীর মানুষের নরমুণ্ডু পাওয়া গেছে। আফগানিস্তান থেকে শুরু করে শ্রীলঙ্কা, মালয়, সুমাত্রা, ইন্দোনেশিয়া এমনকি অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত এদের বিস্তৃতি ছিলো। এরাই ছিলো বাংলাদেশের আদি বাসিন্দা। সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুন্ডা, ভূমিজ, মালপাহাড়ী প্রভৃতি মানুষদের মধ্যে প্রায় বিশুদ্ধ ভেড্ডিড রক্ত এখনো টিকে আছে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে আন্দাজ করা যায় এরা দশ হাজার বছর আগে থেকেই এদেশে বসবাস করছিলো।

বাঙালিদের মধ্যে এদের প্রবল উপস্থিতির প্রমাণ হিসেবে নীহাররঞ্জন রায় বাংলা ভাষার উপর অস্ট্রিক ভাষার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া আমাদের আচারপ্রথা, সামাজিক রীতিনীতিতেও অস্ট্রিক সমাজের প্রভাব বিদ্যমান।

ভেড্ডিডদের পরে, কিন্তু আর্যদের আগে, কোনো এক সময় পামীর টাকলামাকান অঞ্চল হতে আলপাইন নরগোষ্ঠীর মানুষ পশ্চিম ভারত হয়ে এদেশে ছড়িয়ে পড়ে। আলপিনোদের মাথা গোলাকৃতি, নাক খাড়া, লম্বায় ভেড্ডিডদের চেয়ে বেশি। এরা আসার পর ভেড্ডিডদের সাথে এদের রক্ত ও সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটে। এরপর মেডেটারিয়ান স্টকের প্রথমে দ্রাবিড় ও পরে আর্যভাষী নরগোষ্ঠি এদেশে এলে তাদের সাথেও বাঙালির কম বেশি মিশ্রণ ঘটে। এছাড়া, নিগ্রো, মঙ্গোল প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর রক্তও কিছুটা প্রভাব ফেলেছে বাঙালি জাতির উপর। তবে সামগ্রিক বিচারে আদি-অস্ট্রেলীয় এবং আলপাইন নরগোষ্ঠীকেই বাঙালির পূর্ব-পুরুষ বলে অভিহিত করা যায়। ডঃ হুটন মনে করেন প্রধানত ভেড্ডিড এবং আলপাইন জনগোষ্ঠীর দীর্ঘকালীন বিবর্তনের মাধ্যমেই বাঙালি জাতির উদ্ভব ঘটেছে। এভাবেই বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের মিশ্রণের ফলে বাঙালি জনগোষ্ঠীগত বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

ভাষা

বাঙালি জাতির উৎস সম্পর্কে পন্ডিতরা দ্বিধাবিভক্ত হলেও বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁদের মতামত আরো ৬০/৭০ বছর আগেই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। এর কারণ উপমহাদেশের মানুষের ব্যবহৃত ভাষিক উপাদান যে পরিমাণে পাওয়া গেছে ব্যবহার্য জিনিসপত্র সে পরিমাণে পাওয়া যায়নি।

---

[১] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, সুভাষ মুখোপাধ্যায়-কৃত সংক্ষেপিত সংস্করণ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি. কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ-১-২।

Dhaka University Institutional Repository

পন্ডিতরা একমত যে বৈদিক ভাষার কালক্রমিক বিবর্তনের মধ্য দিয়েই বাংলার উৎপত্তি। আর্যদের ভারতে আগমণের সময় তাদের সাহিত্যিক ভাষার যে বিশুদ্ধ রূপ ছিলো তার আদর্শ হিসেবে বেদের ভাষাকে গ্রহণ করেছেন পন্ডিতরা। এ স্তরের ভাষাকে বৈদিক ভাষা বলে উল্লেখ করা হয়।

উপমহাদেশে প্রবেশ করার পরে স্থানীয়দের ভাষার প্রভাবে এবং উচ্চারণের শৈথিল্যে বেদের ভাষা পরিবর্তিত হয়ে প্রাথমিকভাবে যে রূপ পরিগ্রহ করে তারই ব্যকরণ-শাসিত পরিশীলিত রূপ হলো সংস্কৃত। অন্যদিকে, লোকমুখে বেদের ভাষার পবির্তন এমন এক পর্যায়ে পৌছে যে তাকে আর বৈদিক ভাষা বলে মনে হয় না। এ স্তরের সাধারণ মানুষের ভাষাকে প্রাকৃত ভাষা হিসেব আখ্যায়িত করা হয়। একই সময়ে উচ্চারণের শৈথিল্যের কারণে পরিবর্তিত বৈদিক ভাষার প্রথম স্তরের উপর নির্ভর করে বৌদ্ধ পণ্ডিতরা একটি লিখিত ভাষা সৃষ্টি করেছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে ব্যবহৃত এ ভাষার নাম পালি। বৈদিকের তৃতীয় ধাপের পরিবর্তনকালীন স্তরকে বলা হয় অপভ্রংশ। প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পায়। যেমন মাগধী প্রাকৃত, শৌরসেনী ইত্যাদি। অপভ্রংশের পরই আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলো গঠন পেতে শুরু করে। এই পরিবর্তনের ধারাকে তিনটি স্তরে চিহ্নিত করে পণ্ডিতরা তার যে কালক্রম নির্ধারণ করেছেন তা নিম্নরূপ :

১. প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা (বৈদিক, সংস্কৃত) : খ্রী. পূ. ৬০০ অব্দ পর্যন্ত
২. মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা (পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ) : খ্রী. পূ. ৬০০ অব্দ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত
৩. নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা (আধুনিক বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী ইত্যাদি): ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত।

অপভ্রংশ থেকেই আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলো জন্ম নিয়েছে। আর্যদের আগমণের আগে উপমহাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষা ব্যবহৃত হতো। সে সব ভাষার প্রভাবে অঞ্চলভেদে প্রাকৃতের ভিন্ন ভিন্ন রূপান্তর হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন অপভ্রংশ ভাষাও দেখা দেয়। বঙ্গ-মগধ অঞ্চলে যে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হতো তাকে পন্ডিতরা বলেছেন মাগধী প্রাকৃত। মাগধী প্রাকৃতের পরিবর্তিত অপভ্রংশ রূপ থেকে বাংলা ভাষা সৃষ্টি হয়।

বাংলার উৎপত্তি সম্পর্কে এ হলো সাধারণ মত। খুঁটিনাটি বিষয়ে অনেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। যেমন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন গৌড় অঞ্চলে অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে প্রাকৃতের রূপ মাগধী প্রাকৃত থেকে ভিন্ন ছিলো। সুতরাং এ অঞ্চলের অপভ্রংশও ছিলো ভিন্ন। তিনি এ অঞ্চলের প্রাকৃত ও অপভ্রংশ যথাক্রমে গৌড়ী প্রাকৃত ও গৌড়ী অপভ্রংশ নামে আখ্যায়িত করতে চান। বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল বিষয়েও তাঁর ভিন্ন মত আছে। তিনি মনে করেন বাংলা ভাষা সপ্তম শতাব্দী থেকেই গঠন পেতে শুরু করে। তাঁর মতে চর্যাপদের প্রথম দিকের চর্যাগুলো ঐ সময়ের রচনা।[১]

ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলার উপর আর্য ভাষার অধিকার সম্পর্কেও ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে বাংলা ভাষার উপর অষ্ট্রিক ভাষার প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। এ মতের সমর্থনে তিনি বর্তমানে টিকে থাকা অষ্ট্রিক ভাষাগুলোর ব্যকরণ ও পদরচনা রীতির সাথে বাংলা ভাষার সাদৃশ্য দেখানোর চেষ্টা করেছেন। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ও বাংলার উপর অষ্ট্রিক

[১]ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ-১৬-১৮।

Dhaka University Institutional Repository
ভাষার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের কথা বলেছেন। তিনি অষ্ট্রিক ভাষার অনেক শব্দ উল্লেখ করেছেন যেগুলো এখন বাংলা হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে আমরা ভাষার সাধারণ আলোচনায় ধরে নিতে পারি যে স্থানীয় ভাষার প্রভাবে বৈদিক ভাষা বিভিন্ন স্তরে রূপান্তরিত হয়ে আনুমানিক নবম-দশম শতকের দিকে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়। অন্তত চর্যাপদের কাল সম্পর্কে এ কথা প্রযোজ্য।

সমাজ ও জীবন যাপন

আর্যদের আগমনের আগে থেকেই এদেশের বাসিন্দারা কৃষি-নির্ভর সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করছিলো। অষ্ট্রিকভাষী আদি অষ্ট্রেলীয় অর্থাৎ বর্তমান বাঙালিদের পূর্ব-পুরুষরাই এদেশে প্রথম চাষাবাদের প্রচলন করে। তারা কাঠের লাঙ্গল দিয়ে ধান চাষ করতো। লাঙ্গল শব্দটি অষ্ট্রিক ভাষা থেকে এসেছে। লাউ, লেম্বু, কলা, কামরাঙ্গা, নারকেল, পান, জাম্বুরা, ডুমুর, হলুদ সুপারী, ডালিম ইত্যাদিরও চাষ করতো ওরা। এসব ফলমূল যে বাঙালির খাদ্য ছিলো এবং আর্যদের কাছে অপিরিচিত ছিলো তাতে সন্দেহ নেই। তবে এদেশে যব, গম প্রভৃতি চাষের প্রচলন করে দ্রাবিড়ভাষী জনগোষ্ঠী।[১]

তুলার সুতো এবং সেই সুতোয় কাপড় বানিয়ে তা পরিধানের কায়দাটিও বাঙালির আদি পুরুষদের দান। পাট শব্দটি অষ্ট্রিক ভাষার বলে অনেকে মনে করেন। সে সময়েও বাঙালি পাটের চাষ ও ব্যবহার জানতো। ভেড়া বা মেড়ার সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিলো। হয়তো তারা ভেড়া পালন করতো এবং এর পশম দিয়ে কম্বল বানাতো । কম্বল শব্দটি অষ্ট্রিক ভাষা থেকে এসেছে। বস্ত্র শিল্পে যে বাঙালি সুনাম অর্জন করেছিলো তার উল্লেখ আছে দু-একটি প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থেও।

বাঙালির আদি পুরুষদের সভ্যতা ছিলো কৃষি-নির্ভর এবং তাই গ্রাম-কেন্দ্রিক। নগর সভ্যতার গোড়া পত্তন হয় দ্রাবিড়দের মাধ্যমে। এর আগে এদেশে গ্রাম নির্ভর সমাজ ব্যবস্থা ছিলো। গ্রামে গ্রাম-প্রধান ধরনের একজন নেতৃস্থানীয় অভিভাবক এবং ৩/৪ টি গ্রাম মিলে গ্রাম-পঞ্চায়েত গঠন করে তার প্রধান নির্বাচনের প্রচলন এখনো ঠিকে আছে মুণ্ডাদের মধ্যে। এটি বাঙালির আদি পুরুষদের সমাজ জীবনের পরিচায়ক।

সে সময়ের অধিবাসীরা সম্ভবত বাঁশকাঠ ও লতা-পাতা দিয়ে বানানো কুড়েঁঘরেই বসবাস করতো। অজয় ও কুনুর নদীর তীরে এ রকম ঘরের কাঠামোর ছাপ পাওয়া গেছে। সেখানে ধানের খোসার পাথুরে ছাপও মিলেছে। বাঙালির আদি-পুরুষদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন তখন থেকেই ছিলো। স্বামী-স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা নিয়েই ছিলো তাদের সংসার। ধারণা করা যায় তখন পুরুষরাই পরিবারের কর্তা ছিলো।

---

[১] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, সুভাষ মুখোপাধ্যায়-কৃত সংক্ষেপিত সংস্করণ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি. কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ-৭-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

তারা একাধিক জীবনে বিশ্বাস করতো। কেউ মারা গেলে তারা তার দেহ গাছে ঝুলিয়ে রাখতো অথবা কাপড়/গাছের ছালে জড়িয়ে মাটিতে কবর দিয়ে রাখতো। কবর দিতো বসার ভঙ্গিতে। সিলেটের চা শ্রমিকদের একটি শ্রেণীর মধ্যে মৃতদেহ সৎকারের এ চর্চা এখনো অব্যাহত আছে। সম্ভবত গাছ, পাথর, পাহাড় ইত্যাদির পূজার প্রচলন ছিলো তখন থেকেই। তবে উত্তর ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে বাংলাদেশেও সে ধর্মের প্রসার ঘটে। এদেশের মানুষ দলে দলে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। তখন থেকে সেন শাসনের পূর্ব পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মই ছিলো এখানকার প্রধান ধর্ম।

শিল্পকলার ব্যাপারেও তাদের আগ্রহ ছিলো বলে জানা যায়। মৃৎশিল্পে বাঙালির দক্ষতা এখনো সুবিদিত। অতি প্রাচীন কাল থেকেই এদেশে মৃৎশিল্পের প্রচলন ছিলো। এছাড়া, বস্ত্র শিল্পে বাঙালির পূর্ব-পুরুষগণ বিশেষ দখল অর্জন করেছিলো বলে মনে হয়।

বাংলাদেশে মৌর্য ও গুপ্তাধিকারের মাধ্যমে আর্য-প্রভাব সূচিত হলেও বাংলাদেশে আর্য-ব্রাহ্মণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় সেন আমলে। গুপ্ত শাসকগণ বাইরে থেকে ব্রাহ্মণ নিয়ে এসে এখানে তাদের বসতি প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন। শশাঙ্ক তরান্বিত করেন ধর্মান্তরিতকরণের প্রক্রিয়া। সেন আমলে তা পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করে। এদেশে আর্য প্রভাবে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তাকে অতি সংক্ষেপে এভাবে উল্লেখ করা যায় :

১. এদেশের মানুষ গ্রাম-কেন্দ্রিক সভ্যতার পরিবর্তে নগর বা শাসনকেন্দ্র-নির্ভর সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়। নগর ও শাসনকেন্দ্রগুলোর আশপাশে ছড়িয়ে পড়া নগর জীবনের ছোঁয়া গ্রাম ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। ফলে সমাজ জীবনে নাগরিক শৈথিল্যও দেখা দেয়। হিন্দু সমাজের বর্ণবাদী মনোভঙ্গি প্রভাব ফেলে মানুষের সার্বিক জীবনযাপন পদ্ধতিতে। তখন থেকেই বিভিন্ন বর্ণের মানুষদের মধ্যে ভেদাভেদ দেখা দেয়। এদেশের আদি বাসিন্দা অর্থাৎ বাঙালির পূর্ব-পুরুষরা নিচু শ্রেণীর মানুষ হিসাবে আখ্যায়িত হয়ে নীত হয় হীন সামাজিক অবস্থানে। চর্যাপদের কিছু কিছু চর্যায় সে অবস্থার বিবরণ আছে।

২. শোষণের স্বার্থে নিখুঁত রাষ্ট্রযন্ত্র সৃষ্টি হয়। শাসনকেন্দ্র থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য আরেকটি ভুইফোঁর সহায়ক শ্রেণীর জন্ম হয়। ফলে এদেশের মানুষ চিরতরে রাষ্ট্রযন্ত্রের যাঁতাকলে বাঁধা পড়ে।

৩. আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রবিষ্ট হতে থাকে। বাংলা ভাষার প্রতি ব্রাহ্মণদের বিদ্বেষের কারণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।

৪. গুপ্ত ও পাল আমলে বৌদ্ধদের দ্বারা সূচিত হয়েছিলো সংগঠিত শিক্ষাব্যবস্থা। জ্ঞানার্জনের প্রতি বৌদ্ধদের প্রবল অনুরাগ ছিলো। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে তারা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলো। অবশ্য তাদের শিক্ষাদান শুধু ধর্মীয় ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিলো। তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পরে এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার ঘটে থাকবে বলে অনুমান করা যায়।

৩. জনসংখ্যায় পরিবর্তন দেখা দেয়। জনসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি বহিরাগত আর্যদের সংখ্যাও বাড়ে। সে কারণে স্থানীয়দের সাথে আর্য রক্তের মেশামেশিও শুরু হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আর্যদের আগ্রাসনের ফলে এদেশের সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে যেমন পরিবর্তন সূচিত হয় একইভাবে পরিবর্তন দেখা দেয় তুর্কি-আফগান-মোঘল শাসকদের কালেও। মুসলমানরা এদেশে নিয়ে এসেছিলো সাম্যের ধর্ম ইসলাম। তখন পর্যন্ত ইসলাম তার সাম্যবাদী আবেদন হারায়নি। তা ছাড়া প্রথম দিকে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিলো দরবেশ-পীর-আউলিয়াদের মাধ্যমে। তাদের মধ্যে অনেকেই জনহিতকর কার্যকলাপের জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। পরোপকারী ও নিরঅহঙ্কার ব্যক্তিত্বের অধিকারী এসব সুফী দরবেশগণ বর্ণবাদে জর্জরিত সাধারণ হিন্দু ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদের মধ্যে ইসলামের মানবতাবাদী রূপ তুলে ধরেন। তাই বর্ণভেদের অত্যাচারে জর্জরিত এদেশের মানুষ দুহাত বাড়িয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলামের সাম্যের মন্ত্রে সমাজ জীবনেও পরিবর্তন দেখা দেয়, পরিবর্তন আসে সাহিত্য-শিল্প---সর্বত্র। ইসলামের প্রভাবকে নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যায়:

১. ইসলামের সাম্যনীতির কারণে এদেশের মানুষের সমাজ জীবনে পরিবর্তন আসে। উঁচু-নিচু ভেদাভেদ অনেকখানি কমে যায়। নিম্নশ্রেণীভূক্ত মানুষেরা (স্বভাবতই এদেশের আদি বাসিন্দারা) দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে।

২. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে আসে ব্যাপক পরিবর্তন। সুফীমতের প্রসার ঘটে। ইসলামের প্রসার রোধের জন্য ইসলামেরই উদারনীতি ও সুফীবাদী প্রভাব মেনে চৈতন্যবাদী বৈষ্ণব ধর্ম প্রসার লাভ করে।

৩. শিল্প সাহিত্যে মুসলমানদের অনুরাগের কারণে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ শুরু হয়। স্বাধীন সুলতানী আমলে তা বিশেষ পুষ্টি লাভ করে। মুসলমানদের মাধ্যমেই সমৃদ্ধ ফার্সী সাহিত্যের সাথে সে কালের বাঙালির পরিচয় হয়। পরবর্তীকালে আমাদের সাহিত্যে এর গভীর প্রভাব পড়ে।

৪. ইসলামের প্রভাবে সমাজ জীবনে বিশেষ পরিবর্তন সূচিত হওয়ায় হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং তাদের ধর্ম ও সমাজ জীবনেও কিছু ইতিবাচক রদবদল আসে, যার মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম মতের প্রসার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।

৫. ইসলামের প্রভাবে হিন্দু সমাজের অর্থাৎ শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে জাতিভেদের কঠোরতা কমতে থাকে।

ইসলাম প্রচারের ফলে বাঙালির সমাজ জীবনে যে পরিবর্তন আসে তা ক্রমে স্থিতি লাভ করার পর থেকে ইংরেজ শাসন আমলের পূর্ব পর্যন্ত এদেশে সে সমাজ ব্যবস্থাই টিকে ছিলো। ইংরেজ আমলে নানা কারণে সমাজ ব্যবস্থায় এক নিগূঢ় পরিবর্তন দেখা দেয়। সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

লোককাহিনীতে বাঙালির সমাজ ও পরিবেশ

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালির সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন

নৃ-তাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিক সূত্রে জানা যায় বাংলাদেশে সাড়ে তিন বা চার হাজার বছর আগে থেকে মানুষ মোটামুটি সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করে আসছে। পশ্চিমবঙ্গের অজয়, কুনুর নদী তীরবর্তী কয়েকটি অঞ্চলে এবং বাংলাদেশের কয়েকটি স্থানে সভ্য মানুষের বসবাসের চিহ্নস্বরূপ ভগ্ন মৃৎ-পাত্র, কুঁড়ের কাঠামো, মাটি ও পাথরের মূর্তির ভগ্নাবশেষ, পাথরের গুটিকা, লোহার অস্ত্র ও পাত্র ইত্যাদি পাওয়া গেছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে এদের বয়স নির্ণিত হয়নি। তবে পণ্ডিতদের ধারনা এগুলো তিন থেকে দশ হাজার বছর পূর্বের মানুষের ব্যবহৃত জিনিষপত্রের নমুনা।

ঐতিহাসিগণও মনে করেন, "প্রাচীন যুগে অন্তত: তিন হাজার বছর অথবা তাহারও পূর্বে যে বাংলাদেশের এই অঞ্চলে সুসভ্য জাতি বাস করিত ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।"[১] এসব সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী আমরা ধরে নিতে পারি বাংলাদেশে অন্তত তিন হাজার বছর পূর্ব থেকেই সমাজবদ্ধ জীবন যাপন শুরু হয়েছে।

ইতোপূর্বে আমরা জেনেছি লোককাহিনীর গবেষকগণ লোককাহিনীর উদ্ভবকে কম করে হলেও তিন-চার হাজার বছরের প্রাচীন বিষয় বলে দাবী করেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের তুলনায় বাংলাদেশে লোককাহিনীর উদ্ভব পরর্বতীকালের ঘটনা হতে পারে, তবে অনেক কাহিনী যে আর্য-ভাষী ইন্দো-ইরোপীয়দের আগমণের পূর্বেই উদ্ভূত হয়েছিলো সে ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার কারন নেই। তাই বাংলা লোককাহিনীগুলোতেও এদেশের প্রাচীন মানব সমাজের বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন খুজেঁ পাওয়া সম্ভব।

লোককাহিনীর টাইপ ও মোটিফের তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে উপলব্ধি করা যায় অধিকাংশ কাহিনী প্রাচীন যুগের সম্পদ। ক্রমে তার উপর বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন কথকের পরিপার্শ্ব ও ব্যক্তিতার প্রলেপ পড়েছে, সংযোজিত হয়েছে নতুন নতুন উপাদান। লোককাহিনীর উদ্ভব আদিকালে হলেও মানুষের কাহিনী সৃষ্টির সৃজনশীল প্রক্রিয়া থেমে থাকেনি। সৃষ্টিমুখী উদ্দীপনা এবং বিনোদনের তাগিদ থেকে সে নিত্য নতুন কাহিনী জন্ম দিয়েছে। আন্দাজ করা যায় মানুষের কাহিনী উদ্ভাবন ও বুনন প্রক্রিয়া মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্ধ্ব থেকে সংখ্যার হিসাবে ক্রমে হ্রাস পেয়েছে কিন্তু বন্ধ্যা হয়ে যায়নি তার একদা সতত: সৃষ্টিশীল বর্ণিল ভুমি।

বর্তমান গবেষণায় অধীত বিভিন্ন বাংলা লোককাহিনীর টাইপ ও মোটিফ বিচার করে দেখা গেছে যে এদের উৎসারণও বিভিন্ন যুগে। রূপকাহিনী ও পশুকাহিনীর অনেকগুলোই প্রাচীন আমলের সৃষ্টি। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের *"ঠাকুরদাদার ঝুলির"* 'মালঞ্চ কন্যা' কাহিনীতে প্রাপ্ত বৌদ্ধ ধর্মাচার, লোকাচার ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ বিচার করে আর্চায দীনেশচন্দ্র সেন একে দশম শতাব্দীর সৃষ্টি বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[২]

ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকীর *"কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী"* দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত 'ফৈলন খাঁ ও হরণ শুনাই' শীষর্ক কাহিনীটি যে ষোল-সতর শতকে সৃষ্টি হয়েছে তা সহজেই আন্দাজ করা যায় কাহিনীতে ফিরিঙ্গীদের উপস্থিতি এবং আগুনে বন্দুকের (সম্ভবত কামান) ব্যবহার থেকে। এভাবে বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক মোটাদাগের সময়ানুক্রমে কাহিনীগুলো আলাদা করলে প্রাচীন যুগের সমাজব্যবস্থা ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায়।

---

[১] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ-১২-১৪।

[২] ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, *কিংবদন্তির বাংলা*, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ১৩৮২, পৃ-২০০।

Dhaka University Institutional Repository

রাজা ও রাজ্য

বাংলা লোককাহিনীতে রাজা-উজিরের প্রবল উপস্থিতি। প্রায় সব রূপকাহিনীতেই রাজপুত্র ও রাজকন্যা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে কথার মালা। অন্য অনেক কাহিনীতেও রাজা-উজির-রাজপুত্র-রাজকন্যাগণ প্রধান অবলম্বন। কিছু সংখ্যক পশুকাহিনীতেও রাজা ও রাজ্য গুরুত্বপুর্ণ স্থান দখল করে আছে।

বর্তমান গবেষণায় বিশ্লেষিত বিভিন্ন লোককাহিনীর মধ্যে এমন কিছু লোককাহিনী পাওয়া গেছে যেখানে সমকালীন সমাজের ধর্ম-বিশ্বাস অস্পষ্ট কিংবা বস্তু ও প্রাণী পূজার ইঙ্গিতবাহী; বিশেষ করে রূপকাহিনী, রোমাঞ্চকাহিনী ও পশু-পাখির কাহিনীতে এর আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্যায়ের সর্বপ্রাণবাদী দর্শনের ঈশ্বর বিশ্বাস এসব কাহিনীতে প্রভাব ফেলেছে। তদুপরি, সেখানে আর্য-দেবদেবীর উল্লেখ একেবারে অনুপস্থিত, কৃষি নির্ভর ভেড্ডিড সমাজের প্রাধান্যই লক্ষ্যনীয়। এসব তথ্য থেকে এমন ধারনা করা ভুল হবে না যে এসব কাহিনী আর্য-ভাষী ইন্দো-ইউরোপীয়দের এদেশে আগমণের পূর্বে উদ্ভূত। বাংলাদেশের অতি প্রাচীন কালের (প্রাক-আর্য) সমাজ ব্যবস্থার কিছু পরিচয় এসব কাহিনীতে খুজেঁ পাওয়া যায়।

এদেশের আদি সমাজ কাঠামোর একদিকে ছিলো গোত্র প্রধান/রাজা নামধারী শাসক ও তাকে ঘিরে ছোট কিন্তু শক্তিশালী শাসক শ্রেণী, অন্যদিকে কৃষিজীবী সাধারণ মানুষদের নিয়ে গ্রাম-কেন্দ্রিক কৃষি-নির্ভর সমাজ। গ্রামগুলো ছিলো স্বয়ংসম্পুর্ণ; একেকটি গ্রামে বিভিন্ন বাসিন্দা ভিন্ন ভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করতো। এ ধরণের বহুসংখ্যক গ্রাম নিয়ে ছিলো একেকটি রাজ্যের বিস্তার।

কাহিনীর অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বর্ণিত রাজ্যগুলো ক্ষমতায় ও ভৌগলিক পরিসরে ইতিহাস বিখ্যাত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় রাজ্যগুলোর মতো এত বিশাল ছিলো না। বাংলা লোককাহিনীর রাজ্যগুলো ছিলো ছোট ছোট। প্রায় কাহিনীতে দেখা যায় কোন একটি চরিত্র সাতদিন সাত রাত হেঁটে 'বহু রাজ্য, বহু মুল্লুক' পার হয়ে এক নতুন রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়। প্রাচীন কালে জঙ্গলাকীর্ণ, পথঘাটহীন বাংলাদেশে একজন সুস্থ মানুষ সাত দিন সাত রাত হেঁটে শ'দেড়েক মাইল রাস্তা অতিক্রম করতে পারতো হয়তো; আদিকালের মানুষের কায়িক শ্রমের দীর্ঘ অভ্যাস ও সু-স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনায় রেখে তার পথপরিক্রমার সীমা দু'শ মাইল পর্যন্ত বাড়িয়ে নিলে বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট 'থানা' আকারের একেকটি প্রাচীন রাজ্যের কথা আন্দাজ করা যায়। এবং বহুরাজ্য বহুমুল্লুক অতিক্রম করার তথ্য থেকে এও ধরে নেয়া যায় বাংলাদেশে তখন অনেক ছোট ছোট রাজ্য ছিলো। রাজ্যগুলো কোন বৃহত্তর একক প্রশাসনের অধীনে শাসিত হতো বলেও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই ধরে নেয়া যায় বর্ণিত রাজনৈতিক অবস্থাটি আসলে গোত্র ব্যবস্থা থেকে পরিবর্তিত কৃষি -পশুজীবি সমাজে ধীরে ধীরে উদ্ভূত সামন্ত-ব্যবস্থার ইঙ্গিত করে।

সে সময় বাংলাদেশে যে বহুসংখ্যক ছোট ছোট বহু রাজ্যের উদ্ভব ঘটেছিলো তার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় রাজাদের বাসস্থান, লোকলস্কর, ঝাকঁজমক সম্পর্কিত তথ্য থেকেও। মোহাম্মদ সাইদুর কর্তৃক সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত *লোকসাহিত্য সংকলন*- ৩০ খণ্ডের 'পাতিশিয়ালের কেস্তা'র গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র জনৈক রাজা পায়ে হেঁটে শ্বশুর বাড়ি যায়। পথিমধ্যে তার পানি পিপাসা পেলে নিকটবর্তী এক বুড়ির বাড়িতে গিয়ে 'এক বাডি ছোলার ছাতু' ও এক পাত্র জল খেয়ে সে পিপাসা নিবারণ করে (পৃ-২৯)।

রাজা ছদ্মবেশে শ্বশুর বাড়িতে যাওয়ার পর অন্য পুরুষে আসক্ত স্ত্রীর ষড়যন্ত্রে বন্দি হলে তার শ্বশুর (যিনি নিজেও একজন রাজা) আদেশ দেয় যেন নদীর তীরে নিয়ে গিয়ে বন্দির শিরোচ্ছেদ করা হয়। প্রথমোক্ত রাজার সাথে লোক-লস্কর, হাতি ঘোড়ার অনুপস্থিতি তাকে সাধারণ ভূ-স্বামী বলে ইঙ্গিত করে। দ্বিতীয় রাজা অর্থাৎ শ্বশুরের বাড়িতে বন্দীদের হত্যা করার কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিলো না বলে নদী তীরে শিরোচ্ছেদের আদেশ দেয়া হয়, যা অতি প্রাচীন কালের গোত্র-কেন্দ্রিক সমাজের শাস্তি ব্যবস্থার অনুরূপ।

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম কর্তৃক সম্পাদিত *লোক-সাহিত্য সংকলন*-১ম খণ্ডের 'জোলার কিসসা (মোমেনশাহী)'-তে আরেক রাজার কথা জানতে পারি যার কন্যার হার চুরি করে নিয়ে যায় রাজ বাড়িরই এক চাকর। জোলার গণনার ভয়ে শেষ পর্যন্ত সে স্বীকার করে যে রাজবাড়ির গোবর-টালে হার লুকানো আছে। রাজবাড়িতে গোবর-টাল থাকার তথ্য রাজাকে পশুপালনের সাথে সম্পৃক্ত করে। এর ফলে তার রাজ্যের ব্যপ্তি ও শান-শওকত সম্পর্কে আমরা ধারণা পাই।

মোহাম্মদ ইসহাক আলী কর্তৃক সম্পাদিত বাংলা একাডেমীর *লোক-সাহিত্য সংকলন-৪২শ* খণ্ড-এর 'তোতা পাখির কিসসা'য় দেখা যায় এক বাইদা পাটা খুদানোর আহবান জানিয়ে তার 'সেবা' ফেরি করার এক পর্যায়ে রাজবাড়ির সামনে গেলে রাজকন্যা দাসীর মাধ্যমে তাদের পাটা খুদে দেয়ার আহবান জানায় (পৃ-৬৬-৬৭)। রাজা নিতান্ত একজন ভূ-স্বামী গোছের সামন্ত প্রভু না হলে তার বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ফেরিওয়ালার ডাক বাড়ির ভিতরে পৌছার কথা নয়। তেমনি পাটা মেরামতের দায়িত্বও রাজকন্যার উপর অর্পিত হওয়ার কারণ ছিলো না।

উপরোক্ত কাহিনীগুলোর মতই মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠানের *বাংলাদেশের লোকাকাহিনী* প্রথম খণ্ডের 'পেচু মাতবর' ও 'খুরা করে চাটুর চাটুর', *বাংলাদেশের লোককাহিনী* দ্বিতীয়খণ্ডের 'বেভুল ছিপাই', মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান কর্তৃক সম্পাদিত *ঢাকার লোকাকাহিনীর* 'চূড়ামণির কিস্‌সা'র সপ্তম খণ্ডসহ অনেক কাহিনী থেকে রাজা ও রাজ্য সম্পর্কে যে ধারনা পাওয়া যায় তাতে আন্দাজ করা যায় সে আমলে ছোটো ছোট অঞ্চল নিয়ে এক একটি রাজ্য গড়ে উঠতো। সেসব রাজ্যে মধ্যযুগের ইতিহাসখ্যাত রাজা/বাদশাহ্‌দের মতো বিশাল প্রাসাদ, উজির-নাজির-কোতোয়াল, সান্ত্রী সিপাই ও ধনসম্পদ-বিলাদ্রব্যের ছড়াছড়ি ছিলো না।

এ সত্ত্বেও এসব ছোট ছোট রাজ্যের রাজারা আধিপত্য, প্রজাদের উপর প্রভাব ও ক্ষমতা প্রয়োগের মাত্রা বিচারে কোন অংশেই পরবর্তী কালের রাজাদের চেয়ে কম ছিলো না। তাদের শাসনের আওতাধীন সকলে রাজাকে মেনে চলতে বাধ্য ছিলো। কারণে অকারণে এরা প্রজাদের গর্দান নেয়ার আদেশ দিতো। *ঢাকার লোককাহিনী'র* 'চূড়ামণির কিস্‌সা'র তৃতীয় খণ্ডে রাজা তার গাধার মতো কানের সংবাদ রাজ্যময় প্রচারিত হয়ে যাওয়ার পর কানের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী নাপিতের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে তার গর্দান নেয়ার উপক্রম করে। কারণ রাজা পূর্বেই সতর্ক করেছিলো তার বেঢপ কানের কথা লোকে জানলে "তোর জন বাচ্চাসহ গর্দান কাইটা হালামু" (পৃ-৩৯)। পরে জানা যায় নাপিত রাজার কান গাধার মত হওয়ার খবর কোন মানুষকে বলেনি, পেট থেকে কথাটা বের করে দেয়ার জন্য মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তাতে মুখ ঢুকিয়ে খুবই সাবধানে গর্তের মধ্যে শুধু বলতো "রাজার কান গাধার কান"।

বাংলাদেশের লোককাহিনী প্রথম খণ্ডের 'তেলে ঘিয়ে একদর'-এর রাজা তার বাড়িতে চুরি হওয়ায় দুর্বল দেয়াল নির্মাণের অপরাধে প্রথমে রাজমিস্ত্রীকে পরে তার বদলে কামারকে ধরে এনে শুলে চড়ানোর আদেশ দেয়। (পৃ-১১১-১২)। আর শুধু কোটাল কন্যা হয়ে রাজপুত্রের সাথে বিয়ে হওয়ার অপরাধেই রাজা অনেক বছর ধরে মালঞ্চমালাকে পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম শাস্তি দিতেই থাকে।[১]

লোককাহিনীতে প্রাচীনকালের রাজ্যগুলোর পারস্পরিক ও আভ্যন্তরীণ রাজনীতি সম্পর্কেও তথ্য পাওয়া যায়। 'মালঞ্চমালা'য় মালঞ্চমালার শ্বশুর কর্তৃক পার্শ্ববর্তী দুধবর্ণ রাজাকে ধ্বংস করার জন্য ব্যর্থ আক্রমণের কথা জানা যায়। মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান কর্তৃক সম্পাদিত *বাংলাদেশের লোককাহিনী* তৃতীয় খণ্ডের 'আলম সওদাগর' কাহিনীতে আলম সওদাগর বিপুল সংখ্যক লোকলস্করসহ বিয়ে করতে গেলে তার শ্বশুর দুর হতে মনে করে যে অন্য রাজ্যের রাজা তার নগর আক্রমণ করতে আসছে। তাই তার সিপাহীদের প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়(পৃ-৭৫)।

এক রাজ্য কর্তৃক আরেক রাজ্য আক্রমণের উল্লেখ অবশ্য বেশি নেই। সম্ভবত দুর্গম পথ, সুসংগঠিত সেনাবাহিনীর অভাব প্রভৃতি কারণে প্রাচীন বঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর মধ্যে তখনো রাজনৈতিক আগ্রাসন প্রবল হয়ে উঠেনি।

ইতিহাসের তথ্যানুযায়ী পরবর্তীকালে প্রথমে মৌর্য-সাম্রাজ্যের প্রভাবে পরে গুপ্ত সাম্রাজ্যর আগ্রাসনের মুখে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। রাজ্যগুলো একটি আরেকটিকে আত্মসাৎ করে ক্রমে বৃহৎ রাজ্যে পরিণত হয়। অনেকেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের

---

[১] দ্রঃ দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, মালঞ্চমালা, *ঠাকুরদাদার ঝুলি*।

করদ রাজা হিসাবে রাজ্য গড়ে Dhaka University Institutional Repository পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলে কেউ কেউ স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক উপাদানসম্বলিত লোককাহিনীতে দেখা যায় রাজ্যগুলো আকারে বেশ বড়; রাজাও যথেষ্ট শক্তি, ক্ষমতা, সম্পদ ও মর্যাদার অধিকারী। সেখানে উজির নাজির- কোতোয়াল ও অন্যান্য সভাষদ উপস্থিত। এসব রাজা/বাদশাহর বিলাসের ধরন উল্লেখযোগ্য। তাদের বাসস্থানও এবার সত্যি সত্যি রাজবাড়ির মতো, মধ্যযুগের ইতিহাসে উল্লেখিত রাজোচিত অবস্থানেই এরা আসীন।

ঢাকার লোককাহিনী'র চুড়ামণির কিসসা'র ৬ষ্ঠ খণ্ডের রাজার উজির-নাজির-পাত্র-মিত্র সবাই আছে। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'শাহশান বাদশা'র একটি শাখা-কাহিনীতেও বিশাল দুর্ভেদ্য রাজপ্রাসাদে বসবাসকারী, হীরামানিক্যসহ নানা সম্পদের অধিকারী এক রাজার বর্ণনা রয়েছে যার পুরী রাক্ষসের হাতে বিনষ্ট হয়েছিলো (পৃ-১৬৩-৭৫)। *বাংলাদেশের লোককাহিনীর* দ্বিতীয় খণ্ডের 'অকুল বকুল'-এ জনৈক রাজার অপরূপ সুন্দর প্রাসাদ আছে, উজির নাজির সেনাপতি আছে, এমনকি তার রাজসভায় একজন বুদ্ধিদাতাও আছে (পৃ-১১২-১৩)। *ঢাকার লোককাহিনী'-এর* 'চুড়ামণির কিস্সা'র চতুর্থ খণ্ডেও আমরা একটি সুসংগঠিত রাজ্য ও রাজার কথা জানতে পারি যার পুত্র সেই রাজ্যের উজির নাজির ও কোতোয়ালের পুত্রের সাথে দল বেঁধে রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

লোককাহিনীর মুসলিম ধর্মাবলম্বী রাজাদের মধ্যে প্রায় সবাই শক্তিধর। তাদের শৌর্যবীর্য, ক্ষমতা, সেনাবাহিনী, সম্পদ সবই আছে। *বাংলাদেশের লোককাহিনীর* 'অকুল বাকুল'-এ ক্ষমতাধর এক খেয়ালী স্বভাবের বাদশাহর কথা আমরা জানতে পারি যিনি গল্প শুনতে ভালবাসেন। তিনি নারীর সতীত্বে অবিশ্বাসী হয়ে প্রতিরাতেই একজন করে রমনীকে বিয়ে করে সকালে হত্যা করতেন। তিনি এতটাই ক্ষমতাবান ছিলেন যে তার এমন নিষ্ঠুর কার্যের প্রতিবাদ করার সাহসও কারো ছিলো না। কাহিনী থেকে জানা যায়:

"বাদশার হুকুমে উজির শাদীর লাইগা গেছে। শাদী কইরা বউ লইয়া বাড়িতে আইছে। বড় আনন্দের কথা। কোন মতে রাইতখান পোষাইছে। (বাদশাহ) কইতাছে —জল্লাদ আমার পরিবারে নিয়া তোমরা গুলিত দাও। যত লোক আছিন এই আদেশ হুনইয়া সবই কম্পমান। বাদশার আদেশ এইডা না হুনইয়া তো আর পারে না। এই যে জল্লাদ আছিন— দক্ষিণ পাশে নিয়া হারইয়া নতুন বউয়ের গলাহান কাট্যালছে।[১]

বাংলাদেশের লোককাহিনী তৃতীয় খণ্ডের 'রূপের মনোহর' কাহিনীর রূপতন বাশ্‌শার ছিলো বিপুল বিত্ত-বৈভব ও ক্ষমতা। ড: আশরাফ সিদ্দিকী কর্তৃক সম্পাদিত *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী'* দ্বিতীয় খণ্ডের সোনাফর বাদশা, চিঙ্গিজান বাদশা প্রমুখ ক্ষমতাধর নৃপতি ছিলেন।

চিঙ্গিজান বাদশা দূরদুরান্তের রাজ্যেও ক্ষমতাধর রাজা হিসাবে খ্যাত ছিলেন। তার উজির শাহজাদার বিয়ের খুজেঁ ফেরদৌস বাদশার কন্যার জন্য পয়গাম নিয়ে গেলে ফেরদৌস বাদশা স্বীকার করে যে:

"বার মুল্লুকের বাদশাহ চিঙ্গিজান বাদশা। তাহার পুতের কাছে আমি কন্যা বিবাহ দিব।"[২]

এসব কাহিনীর সবই যে মুসলিম কথকদের উদ্ভাবনা এমন নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাচীন কালের কাহিনীগুলোতে মুসলমান কথকরা তাদের রুচি ও জ্ঞানমত বিভিন্ন উপাদান যোগ করেছেন। কাহিনীর উদ্ভব যখনই হোক, রাজা বাদশাহ সম্পর্কিত এসব তথ্য এটিই ইঙ্গিত করে যে মুসলিম আমলে রাজা/বাদশাহদের রাজ্যের আয়তন বেড়েছিলো, সুসংগঠিত রাজকর্মচারী-দল, জৌলুসময় রাজপ্রাসাদ, বিত্ত-সম্পদ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিলো।

কিংবদন্তী থেকে মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্ধের অনেক রাজাদের কথা আমরা জানতে পারি, যাদের ঐতিহাসিক পরিচয়ও খুঁজে পাওয়া সম্ভব। রাজা যশোধরের রাজধানীর বর্ণনায় জানা যায় :

---

[১] মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান, *বাংলাদেশের লোককাহিনী-দ্বিতীয় খণ্ড* 'অকুলবকুল', পৃ-১১০।

[২] ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, 'চিঙ্গিজান বাদশা', *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, প-৮০।

Dhaka University Institutional Repository

"বর্তমান টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর থানার অদূরে যন্দদা গ্রামে সুবিস্তীর্ণ রাজধানী স্থাপন করেন তিনি— রাজধানীতে গড়ে উঠে অসংখ্য মন্দির , দীঘি, রাজপথ, নহবৎখানা— অথিতিশালা— মনসবখানা—ফউজঘর" ।[১]

রাজা যশোধর ধার্মিক ছিলেন, প্রায়ই যোগ সাধনায় ব্যস্ত থাকতেন। শেষ বয়সে এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সাত দিন ধরে হাজার হাজার মানুষকে ধন সম্পদ দান করা হয়েছিলো। সংগ্রাহক-সম্পাদক ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকীর মতে এই রাজা যশোধর মোঘলদের কর্তৃক উৎখাত বরিশালের চন্দ্রবংশীয় কোন রাজা।

একই গ্রন্থের 'রতন রাজার ঘাট'- এর রতন রাজা সম্পর্কে জানা যায়:

" তার রাজ্য ছিলো— লোকজন ছিলো, লশকর ছিলো — শিপাই— শান্ত্রী — পেয়াদা— মন্ত্রী কোতোয়াল সব ছিল। ছিল হাতিশালে হাতী — ঘোড়াশালে ঘোড়া। আর ছিলো আগুনের ফুলকির মতো অপূর্ব সুন্দরী রানী চন্দ্রাবতী।" এই রাজা একবার শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত গৌড় রাজ্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে গৌড়ে গিয়ে যুদ্ধ করে শত্রুকে হটিয়ে দিয়েছিলেন। ('রতন রাজার ঘাট', ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত, পৃ--৩৪)।

শামসুল ইসলামের *বাংলাদেশের কিংবদন্তীর* 'মাইচম্পা দরগায়' মুকট রায়ের জৌলুসময় রাজধানী আর ধন-সম্পদ-ক্ষমতার গর্বে গর্বিত রাজা, সভাষদবর্গ এবং বিশালসংখ্যক সৈন্য নিয়ে গঠিত সেনাবাহিনীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

এসব লোককাহিনীর বিষয়বস্তু থেকে রাজ্যের আভ্যন্তরীন রাজনীতি সম্পর্কেও তথ্য পাওয়া যায়। রাজ্যে উজির ছিলেন সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি। রাজা/বাদশাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান থেকে শুরু করে তাদের মনোরঞ্জন পর্যন্ত যেন উজিরেরই দায়িত্ব। 'বেভুল ছিপাই' -এর খেয়ালী বাদশাহ তার উজিরকে আদেশ করে, "উজির সাতদিনের মইধ্যে আমারে নিশ্চিন্তা লোক আইনা দিবা ।"[২] অথচ বাদশাহ নিজেও জানতেন নিশ্চিন্তা লোক পাওয়া প্রায় অসম্ভব কাজ। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-এর 'মালঞ্চ কন্যা' কাহিনীতে দেখা যায় রাজপুত্রের আয়ু বাড়ানোর জন্য ব্রাহ্মণ কর্তৃক নির্দেশিত ১২ বছরের কুমারীর খুঁজে উজির গলদঘর্ম হচ্ছে। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনীর* দ্বিতীয় খণ্ডের 'চিঙ্গিজান বাদশা' কাহিনীতে বাদশার ছেলে ফালিদের-এর বিয়ের দায়িত্ব নিয়ে উজির বহুদেশ ভ্রমণ করে অনেক অপমান অপদস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত হরবোলা সুন্দরীর সাথে বিয়ে পাকা করে (পৃষ্ঠা -৮১)।

রাজা-উজিরের সম্পর্কের ভিত্তিতেই হয়তো বাংলা লোককাহিনীতে রাজপুত্র ও উজিরপুত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কর্তৃক সম্পাদিত *ঢাকার লোককাহিনী-এর* 'রাজকুমার সফরচান ও সোবুজ নিশাপরীর কিস্‌সা'য় সফরচান সোবুজ নিশাপরীকে পাওয়ার জন্য অজানার পথে পরীস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার প্রাক্কালে উজির পুত্র তার সঙ্গী হয় এবং অনেক দু:খ কষ্ট সহ্য করে রাজপুত্রের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে (পৃ-৮৫-১২৫)।

তবে তৎকালীন রাজনীতিতে বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রকারী উজিরের সংখ্যাই বেশি ছিলো। অনেক কাহিনীতে দেখা যায় রাজার সুন্দরী স্ত্রী বা কন্যাকে পাওয়ার জন্য অথবা রাজকীয় ক্ষমতার মোহে বা শুধু ঈর্ষার বশেই রাজ্যের উজির ষড়যন্ত্র করে রাজা/বাদশাহকে খুন করেছে বা রাজ্যে বিপদ ডেকে এনেছে।

ঢাকার লোককাহিনী'র 'পরীকন্যার কিসসা'য় এমন এক উজিরের কথা জানা যায় যে বাদশার পুত্রবধুর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে পাওয়ার জন্য শাহজাদার অনুমতিক্রমে 'কন্যাকে' পিতার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার নামে এক নিষ্ঠুর ঘটনার অবতারণা করে। পথিমধ্যে এক নির্জন স্থানে পালকি থামিয়ে উজির বেগমকে বলে :

---

[১] ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, 'গ্রামের নাম যন্দদা,' *কিংবদন্তির বাংলা*, পূর্বোক্ত, পৃ-১৮।

[২] মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, 'বেভুল ছিপাই' , *বাংলাদেশের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ড, গ্রন্থ সুহৃদ প্রকাশনী, ১৯৯৭, প-৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

"দ্যাহ কইন্যা এহন বাস্‌সার পোলাও নাই, বাস্‌সাও নাই। বাস্‌সার মুল্লুকেও আমরা নই। এখন তুমি আমার আগের হগল এহন ভুইল্যা যাও। তোমারে লইয়া আমি নতুন দ্যাশে নতুন ঘরকন্না আরম্ভ করুম। " উজির অতপর শাহজাদার দুই পুত্রকে হত্যা করে।[১]

কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী' দ্বিতীয় খণ্ডের 'ফৈলন খাঁ ও হরণ শুনাই' কাহিনীতে উজিরের ষড়যন্ত্রের কারণেই ফৈলন খাঁ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করে। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী*'র প্রথম খণ্ডের 'আটকুঁড়া বাদশা'য় পিপাসার্ত রাজা উজিরের নিকট প্যানি চাইলে উজির পানিতে বিষ মিশিয়ে রাজাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করে। *বাংলাদেশের লোককাহিনী*, প্রথম খণ্ডের 'না জানিয়া পণ্ডিত' কাহিনীর রাজার উজির রাজাকে হত্যা করার জন্য রাজ-নাপিতকে ভাড়া করে। কিন্তু জোলার আবোল তাবোল কথাবার্তায় নাপিত ভয় পেয়ে উজিরের ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করে দেয়।

তৎকালে উজিররা প্রায়শই রাজ্য দখলের চক্রান্তে লিপ্ত হতো। ক্ষমতার খুব নিকটে থাকার কারণে ক্ষমতার মোহে আক্রান্ত হয়ে অনেক উজিরই হত্যা, অপহরণ প্রভৃতি ঘটনা ঘটাতো। প্রাচীন ও মধ্যযুগে উজিরদের এসব কীর্তি বাঙালির বিশ্বাসঘাতকতার নজির যা পরবর্তীকালেও বিভিন্ন উপলক্ষ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রাচীনকালে বিচার ব্যবস্থাও রাজার এক্তিয়ারে ছিলো। রাজা বিচারে তার খেয়াল খুশিকেই গুরুত্ব দিতো। 'পাতি শিয়ালের কেস্তা'য় পর-পুরুষে আসক্ত রানী ছদ্মবেশী রাজাকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করার জন্য যখন অভিযোগ করে যে ঐ লোকটি তার গায়ে হাত দিয়েছে তখন রানীর পিতা সাক্ষী সাবুদ ছাড়াই সরাসরি আদেশ দেয় "যাও জল্লাদ, নদীর কূল নইয়া যাইয়া ওর গর্দ্দান কাইডা নিয়া আহ"।[২] *ঢাকার লোককাহিনীর* 'চুড়ামণির কিস্‌সা'য় রাজার কান গাধার কানের মত হওয়ার খবর নাপিতের মাধ্যমে প্রচারিত হয়নি। কিন্তু রাজা বিনা প্রমাণে নাপিতকে দোষী সাব্যস্ত করে কারাগারে বন্দি করে রাখে (পৃ- ৪৩)।

বাংলাদেশের লোককাহিনী প্রথম খণ্ডের 'তেলে ঘিয়ে একদর'-এর রাজা চুরি হওয়ার অপরাধে প্রথমে রাজমিস্ত্রী পরে কামারকে ধরে এনে শুলে চড়াতে চায়। কিন্তু যখন দেখা গেল শুলের আকৃতি হাড্ডিসার কামারের চেয়ে বড় তখন রাজার নির্দেশ এলো যে, একটা মোটাসোটা লোককে ধরে এনে শুলে দিয়ে হত্যা করা হোক (পৃ-১১২)।

অন্যায় যদি সরাসরি রাজা বা রাজকর্মচারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট হতো তাহলে হয়তো বিচারে যুক্তি ও তথ্য প্রমাণের গুরুত্ব দেয়া হতো না। অনেক ক্ষেত্রে রাজা নির্বোধের মতো অন্যায় বিচার করতেন। রাজা বিচারে যা রায় দিতেন তা অমান্য করার সাহসও কারো ছিলো না।

তবে গ্রামের ছোটোখাটো অপরাধের বিচার করার জন্য গ্রাম প্রধান ছিলো। তার কথা সবাই মানতো বলেই মনে হয়। কিন্তু প্রধানও নিরপেক্ষ ছিল না। ফলে তাদের বিচার অনেক ক্ষেত্রেই বলশালীর পক্ষে যেতো। এ রকম বিচারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় *বাংলাদেশের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'টেডন ও পরধান্যার কিসসা'য় (পৃ-১১২)।

তবে পরবর্তীকালে বিচার ব্যবস্থা উন্নত হয়। মুসলিম উপাদান সমৃদ্ধ কাহিনীগুলোতে দেখা যায় কাজীর বিচারালয় বসেছে। কাজী সাক্ষী প্রমাণসহ বিচার করছেন। সেই বিচারে আছে নৈতিক দায়, যুক্তি-শৃঙ্খলা ও বুদ্ধির ভূমিকা। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* প্রথম খণ্ডের 'পণ্ডিত দেশের মূর্খ আর মূর্খের দেশের পণ্ডিত ' কাহিনীতে আমরা এক কাজীর ন্যায় বিচারের নমুনা পাই ।

কাজীদের ন্যায় বিচার নিয়ে অনেক কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে। তবে অপরাধের সাথে রাজা- বাদশাহগণ জড়িত থাকলে কাজী বিচারে কতটা ন্যায়ানুগ হতে পারতেন তা সন্দেহের বিষয়। তা ছাড়া প্রভাবশালী ব্যক্তি কর্তৃক কাজীকে বশীভূত করার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা উচিত।

---

[১] মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পা), পরীকন্যার কিসসা, *ঢাকার লোককাহিনী*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮০, পৃ-১৩১।

[২] মোহাম্মদ সাইদুর (সম্পা), পাতি শিয়ালের কেস্তা, *লোক সাহিত্য সংকলন-৩০ খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ-৩১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাঙালির সামাজিক পরিবেশে রাজা ও তার সহযোগী শ্রেণীটি ছিলো সবচেয়ে ক্ষমতাধর । সামান্য কারণে রাজা বা রাজার কর্মচারীরা যে সাধারণ মানুষের গদার্ন নিতো বা তাদেরকে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করতো সে তথ্য আমরা পেয়েছি। রাজাদের ক্ষমতাকে চ্যলেঞ্জ করার কেউ ছিলো না। কখনো কখনো অন্য রাজ্যের আক্রমণে বা উজির/সেনাপতির ষড়যন্ত্রে ক্ষমতাসীন রাজা ধ্বংস হলেও সাধারণ মানুষের উপর তার কোন প্রভাব পড়তো না। নতুন রাজাও তাদের উপর কর বসাতো, তুচ্ছ কারণে কঠিন শাস্তির আদেশ দিতো, আর প্রজাদের সম্পদে ভোগবিলাসে গা ভাসিয়ে দিতো।

লোককাহিনীর বাঙালি সমাজে রাজা-উজির-রাজকর্মচারীদের পরই সওদাগরের দাপট ছিলো। সওদাগরের অনেকগুলো কাহিনী সংগৃহিত হয়েছে। বাংলা একাডেমী শুধু সওদাগরের কাহিনী নিয়ে মোমেন চৌধুরী ও জান্নাতুন আরার সম্পাদনায় *লোক-সাহিত্য সংকলন*-২৪শ খণ্ড প্রকাশ করেছে।

সওদাগররা দেশ বিদেশে বাণিজ্য করে বেড়াত। ফলে এদের সকলেই প্রচুর ধন সম্পদের অধিকারী ছিলো। আদিকালের কাহিনীগুলোতেও সওদাগরের উপস্থিতি এবং গুরুত্বপুর্ণ অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। বিপুল অর্থ বিত্তের মালিক হওয়ার কারণে রাজা/বাদশাহদের সাথে এদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠতো। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের শাহশান বাদশার পিতার সাথে দূরদেশের এক সওদাগরের ছিলো গভীর বন্ধুত্ব (পৃ-১৬৩)।

অনেক সওদাগর প্রচুর ভু-সম্পত্তি কিনে ছোটখাট রাজার মতই বাস করতো। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* তৃতীয় খণ্ডের 'আলম সদাগর' কাহিনীর আলম সওদাগরের ছিলো ছোটখাট রাজার মতো জমি-জমা, ধন-সম্পদ, কর্মচারী ও দাস-দাসী।

তবে সওদাগরদের চারিত্রিক সততা ছিলো না। পেশা থেকে সৃষ্ট স্বভাবের জন্যই হয়তো বা, স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরা অনায়াসে ছল-চাতুরী ও মিথ্যার আশ্রয় নিতো। অপরের সম্পত্তি হরণ, অপরের সন্তান হরণ এমনকি স্ত্রী হরণ করতেও এরা পটু ছিলো। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'মতিলাল বাশ্‌শা' কাহিনীতে তালেব সওদাগর এক নির্জন দ্বীপের তীর থেকে জংগীলাল বাদশার বিপদগ্রস্ত একাকী স্ত্রীকে জোর করে জাহাজে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়। এ কাহিনীতে বর্ণিত তার নিষ্ঠুরতা অমানবিক। নির্জন বালুচরায় জংগীলালের সুন্দুরী স্ত্রী সদ্যোজাত সন্তান রেখে পানিতে নেমেছে পরিস্কার হওয়ার জন্য। তালেব সওদাগর সুন্দরী মহিলাকে দেখে কামলালসা চরিতার্থ করার মানসে বলছে :

"—রে মাঝি মাল্লা এই কন্যাডা লইয়া যায়াঙ্গা, আল্লায় যা করে - - - - তালেব সওদাগর সতী কন্যার কেশটার মাইঝে লম্ফ দিয়া মারইয়া ধরইয়া জাজের মধ্যে তুইল্যা আলছে। সতী কন্যা কইতাছে সওদাগর দয়া করইয়া আমারে ছাইড়া দাও। আমি বালুচরাত একটা সন্তান থুইয়া আইছি। :(সওদাগর বলে) সন্তান দিয়া আমার কোন লাভ নাই। আমি তোমারে শাদী করবাম। টানদা কেইচ্যা আনইয়া জাজের 'হাইন্যা ডরার' মইধ্যে তুইয়া তালা দিয়া আলছে। তালা দিয়া হারইয়া জাজ দিছে ছাড়ইয়া। হেই যে ঠাণ্ডা বালুচড়ার মাইঝে পুতডা আছিন মজার বাতাসে হি ঘুমায়া পড়ছে।"[১]

ঢাকার লোককাহিনীর চূড়ামণির কিস্‌সার প্রথম খণ্ডের কাহিনীতে জনৈক সওদাগরের মনোভঙ্গি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

"যখন সেই রাজকন্যাকে দেখিল, তার মন খারাপ হইয়া গেল। কিভাবে সে রাজকন্যাকে বিবাহ করিবে, এই তার চিন্তা।"[২]

---

[১] মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, মতিলাল বাশ্‌শা , *বাংলাদেশের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ-৭৯।
[২] মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, চূড়ামণির কিসসা, *ঢাকার লোককাহিনী*, পূর্বোক্ত, পৃ-১৪।

মধ্যযুগীয় নিষ্ঠুরতা বলতে Dhaka University Institutional Repository তারচেয়ে কোন অংশে কম ছিলো না। অর্থবিত্তের জোরে, রাজা ও রাজকর্মচারীদের সাথে সুসম্পর্কের সুবাদে তারা অসহায় মানুষদের উপর প্রায়ই অত্যাচার চালাতো বলে লোককাহিনী থেকে জানা যায়।

তবে সওদাগরদের অবস্থান ছিলো নগর পর্যায়ে। কিছু কিছু সওদাগরের কথা জানা যায় যারা নিজ নামে শহরের পত্তন করেছিলো। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের তালেব সওদাগরের ছিলো তালেবপুর শহর। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী'* দ্বিতীয় খণ্ডের 'শাহশান বাদশা'র বাবার দোস্ত জনৈক সওদাগরের একটি নিজস্ব নগর ছিলো বলে উল্লেখ আছে। সে নগর খুব সুন্দর এবং সেখানে নাচ, গান, আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা আছে(পৃ-১৬৩)।

কৃষিজীবী বাঙালির গ্রামাঞ্চলে 'প্রধান' নামে গ্রাম-সর্দার গোছের কিছু লোক ছিলো যাদের প্রধান পেশা ছিলো মাতব্বরি করে অন্যের অর্থে জীবন নির্বাহ করা। গ্রামের সকলে তাকে ভয় পেতো। হয়তো শাসকদের স্থানীয় প্রতিনিধিদের সাথে তাদের সুসম্পর্ক ছিলো বিধায় তারাও কিছুটা ক্ষমতা ভোগ করতো।

বাংলাদেশের লোককাহিনী দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রামপ্রধান নিয়ে একটি কাহিনী আছে। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'চিঙ্গিজান বাদশা' কাহিনীতে হরবোলা কন্যা বাণিজ্য-ফেরত স্বামীর কাছে পরীক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে একটি বাজারে ঘর ভাড়া নেয়ার জন্য বাজারের মোড়লের শরণাপন্ন হয়েছিলো (পৃষ্ঠা -১০০)।

বিভিন্ন কাহিনীতে মাতব্বরের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মাতব্বরও সর্দার বা প্রধানেরই পরবর্তী সংস্করণ। তফাত এই যে সর্দার ও প্রধান পদ দুটি গ্রামবাসী কর্তৃক মনোনীত এবং অপেক্ষাকৃত প্রাচীন , অন্যদিকে মোড়ল ও মাতাব্বর কূটকৌশলে প্রতিষ্ঠিত, তুলনামূলকভাবে নবীন সামাজিক অবস্থান।

লোককাহিনীর সমাজে টেডনদের ভূমিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের পেশা সম্পর্কে জানা যায় না। এরা বুদ্ধিকে জীবিকা না করলেও কূটবুদ্ধি প্রয়োগে পটু ছিলো। অধিকাংশ কাহিনীতে দেখা যায় ন্যায়ের পক্ষেই এরা বুদ্ধি প্রয়োগ করছে। কখনো কখনো সাধারন হাবাগোবা মানুষকে বাঁচানো জন্য টেডন তার বুদ্ধি দিয়ে ঠগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। বাবা মারা যাওয়ার পর চালাক বড় ভাই কর্তৃক ছোট ভাইকে তাদের একমাত্র গাভীর সামনের অংশ, কাঁথা-বালিশের দিবাকালীন অধিকার এবং কাঁঠাল গাছের নিম্নভাগের কর্তৃত্ব দেওয়ার সেই বিখ্যাত গল্পটিতে দেখা যায় এক টেডনের বুদ্ধিতেই ছোট ভাই তার প্রকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডে কাহিনীটি 'টেটনা, বিটলা ও বেক্কেল' নামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (পৃ-২১১)। কাহিনীটির এ পাঠে টেডনের ভূমিকায় বিটলাকে দেখা যায়।

লোককাহিনীর বাংলাদেশে আরেকটি পরজীবী শ্রেনী সক্রিয় ছিলো বলে দেখা যায়; এরা ভণ্ড ধার্মিক সাধক। *ঢাকার লোককাহিনী-এর* 'চূড়ামনি কিস্‌সা'র দ্বিতীয় খন্ডে সওদাগরের সাত ছেলে বাণিজ্যে যাওয়ার পর এক ভণ্ড সাধু বৃদ্ধ সওদাগরকে ধর্মের বাণীতে মোহিত করে তার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পরে সওদাগরের কন্যার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে এক রাতে আরাধনার ছলে তার কামনা চরিতার্থ করতে চায় (পৃ-২৮)। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* প্রথম খণ্ডে 'আগের গীত মাঘে গায়' কাহিনীতে এক ভণ্ড মৌলবীকে সমুচিত শিক্ষা দেয় এক গৃহস্থের বউ। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'রাজার ঝি ও মোল্লার কিস্‌সা'য় এক ভণ্ড মোল্লা তার ধার্মিক আবরণে থেকে একদিন আশ্রয়-দাতার কন্যাকে ভোগ করার অপচেষ্টা চালায় (পৃ-১৫২)।

হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মের মানুষের মধ্যেই এসব ভণ্ড ধার্মিকের বিচরণ ছিলো। প্রাচীন যুগে, মানুষ যখন প্রকৃতির জঙ্গম অপ্রতিরোধ্য শক্তির কাছে অসহায় এবং সে কারণে ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতার নিরাপদ আশ্রয়ে নিরাপত্তা লাভ ও আকাঙ্ক্ষা পুরণের আশায় উন্মুখ তখন এরা ধর্মকে পুঁজি করে জীবিকা নির্বাহ করতো, কখনো কখনো কাম বাসনা চরিতার্থের সুযোগ খুঁজতো। তবে প্রায় কাহিনীতেই দেখা যায় কোন না কোন প্রতিবাদী মানুষ এদের মুখোশ খুলে দিয়ে প্রকৃত রূপ উন্মোচন করে দেয়।

মালিনী এবং নাপিত চরিত্র দুটিও সে সমাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করতো। যে সব কাহিনীর প্রধান উপজীব্য রাজপুত্র ও রাজকন্যার প্রেম সেখানে ভিনদেশী রাজকুমার মালিনীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে তার সাহায্যার্থেই রাজকন্যার সাথে

Dhaka University Institutional Repository

যোগাযোগ করে এবং পরিশেষে তাদের মিলন হয়। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'অকুল বকুল'-এর চতুর্থ কাহিনীতে রাজকন্যা বালাম সুন্দরীকে অপহরণের জন্য বিছুন্যা চোরা রাজমালিনীর আশ্রয় নেয় এবং তার আশ্রয়ে থেকে সে তার উদ্দেশ্য হাসিল করে (পৃ-১৪৫)।

কোনো কোনো মালিনী মানুষ বশীকরণ মন্ত্র জানতো। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'তুলাল বাশ্‌শা' কাহিনীর মালিনী তুলাল বাশ্‌শাকে যাদু করে তার নাতনী ছুরতির হাতে তুলে দেয় (পৃ-৬১)। তৃতীয় খণ্ডের 'আয়নামতি কাহিনী'তে হিরণ বাশ্‌শা যে মালিনীর আশ্রয় নিয়েছিলো সে মালিনী নিজেই হিরণ বাশ্‌শার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বশ করে যাদুর সাহায্যে আয়নামতিকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে (পৃ-৬১-৬২)।

সম্ভবত মালিনীদের কোন নীতিবোধের বালাই ছিলো না। সামান্য অর্থ, উপহার-উপঢৌকনেই তাদেরকে বশ করা যেতো। যেহেতু রাজপ্রসাদে তাদের অবাধ যাতায়াত ছিলো তাই রাজকন্যাকে পটিয়ে পরপুরুষে আসক্ত করে এরা রাজার সর্বনাশ ডেকে এনে ঘর শত্রু বিভীষণের ভূমিকা পালন করতো।

নাপিতরা ছিলো খুব বুদ্ধিমান এবং ঠক স্বভাবের। বাংলা একাডেমীর *লোক সাহিত্য সংকলন*- ৩০ খণ্ডের 'শিয়ালের বিচার' কাহিনীতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ শেয়ালের কাছ থেকে এমন একটি বকনা বাছুর লাভ করে যে প্রতিদিন একটি মানিক বিষ্ঠা দেয়। এর ফলে ব্রাহ্মণের দিন ফিরে যায়। এ কথা নাপিত জানতে পেরে প্রথমে ব্রাহ্মণের গোয়াল ঘর থেকে প্রতি রাতে মানিক নিয়ে যেতে থাকে, শেষে সে বকনা বাছুরটি চুরি করে নিয়ে যায়। বকনা বাছুরের মালিকানা প্রতিষ্ঠায় তার যুক্তিও অদ্ভুত:

নাপিতের ছেলো এট্টা আবাল গরু। ঐ আবাল গরুর প্যাট ফারিয়া তার পর ঐ বহোনের গায় কিছু রক্ত টক্ত মাহাইয়া গেরামের কিছু মানুষ ডাইয়া আইনা কলো যে, ভাইরে আমার আবালের পেটে এট্টা বহোন বাছুর হইছে। আহানে উপায় না দেইয়া আবালের প্যাট ফাড়িয়া বার করিছি।[১]

বাংলাদেশের লোককাহিনী দ্বিতীয় খণ্ডের 'অকুল বকুল'-এর প্রথম শাখা কাহিনীতে এক নাপিত রাজার প্রশ্রয়ে ষড়যন্ত্র করে সওদাগরের স্ত্রীকে অপদস্ত করতে চায়। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'তিলিসমাৎ খাঁ'য় এক নাপিত কথার প্যাঁচে ফেলে এক হতভাগা বনিক সন্তানের সর্বস্ব হরণ করে।

নাপিতরা তখন দুঃসাহসীও ছিলো। কোনো কোনো নাপিত উজির বা সেনাপতির ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করে রাজাকে হত্যা করার মতো দুঃসাহসিক পরিকল্পনায়ও মেতে উঠতো। চুল দাড়ি কাটার সূত্রে সমাজের বড় বড় মানুষের সাথে ছিলো তাদের সুসম্পর্ক। সাধারণ মানুষদেরকে ঠকাতে তাদের কোন ভয় ছিলো না। এদের বুদ্ধিও ছিলো অন্যদের চেয়ে তীক্ষ্ণ ও অধিকতর কার্যপোযোগী। এ জন্য এখনো বলা হয়ে থাকে, 'নাপিতের সাত ছালা বুদ্ধি'। সামাজিকভাবে ধুর্ত-ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও সব মিলেয়ে তাদের অবস্থান যে সাধারণ চাষাভুষা মানুষদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সমাজে বেনে গোষ্ঠীটি যথেষ্ট সহায়-সম্পদের মালিক ছিলো। বেনেদের লোক ঠকানোর নজির খুব একটা নেই। তবে সমাজে তাদের অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিলো বলে মনে হয় হয় না।

লোককাহিনীতে অন্যান্য পেশাজীবী মানুষদের সম্পর্কেও কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। বাংলা একাডেমীর *লোক সাহিত্য সংকলন*-৩০ খণ্ড-এ 'শিয়াল ও বাঘের কিস্‌সা'য় আমরা দেখি শিয়াল জেলে পাড়ায় গিয়ে শুটকি খাওয়ার কথা বলছে। শুটকির সংরক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা জানতে পারি যে, শুটকি শুকিয়ে ঢুলিতে ভরে রাখা হতো পরবর্তী সময়ে বিক্রি করার জন্য (পৃ-৬০)। জেলে পাড়ায় এ দৃশ্য এখনো সুলভ।

---

[১] *লোক সাহিত্য সংকলন*-৩০ খণ্ড, পূর্বোক্ত, প-৪২।

Dhaka University Institutional Repository

বেদে জাতের উল্লেখ আছে *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী দ্বিতীয় খণ্ডের* 'সুফিয়ানী বাদশা' কাহিনীতে। সেখানে শাহজাদা জহুর বাদশাহ্ পরীর জন্য পাগল হয়ে গেলে তার বাবা পুত্রের মন অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করে। তাতে: "কত দেশের কত বাদ্যানী বাজিকরনী আসিয়া নাচগান বা রং তামাসা করিল।" (পৃ-৫০)।

সম্ভবত তখন নাচগান ও বাজী দেখিয়ে জিবীকা নির্বাহ করতো এমন কিছু গোষ্ঠীই ছিলো। পূর্বোক্ত সংকলনের 'সোনাফর বাদশা' কাহিনীতেও বাঈজীর উল্লেখ পাওয়া যায় । উক্ত কাহিনীর বর্ণনায় জানতে পারি, "শহরে আয়রা বাঈজী নামে এক বাঈজী ছিলো। কত রাজা বাদশাহর পুত এই বাঈজীর কাছে আসে!"। (পৃ-৪৬)।

লোককাহিনীতে কেবল বাঈজী নয়, পতিতাবৃত্তিরও খবরও পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত সংকলনের 'চিঙ্গিজান বাদশা' কাহিনীর হরবোলা কন্যা স্বামীর অনুপস্থিতিতে সতী থেকে পুত্র কোলে নেয়ার পরীক্ষা দেয়ার জন্য বাণিজ্য ফেরত স্বামীর যাত্রাপথে এক বাজারে ছদ্মবেশে পতিতারূপে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে বাজারের মালিক "মোড়লের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল যে, সে একজন পেশাকার (পতিতা)। এই বাজারে থাকিতে চায়"(পৃ-১০০)। বাজারে জায়গা নিয়ে 'পেশাকার' হিসাবে অবস্থান করার প্রসঙ্গে হরবোলা কন্যার সংকোচহীন কথাবার্তা থেকে আন্দাজ করা যায় পেশাকারবৃত্তি তখন প্রচলিত ছিলো। তারা নগরে-বাজারে ঘর বেঁধে থাকতো এবং সওদাগর, মহাজন, মোড়ল প্রভৃতি ধনী ব্যক্তিদের মনোরঞ্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতো।

একটি লোককাহিনীতে ব্যতিক্রমধর্মী তথ্য পাওয়া যায়। 'শিয়ালের ভাসান যাত্রা' কাহিনীতে খিচুড়ি রান্না করার উদ্দেশ্যে পাতিল সংগ্রহের খোঁজে বের হয়েছে শিয়াল দম্পতি:

"এমন সোমে তারা দ্যাখলো কি, এক পাতিল আলী বুড়ি এক ঝাঁকা পাতিল নিযে যাইতেছে। হিয়েল আর হিয়েলনি মনে করলো বুড়ীরে ডর দ্যাহাইলে একটা পাতিল মিলতে পারে।"[1]

শেয়ালের ভাসানযাত্রা ছাড়া অন্য কোন কাহিনীতে 'পাতিলআলী' বুড়ির দেখা মিলে না। আমরা ধরে নিতে পারি 'পাতিল আলী' বুড়ি আসলে কুমার গোত্রের এক মহিলা। আন্দাজ করা যায় তখন মহিলাদের বৃত্তির কোন বাঁধা ধরা নিয়ম ছিলো না। তারা স্বামী বা বাবার পেশা গ্রহণ করতে পারতো। হয়তো স্বামী-সন্তান না থাকায় কুমার পরিবারের বুড়ী স্বামীর পেশা গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করতো।

বাঙালি সমাজের নিজের স্তরের অর্থাৎ চাষী ও অন্যান্য খেটে খাওয়া মানুষদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিলো না। কৃষিজীবী বাঙালি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা উৎপন্ন করতো তার একটা বড় অংশ চলে যেতো রাজ-কোষাগারে।

কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী দ্বিতীয় খণ্ডের 'বারিবীর রাজপুত্র সুবোধ কুমারের কিস্‌সা'-য় জানা যায় বকেয়া খাজনা শোধ করতে না পারায় রাজার সৈনিকরা প্রজাদের ধরে এনে কারাগারে বন্দী করে রাখে। পরে এক বৃদ্ধ চাষীর চেষ্টায় জমি-বাড়ি-তৈজসপত্র বিক্রি করে খাজনা শোধ করলে মুক্তির ব্যবস্থা হয় (পৃ-১৭৯-১৮০)।

তখন জলপথে চলাচলের জন্যও খাজনা দিতে হতো। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* তৃতীয় খণ্ডের 'রূপের মনোহর' কাহিনীতে সওদাগর রূপতন বাশ্‌শার সন্তানকে হরণ করে নিয়ে যাওয়ার পর সে বড় হয়ে সওদাগরের বাড়ির ঘাটে জলকর আদায়ের দায়িত্ব পায়। কাহিনীসূত্রে জানা যায় কেউ জলকর দিতে না চাইলে তাকে সিপাই-লস্করের সাহায্যে ধরে এনে দ্বিগুণ-চৌগুণ খাজনা আদায় করা হতো (পৃ-৪০)।

সামান্য ফসলে বিবিধ শরিকের কারণে সাধারণ প্রজারা স্বচ্ছল জীবন নির্বাহ করতো পারতো না। একেবারে হতদরিদ্রের চিত্রও দুর্লভ নয়। 'বক রাজার হাস্তোর'-এর নায়ক মনির মা সম্পর্কে জানা যায়:

---

[1] *শিয়ালের ভাসানযাত্রা, লোক সাহিত্য সংকলন*-৩০ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ-১৮১।

“এ্যাক দ্যাশে আছিল একটো Dhaka University Institutional Repository [illegible] বয়স আছিল তার আট কি নয় বছর। তা মায় বাড়ি বাড়ি কাম-কাজ কইর্‍যা যা পায় তাই দিয়া দুই মায়-ব্যাটার দিন কাইট্যা যায়।”[1]

কাহিনীর পরবর্তী পর্যায়ে পেটের দায়ে এই নিতান্ত বালকটিকেও পরের বাড়িতে কাজ নিতে হয়।

লোক সাহিত্য সংকলন ৩০ খণ্ডের ‘শিয়ালের বিচার’-এ এক ব্রাহ্মণ অর্থের অভাবে শেষ পর্যন্ত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। ‘বুদ্ধি বলে বাদশাহী’-তে বেকার যুবকের পিতার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে যে তথ্য পাই তা এরূপ:

“এক রাজার রাজ্যে এক গরীব লোক থাকিত। সে বছর ভরিয়া পরের খেতে কামলা কাটে। বউ লোকের বাড়ি বাড়ি ধান ভানে।” (*বাংলাদেশের লোককাহিনী* প্রথম খণ্ড ‘বুদ্ধিবলে বাদশাহী’ পৃ-১৩৩)।

উপলব্ধি করা যায় বাঙালি সমাজে তখন খেটে খাওয়া দিন মজুরের সংখ্যা একেবারে কম ছিলো না। চাষের জমি ও হাল-গরু না থাকায় এ শ্রেনীর মানুষগুলো কোন রকমে জীবন ধারণ করতো বলেই মনে হয়। চাষীদের অবস্থা এর চেয়ে কিছুটা ভালো ছিলো। কিন্তু ফসল তোলার পর রাজাকে কর দিয়ে, তাঁতী, নাপিত, বেনে, মহাজনের পাওনা শোধ করে সারা বছর তাদেরকেও যে কায় ক্লেশে দিন যাপন করতে হতো তেমন চিত্র লোককাহিনীতে দুর্লভ নয়।

তার উপর ছিলো চোর ডাকাতের উপদ্রব। “প্রতি রাতেই এক গৃহস্তের কুমড়া চোরে লইয়া যাইত” অথবা “তাহারা সারা রাত জাগিয়া থাকিয়া টাকা কড়ি আগলাইয়া রাখিত’—লোককাহিনীর এ ধরনের বিবৃতি থেকে আমরা বুঝতে পারি চোরও গৃহস্থের অন্যতম শত্রু ছিলো। (যথাক্রমে ‘কুমড়া চোর’ ও ‘বিনা তালে তালে’, *বাংলাদেশের লোককাহিনী* প্রথম খণ্ড, পৃ-৩৯, ৭২)।

রাতে দূরগামী পথে ছিলো ডাকাতের ভয়। ডাকাতরা অনেক সময় সর্বস্ব লুট করে পথিকদের খুন করে যেতো। *কিংবদন্তির বাংলা* গ্রন্থের ‘ডাকাতমারীর বিল’-এ এরকম নিষ্ঠুর এক ডাকাতের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। সাধারন গৃহস্ত বাড়ির মেয়েরা শাসকদের স্থানীয় প্রতিনিধি এবং ভু-স্বামীদের পাশবিক লালসা থেকেও নিরাপদ ছিলো না। শামসুল ইসলাম কর্তৃক সম্পাদিত *ভাটিদেশের কিংবদন্তীর* ‘কালাগাজীর বিল’-এ এমনি এক ভু-স্বামী চাঁদখানের লালসার জন্যই প্রাণ হারায় সুন্দরী যুবতী ফুলজানের স্বামী কালাগাজী।

শামসুল ইসলামের *বাংলাদেশের কিংবদন্তী'র* ‘বড় বন্দরের কুটির’ কাহিনী থেকেও জানা যায় কেন্দ্রিয় প্রশাসনের কর-আদায়কারী দেবি সিংহের পাশবিক নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করে নিরীহ ব্রাহ্মণ নিকুঞ্জ চক্রবর্তীর মেয়ে চন্দ্রমতি।

অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা, রাজা-রাজকর্মচারীদের অত্যাচার, চোর ডাকাতের উপদ্রব, সওদাগর-মহাজন-ঠগ-প্রধানদের শোষন—এইসব নিয়েই ছিলো সাধারণ বাঙালির সামাজিক পরিবেশ। দীর্ঘদিনের অভ্যাসের কারনে শান্তি প্রিয় বাঙালি সমাজের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ সব কিছু মেনে নিয়েই পল্লীর নিভৃত পরিবেশে সীমিত ক্ষমতায়, সীমিত আকাঙ্ক্ষায় সুখের সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখতো, হয়তো মনে সুখও থাকতো। তবু সেই পরিবেশকে মানুষের সামগ্রিক বিকাশের জন্য উপযোগী সুষ্ঠ সুন্দর সামাজিক পরিবেশ বলে দাবী করা যায় না।

পেশাভিত্তিক বর্ণ-বাদ

সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের গবেষকদের বদৌলতে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে, বাংলাদেশে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় কৃষিজীবী-পশুজীবী গোত্র জীবনের পর পর গ্রাম-কেন্দ্রিক স্বয়ং-নির্ভর সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। একটি গ্রামকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠতো একটি সমাজ যা ছিলো স্বয়ং-সম্পূর্ন। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন থেকে শুরু করে অ-প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা,

[1] মোহাম্মদ ইসহাক (সম্পা), বকরাজার হাস্তোর, *লোকসাহিত্য সংকলন-৪২*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, প-৫।

Dhaka University Institutional Repository

চিকিৎসা, ধর্মচর্চা, বিনোদন সব [illegible] এমনকি গ্রাম পঞ্চায়েত জাতীয় সমাবেশের মাধ্যমে বিচারের বন্দোবস্তও ছিলো।

গ্রামে প্রধান বা সর্দার গ্রামবাসীদের ভোটে নাকি বংশ-পরম্পরায় মনোনীত হতেন তা জানা যায় না। গ্রামের প্রধান হিসাবে তার মর্যাদা, সম্মান ও ক্ষমতা ছিলো। পশুপাখির কাহিনী প্রাচীনকালে উদ্ভূত বিধায় এর অপরিবর্তনীয় উপাদানগুলোও প্রাচীন কালের বলে ধরে নেয়া যায়। *লোকসাহিত্য সংকলন*-৩০ খণ্ডের 'হিয়ালোর সর্দারী' কাহিনীতে দেখা যায় বন্যাতাড়িত বেশ কিছু শেয়াল এক গৃহস্থ বাড়ির নিকটস্থ একটি উঁচু ভিটায় আশ্রয় নেয় এবং কিছু দিনের মধ্যেই উপলব্ধি করে যে তাদের একজন সর্দার থাকা দরকার (পৃ-১৩)। স্বয়ং-নির্ভর গ্রাম-ব্যবস্থায় সর্দার বা প্রধান জাতীয় কারো ভূমিকার অভিজ্ঞতা থেকেই হয়তো কাহিনীকার শৃগাল সমাজে সর্দার প্রতিষ্ঠার ধারনাটি নিয়ে থাকবে। গ্রামের সর্দার জাতীয় চরিত্রটিই কালক্রমে প্রধান, মোড়ল, মাতব্বর ইত্যাদি রূপ পায় যাদের ভূমিকা ও অবস্থান পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

গ্রাম সমাজের প্রয়োজন, ব্যক্তির ইচ্ছা ও দক্ষতা অনুযায়ীই প্রাচীন বাঙালিদের পেশাভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠেছিলো। ক্রমে চাষের সাথে সংশ্লিষ্টরা অর্থাৎ ধান ও অন্যান্য ফসল উপাদকরা চাষী, লোহার নিত্য ব্যবহার্য জিনিষপত্র ও শিকারের অস্ত্রাদি নির্মাণকারীরা কামার, বস্ত্র উৎপাদকেরা তাঁতী— এই ভাবে বিভিন্ন দ্রব্য উপাদকরা উৎপাদনের ভিত্তিতে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক নামে পরিচিত হয়। তবে এদেশে ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও ধর্ম ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে পেশার ভিত্তিতে সামাজিক সম্মান ও অবস্থান নির্ণিত হতো বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন গুপ্ত আমলে আর্য-ব্রাহ্মন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ব্রাহ্মন্য বর্ণবাদী ধর্ম ও সংস্কৃতি এদেশে তেমন স্বীকৃতি পায়নি।[১] সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি চতুর্থ-পঞ্চম শতক পর্যন্ত বাঙালির পেশা-ভিত্তিক গ্রাম সমাজে বর্ণভেদ প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

পঞ্চদশ থেকে শুরু করে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব বিস্তারের সময়কাল। প্রথম দিকে এদেশের বাসিন্দাদের সাথে উত্তরভারতীয় আর্য-ব্রাহ্মণদের উঠা-বসা, চলাফেরা, সম্পর্ক স্থাপন একেবারেই নিষিদ্ধ থাকলেও ক্রমে সেই কঠিন নিয়ম শিথিল হয়, ধর্মান্তরিত স্থানীয় বাসিন্দাদেরকেও 'হিন্দু' বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। এ সময় তাদে ধর্মীয় ও সামাজিক ষ্ট্যাটাস নির্ধারণের প্রশ্নে প্রাচীন বাংলার গ্রাম-সমাজের মানুষদের পেশাকে গুরুত্ব দেয়ায় ক্রমে পেশা-ভিত্তিক বর্ণপ্রথা প্রচলিত হয়। গুপ্ত ও পাল আমলে হিন্দু বর্ণ-প্রথা প্রচলিত ছিলো।

সেন আমলে বিভেদ আরো বৃদ্ধি পায়, তেমনি বিভাজনের দেয়ালটিও আরো পাকাপোক্ত হয়। একাদশ-দ্বাদশ শতকের মধ্যে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ, শুদ্র ও অন্ত্যজ-ম্লেচ্ছদের অসংখ্য বর্ণ নিয়ে বর্ণবাদী হিন্দু সমাজের কাঠামো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

লোককাহিনীতে বিধৃত সমাজে আমরা বিভিন্ন পেশার মানুষের সন্ধান পাই। এদের মধ্যে নাপিত, বেনে, মালি প্রভৃতি পেশাজীবীদের কথা আলোচিত হয়েছে। লোককাহিনীর জগতে চাষীরা সংখ্যায় সর্বাধিক—হয়তো রাজা-বাদশাহদের সমসাময়িক কিংবা বেশি। চাষীদের নিয়ে যেসব কাহিনী গড়ে উঠেছে তাতে সমকালীন সমাজ-সম্পর্কিত তথ্যও অধিক।

এ ছাড়া অন্যান্য যে সব পেশাজীবীর উল্লেখ পাওয়া যায় তারা হলো জ্যোতিষ, কোটাল, দাঁড়ি, মাঝি, মাল্লা, কামার, বাদক, বাজীকর, ধাই, কাঠুরে, কুমার, জেলে, মালিনী, ঢুলী, দরওয়ানী, ছিপাই, ঘোষ-গোপ-গোয়ালা, তেলী, ময়ড়া, তাঁতী-যুগী, ভাঁড়ী, কামলা, বদ্যি-কবরেজ, গিরস্থ, ফকির, রাখাল, পেশাজীবি চোর-ডাকাত, পরধান্যা, টেডন, কাজী, মোল্লা, কাসেদ, বাদ্যানী, খানসমা বণিক, পেয়াদা, হাড়ি, নাগার্চি, ধোপা, রাজমিস্ত্রী ইত্যাদি।

---

[১] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস*, আদি পর্ব, (সুভাষ মুখোপাধ্যায় কৃত সংক্ষেপিত সংস্কারণ), নিউ এজ পাবিলিশার্স, প্রাইভেট লি. কলিকাতা. দ্বিতীয় সংস্করণ. ১৯৮৩. প- ৫৩।

বিভিন্ন পেশার লোকদের উপDhaka University Institutional Repository[illegible]প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পেশা-ভিত্তিক বর্নবাদী সমাজ ব্যবস্থার চিহ্ন খুব বেশি নেই। বরং হিন্দু ধর্মে যাকে 'নীচ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে লোককাহিনীতে তার অবস্থান খাটো করে দেখা যায় না। নাপিতরা সে সমাজে কতটা দাপটের সাথে বাস করতো তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। গোপ, কর্মকার, বেনে, তেলি, তাঁতীদের অবস্থানও খারাপ ছিলো না।

আমরা দেখি *বাংলাদেশের লোককাহিনী* প্রথম খণ্ডের 'জাতে জাত মিলে' কাহিনীতে ধোপার সাথে রাজার স্ত্রীর অবৈধ ভালবাসা গড়ে উঠেছে (পৃ-১৫৮), নাপিত রাজার সাথে ঘনিষ্ঠতার সুত্রে সওদাগরের স্ত্রীকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করছে (পূর্বোক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-১১৫)। অনেক কাহিনীতে দেখা যায় রাজার ছেলে মালিনীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে স্বার্থ উদ্ধার করছে।

উপরোক্ত তথ্যবলী বিবেচনা-পূর্বক আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে:

(১) অধিকাংশ বাংলা লোককাহিনী বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই সৃষ্টি হয়ে থাকবে। ফলে ব্রাহ্মণ্য বর্নবাদ তাতে খুব একটা প্রভাব ফেলেনি।

(২) একাদশ-দ্বাদশ শতকের পর সমাজে ব্রাহ্মণ্য বর্ণবাদী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও বিভিন্ন কথকের মাধ্যমে লোককাহিনীর কিছু পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়েছে। কিন্তু আর্য সংস্কৃতির প্রতি এদেশের মানুষের সাধারণ বিদ্বেষের কারণে পরের যুগের কথকরা কাহিনীতে বর্ণবাদী মনোভাব যতটা সম্ভব এড়িয়ে গেছেন।

(৩) ব্রাহ্মণ্য বর্নবাদী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরবর্তী কালে উদ্ভুত যে সব কাহিনীতে বর্ণবাদী মনোভাব প্রধান উপজীব্য নয়, সেখানে আরো পরবর্তী সময়ে আগত মুসলমান কথকরা কাহিনী থেকে বর্নবাদী উপদান বাদ দিয়ে থাকতে পারে।

তবে ব্রাহ্মণ্য বর্ণবাদী সংস্কৃতির পরিচয় লোককাহিনীতে যে একেবারেই অনুপস্থিত এমন নয়। বরং বিরল হলেও নিম্নোক্ত দু'একটি দৃষ্টান্ত থেকে আমরা সেই বর্ণবাদী সমাজের অমানবিক নাগপাশের যন্ত্রণা আঁচ করতে পারি। একটি লোককাহিনী থেকে জানা যায়:

"এক হাড়ির পুত। খুব খোপছুরত চেহারা। সে অনেক লেখাপড়া শিখিল। কিন্তু সমাজের মানুষ তাহার কোন দাম দিল না। ভালো বংশের কোন কন্যাও সে বিবাহ করিতে পারিল না।"[১]

কাহিনীর পরবর্তী অংশে দেখা যায় সে জাত গোপন করে দূরদেশে উচ্চ বংশীয় মেয়েকে বিয়ে করতে সমর্থ হয়। পূর্বোক্ত সংকলনের 'এক টেটনা ও সাত জোলা' কাহিনীতে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে ঘটনাচক্রে গরুর হাড় পরে থাকতে দেখে টেটনা ব্রাহ্মণকে ভয় দেখায় যে, সে সবাইকে বলে দেবে ব্রাহ্মণ গরুর মাংস খেয়েছে। সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়ে ব্রাহ্মণ টেটনাকে অনেক অর্থ দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে। (পৃ-৪৬)।

মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন ও সৈকত আসগর কর্তৃক সম্পাদিত *বরিশাল জেলার লোকসাহিত্য*-এর 'চন্দ্রশেখর' কাহিনীতে দেখা যায় ধীবর কন্যার ছদ্মবেশে কোন এক দেবী ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখরকে বলছে, "আমি ধীবর কন্যা। আমার পা স্পর্শ করে আমাকে পাপিষ্ঠা করবেন না।"

বাংলাদেশের কিংবদন্তী, 'চলন বিলের মহর' কাহিনীতে জানা যায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ বহু কষ্টে স্ব-বর্ণের এক ব্রাহ্মণ পাত্র খুঁজে পেয়েছে। বর্ণবাদের কঠিন নিয়ম না থাকলে ব্রাহ্মণ কন্যার বিয়ের জন্য এতো কষ্ট করে স্ব-বর্ণের পাত্র খুঁজতো না।

---

[১] 'সুখে থাকলে ভুতে কিলায়', *বাংলাদেশের লোককাহিনী* প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ-১০০।

Dhaka University Institutional Repository

সভ্যতার ঠিক কোন পর্যায়ে নারী-পুরুষের সমাজ-অনুমোদিত ন্যায়-সঙ্গত বন্ধন হিসেবে বিয়ের উৎপত্তি তা জানা যায় না। তবে অতি প্রাচীনকালেও পৃথিবীর প্রতিটি জাতি ও গোত্রের মধ্যে বিয়ে প্রচলিত ছিলো। অবশ্য সাংস্কৃতিক-নৃতত্ত্বে এমন একটি মতবাদ এক সময় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো যে, আদিম কালে মানুষ অবাধ যৌন জীবনে অভ্যস্ত ছিলো; সেখানে বিয়ে বা এ ধরনের স্থায়ী বন্ধনের অস্তিত্ব ছিলো না।[১]

পরে অবশ্য এই মতবাদ পরিত্যক্ত হয়। বরং এডোয়ার্ড ওয়েস্টার মার্ক (Edward Wester Marck)-এর মতো নৃবিজ্ঞানীরা যুক্তি প্রমাণ দিয়ে এ কথা প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন যে, মানব সমাজে কোন কালেই পরিবারবিহীন যৌন জীবন ছিলো না। হয়তো আজকের দিনের মতো মন্ত্রপাঠ, অনুষ্ঠান ইত্যাদি সামাজিক বিষয়গুলো ছিলো না । কিন্তু এক জন নারী ও একজন পুরুষ একসঙ্গে নিয়মিত বসবাস করতো এবং সন্তান জন্ম দিয়ে লালন-পালন করতো; বাসস্থান খুঁজে বের করা বা নির্মাণ, খাদ্য সংগ্রহ, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি অতি-প্রয়োজনীয় বিষয়ে উভয়ে অংশগ্রহণ করতো। আদিম মানুষের সেই যুগল জীবন যাপনের ফলে যে অনুপরিবার সৃষ্টি হয় তা থেকেই পরিবারের উৎপত্তি। ঐ পর্যায়ে বিয়ের কোন চুক্তি বা অনুষ্ঠান ছিলো না, কিন্তু স্থায়ীভাবে এবং অপেক্ষাকৃত সহজে জীবন নির্বাহ করার প্রয়োজনেই একজন নারী ও একজন পুরুষ পরস্পরের মধ্যে কতিপয় অকথিত দায়িত্ববোধ নিয়ে এক সাথে বাস করতো।[২]

বাংলা লোককাহিনীতে অতি প্রাচীনকালের অবাধ যৌন-সংসর্গের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এমনকি প্রাচীনতম নীতিকথা ও উপকথাগুলোতেও বিয়ে একটি সমাজ-স্বীকৃত পদ্ধতি হিসাবে গুরুত্ব পেয়েছে। সেখানে নিজ স্বামী-স্ত্রী ব্যতিত অন্যের সাথে যৌন-সংসর্গ ঘৃণিত বলে বিবেচিত হয়েছে। তবে লোককাহিনীগুলোতে প্রেম একটি স্বীকৃত বিষয় হিসাবে উপস্থিত। বিধবা-বিবাহ এবং বাল্যবিবাহও প্রচলিত ছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

বাংলা লোকাহিনীতে বিয়ে একজন নারী এবং একজন পুরুষের মধ্যে সামাজিক বন্ধন। প্রাচীন কালে উদ্ভূত মৌখিক সাহিত্য পশুপক্ষীর কাহিনী ও নীতি কাহিনী বিয়ে সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য বহন করছে। এমন একটি লোককাহিনী 'বক রাজার হাস্তর'-এ দেখা যায় রাখাল বালক মনি অনেক দু:খ কষ্ট স্বীকার করে তার প্রণয়ননীকে বিয়ে করে নিয়ে আসে। কাহিনীর এক অংশে জানা যায়:

"মনির হাতে সবাই পরাজিত অইয়া সব বইনেরা মিল্যা মনির হাতে সিদুর কন্যাকে দোম দামের সহিত বিয়্যা দিলো। তারপরে মনি সিদুর কন্যাকে দ্যাশে লিয়া সুহে সোংসার কোইরতে লাইগলে।"[৩]

এই গল্পটি মানুষের সাথে বন্য প্রানীর সম্পর্ক নিয়ে গড়ে উঠেছে। গল্পের অন্যান্য উপাদান যেমন, চারপাশের গহীন অরন্য, যোগীদের উপস্থিতি, সিদুর কন্যার স্বর্গে বসবাস এবং কয়েকটি যাদু মটিফের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় গল্পটি অতি প্রাচীন কালের।

বাংলা একাডেমীর *লোক সাহিত্য সংকলন*-৩০ -এর 'শিয়াইল্যা ও এক মাতারীর কিসসা'য় দেখা যায় শেয়াল বিয়ে করে রীতিমত ঘর সংসার করছে। পূর্বোক্ত সংকলনের 'শিয়ানো ও শিয়ালনীর কিসসা' থেকেও শিয়াল প্রজাতির বিবাহিত জীবনযাপন এবং দৈনন্দিন ঘরকন্যার চিত্র পাওয়া যায়।

---

[১] দ্রষ্টব্য: Henry Luis Morgan, *Ancient Society*, London, 1877, p-395-96 & 441.

[২] Edward Wester Marck, *The History of Human Marriage*, Third Ed. London 1901, P-51।

[৩] 'বক রাজার হাস্তোর' *লোকসাহিত্য সংকলন-৪২*, পূর্বোক্ত, পৃ-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

অনেক পশুপক্ষীর কাহিনীতে পশু-পাখির নিজেদের মধ্যে অথবা মানুষের সাথে বিয়ের উল্লেখ আছে। যদি বিয়ে নামের সামাজিক প্রক্রিয়াটি সর্বজনমান্য এবং সর্বত্র প্রচলিত না হতো তা হলে লোককাহিনীর উদ্ভাবক-কথকরা মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে বিয়ের চিত্র কল্পনা করতো না।

লোককাহিনীর বাঙালি সমাজে সাধারণত পাত্রপক্ষই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যায়। বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যারা যেত তাদেরকে ভালভাবে আপ্যায়ন করা হত। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী দ্বিতীয়* খণ্ডের 'চিঙ্গিজান বাদশা' কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে বাদশার পুত্র ফালিদের বিয়ের জন্য উজির আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব নিয়ে গেলে কন্যাপক্ষ তার জন্য বিশেষ খাবার দাবারের আয়োজন করে এবং দুই তিন দিনের জন্য তাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করার অনুরোধ জানায় (পৃ-৮০)। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'তুলাল বাশ্‌শা' কাহিনীতেও দেখা যায় পাত্রপক্ষের উজির বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেলে কন্যাপক্ষ তাকে খুবই আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করে।

পাত্রপক্ষের প্রস্তাবক্রমে কন্যাপক্ষের সম্মতিতে বিয়ে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছাড়াও বিয়ের আরেক রীতি ছিলো। তা হলো ছেলে ও মেয়ের প্রেম, অতপর অনেক দু:খ কষ্ট অগ্রাহ্য করে নায়িকার খোঁজে নায়কের যাত্রা এবং শেষ পর্যন্ত মিলন; সে মিলনও প্রথাসিদ্ধ কায়দায় অর্থাৎ বিয়ের মাধ্যমে। এ ধরনের বিয়েতে দেখা যায় স্ত্রী-পুরুষ আনুষ্ঠানিক বিয়ের পূর্বেই একত্রে বসবাস শুরু করেছে। তবে প্রাক-বিবাহ সংসর্গ কেবল সেখানেই দেখা যায় যেখানে কন্যা বিপদগ্রস্ত এবং কন্যার পরিবার পরিজন অনুপস্থিত। সাধারণত রূপকাহিনী ও রোমাঞ্চকাহিনীতেএ ধরনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সচরাচর সেখানে কন্যপক্ষের সকলে রাক্ষস বা দেও-এর হাতে নিহত, কন্যার সহযোগিতায় নায়কের হাতে রাক্ষস নিহত হয়। অতপর মিলন। তবে এসব ক্ষেত্রে কন্যাসহ নায়কের বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের পর আনুষ্ঠানিক বিয়েও হয়।

ঢাকার লোককাহিনী'র 'রাজকুমার সফর চান ও সোবুজ নিশাপরীর কিস্‌সা'য় সফর চান পরীকন্যা সোবুজ নিশাপরীর প্রেমে পড়ে। সোবুজ নিশাপরীকে পাওয়ার জন্য সে পরীস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে অনেক দু:খে কষ্ট সহ্য করে শেষ পর্যন্ত সোবুজ নিশাপরীর সন্ধান পায়। পরীকন্যার সাথে তার আনুষ্ঠানিক বিয়ের মাধ্যমে মিলন হয়। কিন্তু *বাংলাদেশের লোককাহিনী* গ্রন্থের 'আয়নামতি'-তে হিরণ আয়নামতি কন্যাকে রাক্ষসের পুরী থেকে উদ্ধার করার পর থেকেই একসাথে বসবাস শুরু করে। অবশ্য দেশে আসার পর রীতিসিদ্ধ উপায়ে তাদের বিয়ে হয়।

নরনারীর প্রেম এবং অনেক দু:খ-কষ্ট ও বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে বিয়ের মাধ্যমে মিলনের বিষয়টি নিয়ে উদ্ভুত হয়েছে বহু জনপ্রিয় কাহিনী। বস্তুত অনেক রোমাঞ্চকাহিনী এবং রূপকাহিনীর মূল কাঠামোটি এরকম: কোন উপায়ে নায়ক-নায়িকার দেখা, পরস্পরের প্রেমে মুগ্ধ হওয়া; তবে সেখানে নায়ক-নায়িকার মিলনের পথে একটি বাধা থাকবেই। সুতরাং নায়িকা পরী হলে পরীস্থানে, মানুষ হলে নিজের রাজ্যে চলে যায়। অতপর তারা পরস্পরকে পাওয়ার জন্য উন্মাদ প্রায় হয়ে উঠে। সবশেষে, নায়িকার জন্য উন্মাদ প্রায় নায়ক মিলনের অভিযানে বের হয়ে নায়িকাকে লাভ করে।

এ ধরনের প্রেমের গল্পগুলোতে নায়ক বা নায়িকা তার প্রেমাস্পদের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও রাজী। 'বিভাস কন্যা' কাহিনীর বিভাস কন্যাকে পাওয়ার জন্য পাগলপ্রায় রাজপুত্র তার দোস্তকে বলে, "বন্ধু তুমি যাও দেশে। যে বিভাস কন্যেরে পরাণ ভরে দেখলাম তারে যদি কোনদিন চিরতরে নিয়ে যেতে পারি তবে দ্যাশে যাব। না হলে এই নদীতে ঝাপ দে মরব।"[১]

পূর্ব-পাকিস্তানী লোককাহিনীর 'অজগর দম্পতি' কাহিনীতে দেখা যায় রাজপুত্র নাগকুমার ঘটনাক্রমে তার পূর্বজন্মের স্ত্রীর সাক্ষাত পেয়ে তার প্রেমে পড়ে। কাহিনীর এক পর্যায়ে বিচ্ছেদ নেমে এল নাগকুমার তার প্রণয়নীর জন্য এতটাই উতলা হয়ে যায় যে, তার বাবা তাকে পাগলাগারদে আটক রাখতে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশের কিংবদন্তী' গ্রন্থের 'একটি প্রেমের জন্য' কাহিনীতে যুবরাজ অনিরুদ্ধ প্রেমিকা উষাবতীকে লাভ করার জন্য তার হবু শ্বশুরের রাজ্য পর্যন্ত ধ্বংস করে দেয় (পৃ ৪৯-৫০)।

[১] মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'বিভাস কন্যা', *যশোরের লোককাহিনী*, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮, পৃ-৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা লোককাহিনীতে প্রেম অন্যতম প্রধান উপাদান। বিভিন্ন জনপ্রিয় লোককাহিনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, লোককাহিনী যে সব কারনে জনপ্রিয় হয় তার মধ্যে প্রেম অন্যতম প্রধান নিয়ামক। গ্রাম বাংলার নিরক্ষর মানুষ বাস্তব জীবনে বিভিন্ন দিক থেকে বঞ্চনা-ব্যর্থতা নিয়ে জীবন যাপন করতো। ফলে তার মধ্যে জন্ম নিতো একটি বিরুদ্ধ আবেগ;---ব্যর্থতার বিরুদ্ধে, সামাজিক শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং তার নিজের অবস্থানের বিরুদ্ধ জমতে থাকতো ক্ষোভ। লোককাহিনীতে তার আবেগের প্রশমন ঘটতো। কল্পনায় লোককাহিনীর নায়কের সাথে একাত্ম হয়ে সে অপূর্ব সুন্দরী রাজকন্যার প্রেমে পড়তো এবং দুর্ধর্ষ অভিযান চালিয়ে লাভ করতো রাজকন্যা ও রাজত্বি দুটোই।

পাত্রপক্ষ ও পাত্রীপক্ষের পারস্পরিক আলোচনা অথবা ছেলে মেয়ের প্রেম ছাড়াও বিয়ের আরেকটি রীতি ছিলো। তা হলো স্বয়ম্বর পদ্ধতি। কয়েকটি লোককাহিনীতে এ ধরনের বিয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। *লোক সাহিত সংকলন-৩০ খণ্ডের* 'শিয়াল্যা ও রাজকন্যার কিস্‌সা'য় রাজকন্যাদের বিয়ের জন্য রাজা স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করে। সেখানে ছোট কন্যার মালা দুর্ঘটনাক্রমে শিয়ালরূপী রাজপুত্রের গলায় পড়ে যাওয়ায় শিয়ালরূপী রাজপুত্রের সাথে ছোট রাজকন্যার বিয়ে হয় (পৃ-১০১)। *ঠাকুরদাদার ঝুলি* গ্রন্থের 'মালঞ্চমালা' কাহিনীতে দুধবর্ণ রাজার মেয়ে প্রাসাদের চূড়া থেকে নিচে আগত রাজপুত্রের গলায় মালা দিয়ে তাকে স্বামীত্বে বরণ করে নেয়। (কিংবদন্তির বাংলা, পৃ-১৮৬)।

স্বয়ম্বর প্রথা পুরাণে ও চর্চায় হিন্দু ধর্মের বৈবাহিক-প্রথা হিসাবে পরিচিত। কিন্তু অনেকের মতে এটি অষ্ট্রিকদের সামাজিক প্রথা। অষ্ট্রিক ছাড়াও প্রাচীন ভারতের অন্যান্য যাযাবর জাতি কর্তৃক এই রীতি গৃহীত হয়েছিলো।[১] মনুর বিধানে গান্ধর্ব বিবাহ রীতির মধ্যে স্বয়ম্বর-এর উল্লেখ নেই।

সুতরাং স্বয়ম্বর প্রথার বিয়ের মধ্য দিয়ে আমরা প্রাচীন বাঙালি সমাজের একটি সামাজিক রীতির সন্ধান পাচ্ছি যা কালক্রমে আর্যদেরকেও প্রভাবিত করেছিলো।

লোককাহিনীতে বিয়ের আরেকটি রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। তা হলো বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কিছু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার শর্ত সাপেক্ষে বর আহবান করা হতো। সম্ভাব্য নায়ককে নির্ধারিত পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে বিয়ের যোগ্যতা অর্জন করতে হতো। যেমন *পূর্বপাকিস্তানী লোককাহিনী* গ্রন্থের 'বানর বাদশা' কাহিনীতে দেখা যায় বানর রাজা পাতালপুরী থেকে রাজকন্যাসহ আসার পথে জানতে পারে এক রাজকন্যা প্রতিজ্ঞা করেছে যে তাকে যাদু দেখিয়ে মুগ্ধ করতে পারবে তাকেই সে বিয়ে করবে। বানর তাকে যাদু দেখিয়ে মুগ্ধ করে এবং বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে আসে।

নুরুল আলম খান ও সৈকত আসগর কর্তৃক সম্পাদিত *মানিকগঞ্জ জেলার লোকসাহিত্যে* গ্রন্থের 'বিদ্যা বড় না বুদ্ধি বড়' কাহিনীতে দেখা যায় রাজা বিজ্ঞপ্তি টানিয়ে দিয়ে লিখে দেয় যে, কোন পুরুষ যদি তার মেয়েকে পাশা খেলায় হারাতে পারে তবে সেই পুরুষের সাথে তার কন্যার বিয়ে দেয়া হবে। মোহাম্ম সাইফ উদ্দিন ও সৈকত আসগর কর্তৃক সম্পাদিত *বরিশাল জেলার লোকসাহিত্যে* 'নকীব রাফেজা ও পরীর কিস্‌সা'য় রাজা তার ছেলের জন্য পছন্দমত পাত্রী না পেয়ে অবশেষে তার ছেলের একটি ছবি থেকে অনেক নকল বানিয়ে বিয়ের বিজ্ঞপ্তিসহ বিভিন্ন রাজ্যে পাঠিয়ে দেয়।

প্রাচীনযুগের মানব সমাজে শক্তি একটি বিশেষ নিয়ামক উপাদান ছিলো। সে কারনে জোর করে রাজ্য দখল, ধন-সম্পত্তি হরণ করার মতো কন্যা দখল বা হরণের তথ্যও পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে মেয়ের মতামতের কোন গুরুত্ব দেয়া হতো না। যেমন *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডে 'পাঁচতোলা কন্যার কিস্‌সা'য় রাজার ছোট ছেলে শত্রু রাজ্যের রাজকন্যা পাঁচতোলাকে চুরি করে এনে বিয়ে করে (পৃ-১৬১-১৬২)। *লোক সাহিত্য সংকলন-৩০* খণ্ডে 'শিয়াল্যা ও এক মাতারীর কিস্‌সা'য় দেখা যায় শেয়াল এক মহিলার মেয়ে চুরি করি নিয়ে গিয়ে জঙ্গলে ঘর-সংসার করছে। সওদাগররা নদী-তীর ধরে দেশ ভ্রমণের সময় বিপদগ্রস্ত সুন্দরী মেয়েদের হরণ করে এনে বিয়ে করতো। *শিরনী* গ্রন্থের 'শিরণী', *বাংলাদেশের লোককাহিনী'র* 'তুলাল বাশ্‌শা' ও 'মতিলাল বাশ্‌শা' প্রভৃতি কাহিনীতে সওদাগররা বিপদগ্রস্ত মেয়েদের হরণ করে নিয়ে যায় বলে উল্লেখ আছে।

তবে কন্যা হরণের পর ধরা পড়লে গুরুতর শাস্তি পেতে হতো। পূর্বোক্ত 'তুলাল বাশ্‌শা' কাহিনীতে তোলাপজান কন্যাকে হরণকারী রূপতন সওদাগরকে মাটিতে পুঁতে হত্য করা হয়। আন্দাজ করা যায় কন্যা হরণের ঘটনা গর্হিত অন্যায় বলেই বিবেচিত হতো।

---

[১] Benaiamin Walker. *Hindu World.* Vol-II. George Allen & Unwin Ltd. London. 1968. P-468.

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন বাঙালি সমাজের বিয়েতে প্রচুর আমোদ ফূর্তি হতো। বিয়ে বাড়িতে চারপাশে মশাল জ্বালিয়ে বাজী-বাদ্যকর এনে নেচে গেয়ে এক আনন্দঘন পরিবেশে বিয়ে সম্পন্ন হতো। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* প্রথম খণ্ডের 'বাঘ জামাই'-এ আমরা এ রকম বর্ণনা পাই।

বিয়েতে অনেক বরযাত্রী যেতো। বিয়ে করে বউ নিয়ে আসার পর 'বউভাত' জাতীয় অনুষ্ঠান হতো। সেখানে দাওয়াত করে প্রচুর লোক খাওয়ানো হতো। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* তৃতীয় খণ্ডের 'আলম সদাগর' কাহিনীতে দেখা যায় আলম সওদাগর এতো বেশি বরযাত্রী ও গাড়ি ঘোড়া নিয়ে বিয়ে করতে গেছে যে তার শ্বশুর দূর থেকে বরযাত্রীদের দেখে আক্রমণকারী সেনাদল মনে করে প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি নেয়।

রাজবাড়ি ও বিত্তশালী লোকদের বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে এতো আনন্দ হতো যে সাধারণ মানুষেরা তা দেখার জন্য ভিড় জমাতো। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* প্রথম খণ্ডের 'দু:খীয়ার কিস্‌সায়' দেখা যায় দু:খীয়ার দুই ভাবী রাজবাড়ির বিয়ে দেখার জন্য গাছের উপর মন্ত্র চালিয়ে গাছকে দ্রুত বাহনে পরিণত করে এবং সময়মত রাজবাড়ি পৌঁছে বিয়ের অনুষ্ঠান দেখতে সমর্থ হয়।

বিয়েতে বর ও কন্যাপক্ষের পরস্পরের সম্পর্কটি ছিলো হাস্য-মধুর। উভয় পক্ষের মধ্যে ঠাট্টা মশকরার প্রচলন ছিলো। মাঝে মধ্যে এমনও হতো যে ঠাট্টা শেষ পর্যন্ত এক পক্ষের জন্য মারাত্মক বেদনাদায়ক পরিণতি লাভ করতো। *বাংলাদেশের লোককাহিনীর* প্রথম খণ্ডের 'প্রতিশোধ' কাহিনীতে এ ধরনের একটি ঘটনার কথা জানা যায়। সেখানে কন্যপক্ষ বরপক্ষের লোক গণনার নামে লাঠি দিয়ে মাথায় একটি করে আঘাত দিয়ে গণনা করে ঘরে ঢুকতে দেয়। এর প্রতিশোধ হিসাবে বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে দাওয়াত করে এনে দরজায় দাড়িয়ে থেকে প্রত্যেকের পশ্চাদভাগে একটি করে লাথি দিয়ে লোক গণনা করে। ক্ষুব্ধ হওয়ার উপায় নেই, কারন বরপক্ষ বলছে এটিই তাদের সমাজের রেওয়াজ। তা ছাড়া খেলাটি শুরু করেছে কন্যাপক্ষই। রাতে কন্যাপক্ষের ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে একটি বিষহীন সাপ ছেড়ে দেয়া হয়। তাতে সন্ত্রস্ত কন্যাপক্ষের লোকজনের হৈ-হুল্লোড় ঠেলাঠেলিতে দুএকজন বৃদ্ধ লোক মারা যায়, অন্যরা আহত হয়। লোককাহিনীতে এ ধরনের ঘটনার নজির অবশ্য খুব একটা নেই। তবে গ্রাম বাংলায় এখনো এমন সব ঠাট্টা প্রচলিত আছে যা পরস্পরের জেদের কারনে বাড়তে বাড়তে উভয় পক্ষের জন্য বিপদজনক হয়ে দাঁড়ায়।

বিয়ের সাজসজ্জাও আকর্ষণীয় ছিলো। বাঙালির সাজসজ্জা সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনায় বিয়ের সাজসজ্জাও আলোচিত হয়েছে। বিয়ের কনের সাজসজ্জা সম্পর্কে পূর্বের একটি উদ্ধৃতি এখানে আবার সন্নিবেশিত হলো। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'চিঙ্গিজান বাদশা' কাহিনীতে বাদশার পুত্র ফালিদ বাদশার হবু স্ত্রী হরবোলা কন্যার সাজসজ্জার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা এরকম : বেসরের ঝাঁপি খুলে আবের কাংখই বের করা হলো। মুখে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে প্রসাদনের সাহায্যে চুল গোটা গোটা করা হলো। অতপর খোঁপা বাঁধার পালা; স্টাইলের নাম বেহার। এ স্টাইলে বাঁধা খোঁপায় নয়টি কেওয়ার অর্থাৎ দরজা মতো সজ্জা থাকে। অতপর হিয়া নামক শাড়ী পরিধান করে হাতে কাঁকন, গলায় হাসুলি, পায়ে সোনালী ঘুংঘুর, কপালে সিঁদুর সবশেষে মুখে পান দিয়ে তার সাজ-সজ্জা শেষ হলো।[১]

বিয়েকে ঘিরে নানা রকম প্রথার প্রচলন ছিলো। 'ফিরা নাইয়র' অর্থাৎ বিয়ে করে বউকে স্বামীর বাড়িতে আনার নির্দিষ্ট দিন পর স্ত্রীসহ বাপের বাড়িতে যাওয়ার প্রথা ছিলো। 'ফিরা নাইয়র'কে একটি কাহিনীতে বলা হয়েছে 'আটমঙ্গলা'। বাংলা একাডেমীর *লোক সাহিত্য সংকলন-৮*-এর 'জোলার কিস্‌সা'য় জানা যায় জোলা বিয়ের আটদিন শ্বশুর বাড়িতে 'আটমঙ্গলা'য় এসেছে। অবশ্য বাঙালির বিয়ে কেন্দ্রিক আচার প্রথার যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন ওয়াকিল আহমদ তার *বাংলার লোকসংস্কৃতি* গ্রন্থে সেই বৈচিত্রের সন্ধান লোককাহিনীতে পাওয়া যায় না।

বিয়েতে যৌতুক দেয়া নেয়ার প্রথা ছিলো। এক্ষেত্রে কন্যাপণ ও বরপণ দুটোই প্রচলিত ছিলো। *বাংলাদেশের কিংবদন্তী* গ্রন্থের 'চলন বিলের মহর' কাহিনীতে দেখা যায় জনৈক ব্রাহ্মণ তার কন্যার বিয়ে দিতে পারছে না পণের টাকা জোগাড় হয়নি বলে। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* প্রথম খণ্ডের 'বারবানীর ঘরের তেরবাণী-তেরবাণীর ঘরের

[১] উদ্ধৃতিটি সংশ্লিষ্ট কাহিনীর একটি গানের গবেষক-কৃত গদ্যরূপ, পৃ-৮৫-৮৬।

নগরবাণী' কাহিনীতে জানা যায় Dhaka University Institutional Repository কিছু নগদ টেহা ভালমানুষী করলো" (পৃ-৯০)। একই গ্রন্থের 'জুতা দেইখ্যা কুত্তা যায়' কাহিনীতে দেখা যায় "বর কৈন্যা লইয়া বাড়ির পথে রওয়ানা হইবে। বাপের বাড়ির উপহারে কৈন্যার পালকি ভরিয়া গিয়াছে। পালকিতে কোন রকমে কৈন্যার বসার ঠাঁই হইল।" (পৃ-৮২)।

কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী'র দ্বিতীয় খণ্ডের 'সোনাফর বাদশাহ' কাহিনীতে উজির সোনাফরের বিয়ের কথা পাকা করে এসে বাদশাকে বলে, "বিয়ে তো এক রকম ঠিক করিয়াই আসিয়াছি। তাম্বুলা শহরের বাদশার মেয়ে অতুলা সুন্দরী। কিন্তু বাদশার এক শর্ত আছে। এক পাল্লায় কন্যাকে বসাইয়া আরেক পাল্লায় তাহারা লাল মাপিয়া লইবে" (পৃ-১১২)।

এসব দৃষ্টান্ত থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় বাঙালির বিয়েতে তখন যৌতুক-প্রথা প্রচলিত ছিলো। সাধারণ কৃষিজীবি থেকে শুরু করে রাজা-বাদশারাও পণ দেয়া নেয়া করতো। পাত্র ও কন্যা পক্ষের সহায়-সম্পদ, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদির বিবেচনায় কখনো কন্যাপক্ষকে, কখনো বরপক্ষকে পণ দিতে হতো। বাংলা লোককাহিনীতে বর পক্ষকে যৌতুক দেয়ার দৃষ্টান্তই বেশি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালি সমাজে যে বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিলো সে সম্পর্কে এক রকম নিশ্চিত হওয়া যায়। *ঢাকার লোককাহিনীর* 'চূড়ামণির কিস্‌সা'র পঞ্চম খণ্ডে দেখা যায় রাজা তার পুত্রকে বলছে, "তোমাকে অমুক দেশের রাজকন্যার সাথে ছোটোকালেই বিয়া করাইছি। লোক-লস্কর লইয়া শ্বশুরবাড়ি যাও, বেড়াইয়া আস।" (পৃ-৬৫)

'চূড়ামণির কিস্‌সা'র সপ্তম খণ্ডের রাজপুত্র ও উজিরপুত্র উভয়েই বাল্যবিবাহে আবদ্ধ (পৃ-৭৭)। বাল্য বিবাহের প্রথাটি কিছু দিন পূর্বেও বাঙালি সমাজে প্রচলিত ছিলো।

বহু বিবাহ সম্পর্কে লোককাহিনীতে প্রাপ্ত তথ্য ইতাহাসের তথ্যের বিরোধিতা করে। প্রাচীন বাঙালি সমাজে বহু বিবাহ সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন "একটি মাত্র স্ত্রী গ্রহণই ছিল সেখানকার সাধারণ নিয়ম। অবশ্য রাজা রাজড়া, সামন্ত মহাসামন্ত, অভিজাত সমাজ এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল"।[১] কিন্তু বাংলা লোককাহিনীতে আমারা ভিন্ন চিত্র পাই।

লোকসাহিত্য সংকলন ৩০ খণ্ডের 'শিয়াইল্যা ও এক মাতারীর কিসসা'য় জানা যায়, "পাতি হালের আরেক বিয়া আছিল। হেই ঘরে একটা ছাও আছিল" (পৃ-৭৯)। *লোক সাহিত্য সংকলন ৪২*-এর 'বকরাজার হাস্তোর' কাহিনীতে দরিদ্র রাখাল বালক মনি দুই স্ত্রী গ্রহণ করে সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কর্তৃক সম্পাদিত *যশোহরের লোককাহিনী*-এর 'চারটে জ্ঞানের কথা'তে দেখা যায় গরুর গাড়ি চালক ছোট ভাই দুই স্ত্রী গ্রহণ করে। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* প্রথম খণ্ডের 'এড়ী ও সোহাগী' কাহিনীর চাষীর দুই স্ত্রী। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডে 'টেডন ও পরধ্যানা' , *বাংলাদেশের লোককাহিনী* প্রথম খণ্ডে 'বুড়ীর পুত', *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডে 'টগ ও শেয়ান' প্রভৃতি কাহিনীতে দেখা যায় পুরুষরা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছে। রাজা বাদশাদের তো একাধিক স্ত্রী গ্রহণই ছিলো রেওয়াজ। উপরোক্ত তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের পিতৃতান্ত্রিক বাঙালি সমাজের পুরুষরা তাদের সুবিধা অনুযায়ী বহু বিবাহের প্রথা প্রতিষ্ঠিত করে, যার প্রভাব অদ্যাবধি আমাদের নিরক্ষর সমাজে ক্রিয়াশীল।

লোককাহিনীতে দাম্পত্য প্রণয়ের দু'চারটি চিত্রও পাওয়া যায় যায়। সেকালে সচরাচর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আন্তরিক প্রেমের সম্পর্কই বিরাজ করতো। সচরাচর স্ত্রীরা স্বামীর অনুগত থাকতো। এমন নজিরও দেখা যায় যেখানে স্ত্রী স্বামীর সুখকেই নিজের সুখ বলে মনে করে। *বাংলাদেশের কিংবদন্তীর* 'নিশিথে বাঁশরী বাজে' কাহিনীর নায়িকা জোবেদা সেই ধরনের স্ত্রীর উদাহরণ। দেওয়ান গোলাম মোর্তজা সম্পাদিত *গৈ-গেরামের গল্পের আসর*-এর ১৪ নম্বর প্রস্তাবে স্বামী-স্ত্রীর প্রেমময় সম্পর্কের এক বিরল দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। সে কাহিনীতে স্ত্রীর মৃত্যু শয্যায় দাঁড়িয়ে স্বামী তার পুরুষাঙ্গ কর্তন করে প্রতিজ্ঞা করে যে, সে দ্বিতীয় বিবাহ করবে না।

---

[১] ড: নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, সুভাষ মুখোপাধ্যায়-কৃত সংক্ষেপিত সংস্করণ, পূর্বোক্ত, প-১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

ভাটিদেশের কিংবদন্তী'র কালাগাজীর বিল কাহিনীতে দেখা যায় নির্বাসিত কালাগাজী ও তার স্ত্রী এক নির্জন অঞ্চলে সুখের সংসার গড়ে তুলেছে। *যশোরের লোককাহিনীর* 'চারটে জ্ঞানের কথা'য় আমরা জানতে পারি দরিদ্র গরুর গাড়ি চালক ধনী হওয়ার পর দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেও তার প্রথম স্ত্রীর প্রতি গভীর প্রেম পোষণ করে।

লোক সাহিত্য সংকলন-৪২-এর 'বক রাজার হাস্তোর' কাহিনীতে দরিদ্র রাখাল বালক মনি ও তার স্ত্রী সিদুর কন্যার মধ্যে গভীর প্রণয়ের সম্পর্ক বিবৃত হয়েছে।

বাঙালী সমাজে সচরাচর স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক ছিলো। তবে জোলার কাহিনীগুলোতে জোলার বোকামীর জন্য তাদের স্ত্রীরা স্বামীর উপর বিরক্ত ছিলো এবং আচার আচরণেও সেই বিরক্তি প্রকাশ করতো।

বাঙালি সমাজের কাহিনীগুলো সচরাচর দাম্পত্য প্রণয়ের পক্ষে তথ্য দিলেও এমন কিছু কাহিনী আমরা পাই যেখানে স্ত্রী পরপুরুষে আসক্ত হয়ে স্বামীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমনকি হত্যা করে অন্য পুরুষের সাথে ঘর বাঁধে। এ বিষয়টি বাঙালির নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে। এ সম্পর্কে আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

স্ত্রী-পুরুষ সর্ম্পক ও বাঙালির নৈতিকতা

"আমি জানি কেবল ঘুড্ডি বানাইতে। যদি সৎ মা'র সৎ পুত অয় ত অইলে আমার ঘুড্ডি মানুষ অইয়া আসপানে উইড়া যাইতে পারে।"

উদ্ধৃতিটিতে সতীত্ব সম্পর্কে যে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তা নারীর সতীত্ব সম্পর্কে বাংলা লোককাহিনীর চরিত্রসমূহের সাধারণ মনোভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে । লোককাহিনীতে সর্বত্রই নারীর সতীত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সতীত্ব পরীক্ষা প্রচলিত ছিলো বলেও জানা যায়। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয়খণ্ডের 'সোনাফর বাদশা' কাহিনীতে সোনাফরের স্ত্রী অতুলাকে সতী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। পরীক্ষার মন্ত্র উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে অতুলা তুলা হয়ে আকাশে উড়তে থাকে।। 'সতী নারীর কিস্‌সা'য় দেখা যায় নাজিরের স্ত্রী তার স্বামীকে বলছে, "এই নাও তোমার গায়ের জামা--যতদিন আমি সতী থাকিব ততদিন এই জামা ময়লা হইবে না--আর জামা ময়লা হইলে বুঝিবে আমার সতীত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"[১] অনেক কাহিনী আছে যেখানে অপহৃত নারী তার অপহরণকারী রাক্ষস বা সওদাগরকে ১২ বছরের জন্য ধর্মের পিতা বানিয়ে সতীত্ব রক্ষার চেষ্টা করছে।

অন্যদিকে, প্রচুর সংখ্যক লোককাহিনীতে ব্যভিচার, বহুগামিতা, বিবাহোত্তর অবৈধ সম্পর্ক ইত্যাদি অতি সাধারণ বিষয় হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। *পূর্ব-পাকিস্তানের লোককাহিনীর* 'শ্বশুরালয়ের সন্ধানে' কাহিনীতে দেখা যায় বেকার যুবক রহিম ঘটনাক্রমে উজিরের সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত রাজকন্যাকে সম্ভোগ করে, পরে উজিরের স্ত্রীর সাথেও রাত্রি যাপন করে। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* প্রথম খণ্ডের, 'বারবাণীর ঘরের তেরবাণী- তেরবাণীর ঘরের নগরবাণী ' কাহিনীতে আমরা এমন এক নারীর সন্ধান পাই যে স্বামীর চোখের সামনে অন্য পুরুষের সাথে প্রেম করার বিষয়টি কৃতিত্ব বিবেচনা করে। (পৃ-৯০)।

বাংলাদেশের লোককাহিনী প্রথম খণ্ডে, 'আপন কথা কইতে লাজ' কাহিনীতে আমরা এক কিশোরের অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারি তার মা, মাসী এবং শহরের কাজীর স্ত্রী প্রত্যেকেই পরকিয়া প্রেমে আসক্ত। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনীর* প্রথম খণ্ডের 'কেনান বাদশা', দ্বিতীয়খণ্ডের 'তিলিসমাৎ খাঁ', *বাংলাদেশের লোককাহিনীর* প্রথম খণ্ডের " যেমন গাঁইর তেমন ভুতি', 'জাতে জাতে মিলে', বাংলা *একাডেমীর ফোকলোর সংকলন*-৭১ -এ 'মামু-মামীর কিস্‌সা', ও 'সওদাগর আর তার বউয়ের কিস্‌সা' প্রভৃতি কাহিনী ব্যভিচার সম্পর্কিত বহু লোককাহিনীর কয়েকটি মাত্র। কিছু কাহিনীতে দেখা যায় পরকিয়া প্রেম মেয়েদের মধ্যে এতটাই তীব্র আবেগের সৃষ্টি করতো যে, তারা স্বামীকে হত্যা করে হলেও প্রেমিকের সাথে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করতো। এ ধরনের কাহিনীগুলোর মধ্যে *লোকসাহিত্য সংকলন* -৩০ খণ্ডের 'পাতি শিয়ালের

---

[১] *বাংলাদেশের লোককাহিনী* প্রথম খণ্ড, পর্বোক্ত, প-১৪২।

Chittagong University Institutional Repository

কিস্তা', *ঢাকার লোককাহিনীর* 'চূড়ামণির কিস্‌সা' এবং *বাংলাদেশের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'অকুল বকুল'-এর অষ্টসিদ্ধ রাজার কাহিনীর কথা উল্লেখ করা যায়।

লোককাহিনীতে এক দিকে সতীত্বের মহত্ব বর্ণনা, আরেক দিকে ব্যভিচারের কাহিনীর ছড়াছড়ির কারণে বাঙালির বিবাহিত জীবন ও যৌনতা-কেন্দ্রিক নৈতিকতা বিষয়ে একটি সংঘাত লক্ষ্য করা যায়।

তবে ব্যভিচার সম্পর্কিত কাহিনীগুলোর কোন কোনটিতে দেখা যায় ব্যভিচারকে সামাজিকভাবে গর্হিত বলে প্রচার করা হয়েছে এবং ব্যভিচারের কঠিন শাস্তির বিধান আছে।

তা সত্ত্বেও এমন বহু বাংলা লোককাহিনী পাওয়া যায় যেখানে মন্ত্রীর সাথে রানীর বা ফকিরের সাথে মোড়লের স্ত্রীর কিংবা এক চাষীর স্ত্রীর সাথে অন্য চাষীর স্ত্রীর শারীরিক সম্পর্কের কথা গৌণ কাহিনী হিসেবে হাস্য-মধুর ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। অবৈধ সম্পর্কের হাস্যকর দিক নিয়ে সৃষ্ট হাস্যরসাত্মক কাহিনীও পাওয়া যায়। এসব কাহিনীতে কাহিনী বর্ণনাই মূল লক্ষ্য। অবৈধ সম্পর্কের পরিণতি অর্থাৎ শাস্তির বিষয়টি সেখানে অনুপস্থিত। ফলে কাহিনীগুলো পড়লে মনে হয় কথক এবং শ্রোতারা অবৈধ সম্পর্কের বর্ণনাই উপভোগের বিষয় হিসেবে নিয়েছে। কিন্তু এর আগে উল্লেখ করেছি যে, অবৈধ দৈহিক সম্পর্কের কারণে শাস্তি বিধানের বিষয়কে কেন্দ্র করেও কিছু কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে। যেমন *ঢাকার লোককাহিনীর* 'চূড়ামণির কিস্‌সা'র সপ্তম খণ্ড, *বাংলাদেশের লোককাহিনী* দ্বিতীয়খণ্ডের 'অকুল বকুলের' অষ্টসিদ্ধ রাজার কাহিনী।

উপরে আলোচনায় বাঙালির নৈতিকতা সম্পর্কে আমরা যে দ্বিবিধ তথ্য পাচ্ছি তা ব্যাখ্যা করা যায় এভাবে : বাঙালী সমাজে প্রচলিত সামাজিক রীতির বাইরে অর্থাৎ বিয়ে ছাড়া অন্যবিধ শারীরিক সম্পর্ক একদিকে নিন্দিত হয়েছে। অন্যদিকে, সমাজে এ ধরনের সম্পর্ক সাধারণ ব্যাপার ছিলো এবং অনেকে তার কাহিনী উপভোগও করতো। তৎকালীন বাঙালি সমাজে এ দ্বিবিধ প্রবণতাই চিহ্নিত করা যায়। এ থেকে আমরা আন্দাজ করতে পারি : (১) নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাঙালির নৈতিক আদর্শ নারী-পুরুষের বিবাহ-জনিত সম্পর্ক অনুমোদন করতো। (২) নৈতিক আদর্শ ছিলো নারীর একগামিতার পক্ষে। কিন্তু পুরুষের যৌনতা বিষয়ে কোন নৈতিক দায়ের গুরুত্ব দেয়া হতো নাস্বীকার করা হতো না। (৩) বাঙালির নৈতিক দায় মুখে মুখে যতটা গুরুত্ব পেতো লোক চক্ষুর আড়ালে তার ততটা মূল্য ছিলো না। এ জন্যই বাংলা লোককাহিনীর একদিকে সতীত্বের মহত্ব বর্ণনা আরেকদিকে, সমাজগর্হিত যৌন-সম্পর্কে ছড়াছড়ি।

পরিবার ও আত্মীয় স্বজন

অনেকে মনে করেন এদেশে অতি প্রাচীন কালে, আর্যদের আগমণের পূর্বে, পরিবারগুলো ছিলো মাতৃতান্ত্রিক। মা ছিলেন পরিবারের কর্ত্রী। মাকে ঘিরে স্বামী, ছেলে-মেয়ে নিয়ে একটি পরিবার গড়ে উঠতো। বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চলের পাহাড়ী এলাকার অনেক উপজাতির মধ্যে এখনো কিছু কিছু পরিবারে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের অস্তিত্ব আছে। এক শ' বছর আগেও এদের সমাজে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো।[১]

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ তার গবেষণায় বাংলা ছড়ায় প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী মামার বাড়িতে ছেলে মেয়েদের সহজ পদচারণা ও অধিকার প্রয়োগের বিষয়টিকে প্রাক-আর্য কালের মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের স্মৃতি-চিহ্ন বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

লোককাহিনীতেও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থার কিছু পরোক্ষ স্মৃতিচিহ্ন পাওয়া যায়। *লোকসাহিত্য সংকলন*-৩০ খণ্ডে 'শিয়ানো ও শিয়াননীর কিস্‌সা'য় আমরা দেখি এক শেয়ালনী তার সঙ্গী শেয়ালের মৃত্যুর পর কাউকে বিয়ে করতে রাজী

[১] আব্দুস সাত্তার, *গারোদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ-৩৭।

[২] সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *ছড়ায় বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮, পৃ-১৪৩-৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

হয় না। তার দাবী তাকে বিয়ে করার মতো বুদ্ধি সম্পন্ন শেয়াল তার সমাজে নেই। শেষ পর্যন্ত এক শেয়াল মিথ্যা বলে তাকে বিয়ে করে। কয়েক মাস পর এক বিপদ উপস্থিত হলে দেখা যায় সেই শেয়ালের বুদ্ধি বা সাহস কোনটাই নেই। শিয়ালনী বুদ্ধি খরচ করে বাচ্চা-কাচা, শেয়াল ও নিজের জীবন রক্ষা করে (পৃ ৮৪-৮৬)। বিয়ের ব্যাপারে স্বাধীনচেতা মনোভাব, বাসস্থান নির্ধারণ ও জীবিকা নির্বাহ, আপদ-বিপদ সামাল দেওয়া প্রভৃতি অতি গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে শিয়ালনীর প্রধান ভুমিকা থেকে শেয়াল পরিবারটিকে একটি মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলেই মনে হয়। পশুপাখির কাহিনী অতি প্রাচীনকালের সৃষ্টি। বাঙালি সমাজে যে সময়ে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো বলে ধারনা করা হয় পশুপাখির কাহিনীগুলো হয়তো তার সমসাময়িক। তাই শেয়াল পরিবারের কাহিনী নির্মিতিতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অভিজ্ঞতার ছাপই পড়ে থাকবে।

দু'একটি লোককাহিনী ছাড়া মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের চিহ্ন পাওয়া যায় না। সম্ভবত যে সময় বাংলাদেশে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের বিকাশ ঘটেছিল সে আমলে খুব বেশি লেককাহিনী সৃষ্টি হয়নি। গোত্র-সমাজ ও স্বয়ং-নির্ভর গ্রাম-সমাজ ব্যবস্থা বিকশিত হওয়ার প্রথম পর্যায়ে, যখন রাজা-রাজ্য-রাজনীতি, যুদ্ধবিগ্রহ ছিলো না, শুধু জীবিকা নির্বাহই প্রধান ব্যাপার ছিলো, হয়তো তখন মাতৃ-তান্ত্রিক পরিবার বিকশিত হয়ে থাকবে। তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।

যদি ধরে নেয়া যায় এদেশে সভ্যতার প্রথম পর্যায়ে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রচলিত ছিলো তাহলে আন্দাজ করা যায় সে সময় যে দু'একটি কাহিনী জন্ম নিয়ে থাকবে পরবর্তীতে তা পুরুষ-শাসিত সমাজের কথকদের ইচ্ছায় মাতৃ-প্রধান পরিবার ব্যবস্থার চিহ্ন বর্জন করেছে। বিগত দুই হাজার বছরের ইতিহাসে দেখা যায় বাংলাদেশে পুরুষরা সমাজের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করে আছে। রাজ্য শাসন, মন্ত্রীত্ব, সেনাপতিত্ব- সর্বক্ষেত্রেই তাদের প্রাধান্য। তার প্রভাবেই হোক বা অন্য কোন উপায়ে হোক উপরোক্ত সময়-পরিসরে বাঙালি সমাজের পরিবারগুলোও পিতৃ-প্রধান ছিলো।

সে আমলের বাঙালি সমাজে পিতা ছিলো পরিবারের প্রধান। তবে আয় উৎপাদনে মেয়েরাও সমান অংশ গ্রহণ করতো। অনেক কাহিনীতে দেখা যায় মেয়েরা ধান মাড়াই, ধানের চারা রোপণ, ঘর তৈরি প্রভৃতি কঠিন কাজে অংশ গ্রহণ করছে। (দ্রঃ *লোকসাহিত্য সংকলন*- ষষ্ঠ খণ্ড, বাংলা একাডেমী)।

পরিবারগুলো একান্নভুক্ত ছিলো। ডক্টর মযহারুল ইসলামের *পূর্ব-পাকিস্তানী লোককাহিনীর* 'বানর বাদশা' কাহিনী থেকে জানা যায় বানর বাদশারা অনেক ভাই মিলে একত্রে বাস করে। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'তুলাল বাশ্‌শা', *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'চারিরতন'-এর চারভাই ও 'মদন সাধু' কাহিনীর হারমাদরা সাতভাই, *ঢাকার লোককাহিনীর* চুড়ামনির কিস্‌সা'র সওদাগর পরিবারের সাতভাই একসাথেই বসবাস করে। এ ছাড়াও অনেক কাহিনী আছে যাতে একান্নবর্তী পরিবারের উল্লেখ আছে। এসব পরিবারে পিতার ভূমিকাই প্রধান ছিলো। মায়ের তেমন গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায় না।

সচরাচর পরিবারের সবাই মিলে মিশে বাস করতো। চিরকালের বাঙালি পরিবারের মতই মায়ের সাথে সন্তানদের ছিলো সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও মধুর সম্পর্ক। সমস্ত আদর-আবদার মাকে ঘিরেই রচিত হতো। সন্তানের বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে মায়ের শোকাহত হৃদয়ের আর্তি লক্ষ্য করা যায় 'রাজকুমার সফরচান ও সোবুজ নিশাপরীর কিস্‌সায়'। সফরচান পরী কন্যাকে পাওয়ার জন্য অজানা পথে যাত্রা করার প্রাক্কালে মায়ের কাছ থেকে যখন বিদায় নিতে যায় তখন;

আসমান ভাংগিয়া যেন মায়ের মুণ্ডেতে পরিলো। মায় তহন দুই চোক্ষের পানি ছাইড়া দিয়া কাইন্দা ভাসাইয়া ফালাইলো। পোলারে হাইপটা কোলে লইয়া খোদার নিকট দোয়া করণ শুরু করলো। পোলারে কোলে লইয়া কাইন্দা কাইটা মনের দু:খ নিবারণ কইরা পোলারে কোলে থেইকা নামাইয়া দিয়া মায় একটা গীত গায়"।[১]

এ রকম শোকবিহ্বল মায়ের প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠে *বাংলাদেশের লোককাহিনী* তৃতীয় খণ্ডের 'আলম সদাগর' কাহিনীতে আলম সওদাগরের বানিজ্য যাত্রার প্রাক্কালে ।

---

[১] রাজকমার সফর চান ও সোবুজ নিশাপরীর কিসসা' *ঢাকার লোককাহিনী*. পর্বোক্ত. প-৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

বাপ-মা-ভাই-বোনের সংসারে শুধু পুত্রের চিত্রই পাওয়া যায়। কোন কোন কাহিনীতে দেখা যায় একান্নবর্তী পরিবারে অন্য ভাইয়েরা মিলে সবচেয়ে ছোট ভাইটিকে বনে নির্বাসন দিয়ে এসেছে (তুলাল বাশ্‌শা)। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'টেটনা বিটলা ও বেক্কল'-এর কাহিনীতে দেখা যায় বড় ভাই ছোট ভাইকে ঠকাচ্ছে (পৃ-২১১)। তবে এসব কাহিনী ব্যতিক্রম বলেই গণ্য হতে পারে। মোটের উপর বাঙালির মা-বাবা ভাইবোনের মিলিত সংসারে আন্তরিকতার অভাব ছিলো বলে মনে হয় না।

বাংলা লোককাহিনীতে ননদ ভাবীর সম্পর্ক কখনো মধুর, কখনো তিক্ত বলে দেখা যায়। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'মদন সাধু' কাহিনীতে মদনের স্ত্রীর প্রতি তার ননদ ককুয়ার বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্র, *বাংলাদেশের লোককাহিনী* তৃতীয় খণ্ডের 'সাত ভাইয়ের বোন টোপা' কাহিনীতে ছয় ভাবী কর্তৃক টোপাকে হত্যার প্রচেষ্টা ঘটনা ননদ-ভাবীর সাপে নেউলে সম্পর্ক চিত্রিত করেছে। বোঝা যায় বাঙালি সমাজে ননদ-ভাবী সম্পর্কটি টানাপোড়েনের সম্পর্ক ছিলো।

অনেক কাহিনীতে শ্বাশুড়ী-পুত্রবধু সম্পর্ক ভালো বলেই চিত্রিত হয়েছে। যেমন পূর্বোক্ত সংকলনের 'আলম সদাগর'-এ আলমের বোন যখন তার ভাবীকে খুন করতে নিয়ে যায় তখন তার অক্ষম শ্বাশুরী শুধু দোয়া করে:

আগুনে না যাইয়ো পোড়া পানিত না হয় তল।
চান্দ্র-সুর্য মইলে গো বাঁইচ্যো বেইলের আড়াইপর;[১]

অন্যদিকে, এর বিপরীত চিত্রও পাওয়া যায়। *বাংলাদেশের লোকাহিনী*, প্রথম খণ্ডে 'উপতির মইধ্যে গুণ্ডি'-তে দেখা যায় শ্বাশুরী বউদের দিয়ে বেশি কাজ করায়, কম খেতে দেয়। *লোক সাহিত্য সংকলন* ষষ্ঠ খণ্ডে চট্টগ্রামের শোলোকী কিস্‌সায় দেখা যায় পুত্রবধুরাই বৃদ্ধা শ্বাশুরীদের অত্যাচার করে। তবে বাংলা লোককহিনীতে শ্বাশুরী পুত্র-বধুর সম্পর্কটিতে তিক্ততার চেয়ে মিলনের স্বাক্ষ্যই বেশি।

পরিবারে নানী/দাদীর সাথে নাতি-নাতনীদের মধুর সম্পর্ক ছিলো। ছেলে মেয়েদের ন্যায়-অন্যায় আবদার পুরণের আশ্রয়স্থল ছিলো দাদী/নানী। *বাংলাদেশের লোককাহিনী*, তৃতীয় খণ্ডে 'রূপের মনোহর' কাহিনীতে রূপবাহার তার দাদীর মাধ্যমেই রূপ মনোহরকে পেতে সক্ষম হয় (পৃ-৪২)।

পরিবারের নিজস্ব গন্ডির বাইরের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে মাসী সম্পর্কটি খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলো বলে মনে হয়। বহু গল্পে মালিনীকে মাসী ডেকে উদ্দেশ্য পুরনের কৌশলটির ছড়াছড়ি দেখে বোঝা যায় মাসীর বাড়ির স্থান ছিলো নিজের বাড়ির পরেই। মাসী ছাড়া রক্তের সম্পর্কের মধ্যে মামার বাড়ির কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। বোন জামাইদের সাক্ষাত কদাচিত পাওয়া যায়।

রক্তের সম্পর্কের বাইরে দোস্ত ছিলো সব থেকে ঘনিষ্ঠ। *ঢাকার লোককাহিনীর* 'রাজকুমার সফর চান ও সোবুজ নিশাপরীর কিস্‌সা'য় সফরচান পরী কন্যার সন্ধানে যাত্রা করলে তার দোস্ত সায়েদ তার সঙ্গী হয়ে যে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে তা স্বার্থহীন সম্পর্কের অতুল নিদর্শন (পৃ-৮৫-১২৫)। পূর্বোক্ত সংকলনের 'চুড়ামণির কিস্‌সা'র সপ্তম খণ্ডে দেখি মৃত দোস্তকে বাঁচিয়ে তোলার অসম্ভব চেষ্টায় উজির পুত্র রাজপুত্রের লাশ কাঁধে করে তা শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় (পৃ-৭৮-৭৯)।

দোস্তী সম্পর্কের মধ্যেও প্রচন্ড স্বার্থপরতা ও অমানবিক নিষ্ঠুরতার উদাহরণ আছে। *ঢাকার লোককাহিনীর* 'চূড়ামণির কিস্‌সা'র পঞ্চম খণ্ডে উজির পুত্র ও রাজপুত্র দেহ বদলের মন্ত্র শেখার পর উজির পুত্র কৌশলে তার দোস্তকে তোতা বানিয়ে নিজে রাজপুত্রের শরীর প্রবেশ করে বন্ধুর স্ত্রীকে ভোগ করতে উদ্যত হয় (পৃ-৬৬)। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* তৃতীয় খণ্ডের 'আলম সদাগর'-এ বন্ধুর ষড়যন্ত্রেই আলম সওদাগর বানিজ্য যাত্রা করতে বাধ্য হয় এবং সেখানে অনেক দুঃখ-যন্ত্রণার সম্মুখীন হয়। তবে দোস্তী সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা যায় স্বার্থের চেয়ে স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্তই অধিক।

---

[১] আলম সদাগর, *বাংলাদেশের লোককাহিনী* তৃতীয় খণ্ড, পর্বোক্ত, প-১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান

বাংলা লোককাহিনীতে বাঙালির সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান, আচার-প্রথার বিবরণ তুলনামূলকভাবে কম। ওয়াকিল আহমদ তাঁর *বাংলার লোকসংস্কৃতি* গ্রন্থে বাঙালির সামাজিক উৎসব ও আচার-প্রথার এক সমৃদ্ধ জগত তুলে ধরেছেন। লোককাহিনীতে সে বৈচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না।

কোন কোন লোককাহিনীতে আমরা কিছু সামাজিক উৎসবের কথা জানতে পারি। হোসেন উদ্দিন হোসেনের *যশোর জেলার কিংবদন্তী* দ্বিতীয় পর্বে 'রাজনটী সমাচার' কাহিনীতে জানা যায় প্রতি বৎসর নবদ্বীপে এক বিরাট মেলা বসতো। সেখানে প্রচুর লোক সমাগম হতো। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'অকুল বকুল'-এ 'চৈত-মাস্যা বান্নী' নামে একটি মেলার বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রতি বছর চৈত্র মাসে সেই মেলা অনুষ্ঠিত হতো রাজধানীর নিকটেই। তাতে প্রচুর নারী পুরুষ আসতো। দূরদুরান্ত থেকেও অনেক ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ এসে মেলায় যোগ দিতো। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'সোনাফর বাদশা' কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে, "প্রতি বছর পরীস্থানে একটা উৎসব হয়। তখন সেখানে গান বাজনা ও নাচ গানের একটা জোয়ার বহিতে থাকে" (পৃ-১৪২)। ধারনা করা যায় কথক নিজের সমাজে অনুষ্ঠিত এ রকম উৎসবের অভিজ্ঞতা থেকেই পরীস্থানের নাচ গানের উৎসবের কল্পনা করেছেন।

যশোরের লোককাহিনী দ্বিতীয় পর্বের 'তুলসীরামের ইতিকথা'য় ফসল বোনার একটি উৎসবের উল্লেখ আছে। জানা যায় তখন সে অঞ্চলের অধিবাসীরা বৈশাখ মাসে ফসল বোনার সময় একটি সামাজিক উৎসবের আয়োজন করতো। সে উৎসবে ছেলে মেয়ে সবাই আনন্দ যাত্রার মধ্য দিয়ে নেচে গেয়ে ফূর্তি করে ফসল বোনার ঋতুকে স্বাগত জানাতো। (পৃ-৭০)।

বিভিন্ন আচারের মধ্যে হাইট্যারা ও ছড়ির কথা জানা যায়। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'মতিলাল বাশ্‌শা' কাহিনীতে 'ছড়ি' (ষষ্ঠী) করার উল্লেখ আছে। সেখানে ষষ্ঠী সন্তানের জন্মের পর ৬ষ্ঠ দিনের পরিবর্তে আঠারো মাসে পালিত হতো বলে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃ-৮২)।

নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান

এ দেশে আর্যদের পূর্বে অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর কৃষিজীবি সমাজে মাতৃ-প্রধান পরিবার বিকশিত হওয়ার সামান্য চিহ্ন আমরা পেয়েছি। কিন্তু লোককাহিনীর সাক্ষ্য অনুযায়ী মনে হয় বাঙালি সমাজে প্রাচীন ও মধ্য যুগে নারীর অবস্থান খুবই গুরুত্বহীন ছিলো। নগরে রাজা-উজির-সওদাগর বণিকদের সমাজে নারী হয়ে উঠেছিলো অনেকটা গৃহকর্মী ও ভোগের সামগ্রীর মতো। নারীর সৌন্দর্য ও শরীর তাদের স্ফুর্তির অন্যতম উৎস হওয়ায় সুন্দরী নারীর মর্যাদা ছিলো। অনেক কাহিনীতে আমরা দেখি রাজা-উজির-সওদাগররা সুযোগ পেলেই সুন্দরী নারীকে ছলে বলে নিষ্ঠুর পন্থায় হরণ করে নিয়ে গিয়ে ভোগের সামগ্রী বানায়।

লোক-সাহিত্য সংকলন দ্বিতীয় খণ্ডের 'ধার্মিক রাজার কিস্‌সা'য় জানা যায় বাদশার একাকী স্ত্রীকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলো এক সওদাগর। কারণ রাজার স্ত্রী অতিশয় সুন্দরী ছিলেন। মুহম্মদ মনসুর উদ্দিনের *শিরনী* গ্রন্থের 'শিরনী' কাহিনীতে আমরা দেখি জনৈক বাদশার স্ত্রীকে এক সওদাগর জোর করে নিয়ে যাচ্ছে। সুন্দরী রমনী নিয়ে রাজা-উজির-সওদারগদের দুর্বৃত্তপনা, সংঘাত, হানাহানি, ষড়যন্ত্র প্রমাণ করে নারীকে উচ্চ শ্রেনীর অনেকেই ভোগের দৃষ্টিতে

Dhaka University Institutional Repository

দেখতো। ছলেবলে হরণ করে নিয়ে আসতে পারলেই সেই নারীর মালিকানা পাওয়া যাবে---এমন ধারণাই গড়ে উঠেছিলো তখন।

নারীর পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান যে একেবারেই গুরুত্ব হারিয়েছিলো এমন নয়। অনেক লোককাহিনীতে দেখা যায় পতিব্রতা স্ত্রী ও স্ত্রী-বিশ্বস্ত স্বামী মিলে সুখের সংসার গড়ে তুলেছে। স্বামীর দুঃখ কষ্টে, আপদে-বিপদে স্ত্রী ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তা সত্ত্বে পুরুষের সহকারী ও ভোগ্যা হিসাবেই নারীর মর্যাদা ও অবস্থান নির্ণিত হতো। কন্যা সন্তানকে সুনজরে দেখা হতো না। এমনকি পিতার কাছেও কন্যা সন্তানের গুরুত্ব পুত্র সন্তানের চেয়ে অনেক কম ছিলো।

কিশোরগঞ্জের লোককাহিনীর প্রথম খণ্ডের 'তাম্বুল তরাসিনী'তে এক সন্তানহীন রাজার কথা জানা যায়। তার একমাত্র দু:খ--সন্তানহীনতা। শেষে এক সিদ্ধ-পুরুষের দয়ায় তার সাত রানীর মধ্যে ছোটো রানী গর্ভবর্তী হয়। প্রসবক্ষণ ঘনিয়ে আসার পূর্বে রাজা শিকারে যাত্রা করে। যাওয়ার আগে নিদের্শ দিয়ে যায়:

"আমি শিকারে চললাম, ছোট রাণীর যদি পুত্র হয় তবে তো কোন কথাই নাই, আর যদি কন্যা হয় তবে তাহাকে কাটিয়া জঙ্গলে ফেলিয়া দিও।"[১]

দেখা যাচ্ছে সন্তানহীন রাজার একমাত্র কামনা হলো সন্তান, তবে কন্যা সন্তান নয় । এমনকি কন্যা সন্তানের চেয়ে নিঃসন্তান থাকাও তার কাছে শ্রেয় মনে হয়েছে বলেই আপন সন্তানকে হত্যা করার মতো অমানবিক কাজের আদেশ দেয়া সম্ভব হয়েছে। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* তৃতীয় খণ্ডের 'আলম সদাগর' কাহিনীতে আলম সওদাগরের মা নিজে নারী হয়েও পুত্রের জন্মের পুর্বে তার স্বামীকে বলে:

"দেহ সওদাগর, আমরার দিন ত বিফলে যাইতাছে। --- একটা বেডাপুত্র অইলে সংসারডার মালিক অইত।" (আলম সদাগর, *বাংলাদেশের লোকাহিনী* তৃতীয় খণ্ড, পৃ-৬৮)।

নারীর প্রতি পুরুষ-শাসিত সমাজের এই মনোভাব সত্ত্বেও কোন কোন প্রতিবাদী নারী তাদের অবস্থান সৃষ্টি করে নিয়েছিলো। তবে সেখানেও ছিলো সমাজ ও পরিবেশের বাধা, সমালোচনা ও ষড়যন্ত্র। *বাংলাদেশের লোককাহিনীর* প্রথম খণ্ডে 'পেচু মাতবর' কাহিনীতে দেখা যায় এক রাজার স্ত্রী নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মাধ্যমে রাজাকে প্রভাবিত করে রাজ্য শাসন করতো। তাই নিয়ে আশপাশ সমালোচনা মুখর। এক ঘটনাক্রমে পেঁচা মাতব্বরী করার সুযোগ পেয়ে বলে যে, "যে মাইয়া মাইনষের কথায় উডে বয় তারে পোষ্যা (পুরুষ) লোক ধরা যায় না।" (পৃ-৭০)। অতপর মানুষের ষড়যন্ত্রে বাদশাহ ক্ষিপ্ত হয়ে রানীর কর্তৃত্ব হরণ করেন।

পূর্বোক্ত সংকলনের 'লেবু চোর' কাহিনীতে এক চাষীর বউ স্বামীর অমতে কন্যাকে বিয়ে দেয়ায় স্বামী তার প্রতি প্রচন্ড ক্ষোভ নিয়ে স্বগত: উক্তি করে, "রাখ! তর মাগী পরধ্যান্যাগিরিডা (মহিলা নেতৃত্ব) ডাইল কইরা ছাড়বাম" (পৃ-৬৭)।

লোককাহিনীর এসব তথ্য থেকে আমরা ধরে নিতে পারি সে যুগে নারীর অবস্থান ছিলো পুরুষের গৃহের চার দেয়ালের মধ্যে---বড়জোর বাড়ির চৌহদ্দিতে। এর বাইরে নারীর কথা, বুদ্ধি, রুচির কোন মুল্য ছিলো না। সেই বিশাল পৃথিবীতে পুরুষের একচ্ছত্র আধিপত্য। গৃহেও পুরুষের মতামতই গুরুত্বপূর্ণ। সেখানেও পুরুষই রাজা, নারী কর্মী মাত্র।

পুরুষ তার অবস্থান টিকিয়ে রাখার জন্য 'নারী' ও 'পুরুষ'-এর মত আরো কিছু ধারনা প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। তার মধ্যে 'সতীত্ব' ও 'সেবা' উল্লেখযোগ্য। লোককাহিনীতে রাজা-বাদশারা নারী ও সুরায় ডুবে থাকে। সওদাগর-মহাজনরা বেশ্যালয় চালায়। কিন্তু তাদের স্ত্রীরা সতী কিনা এ প্রসঙ্গ এলে সতীত্ব বড় হয়ে উঠে। 'একতোলা কন্যার কিস্‌সা'য় দেখা যায় এক চাষীর ভবঘুরে পুত্র রাজাকে বলছে:

---

[১] 'তাম্বুল তরাসিনী', *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ড, পর্বোক্ত, প-২০।

Dhaka University Institutional Repository

"(আমি) কেবল ঘুড়িড বানাইতে জানি যদি আমার [illegible] অইলে আমার ঘুড়িড মানুষ অইয়া আসপানে উড়া যাইতে পারে।"[১]

এ কথা শোনে রাজা ভাবে তার রানী সতী কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

বাংলাদেশের লোককাহিনী দ্বিতীয় খণ্ডের 'অকুল বকুল' কাহিনীর একটি উপ-কাহিনীতে দেখি এক জমিদারের স্ত্রী জমিদারকে একটি জামা স্মারক চিহ্ন হিসাবে দিয়ে বলেছে, সে সতী বলে এই জামা কখনো ময়লা হবে না। *বাংলাদেশের কিংবদন্তী গ্রন্থের* 'নিশিথে বাঁশরী বাজে' কাহিনীতে দেখা যায় শের শাহ একবার বাংলাদেশের পাবনায় অবস্থানকালে এক ব্রাহ্মণের সুন্দরী কন্যার রূপে পাগল হয়ে তাকে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করেন। একদিন শের শাহ কথা প্রসঙ্গে নব-বিবাহিতা স্ত্রীর কাছে জানতে চান যে, ধর্মান্ততি করায় সে নাখোশ হয়েছে কিনা। জবাবে তার স্ত্রী পিতৃ-তান্ত্রিক সমাজের মনোভাব ব্যক্ত করে বলে, "নারী জাতির আলাদা কোন ধর্ম নেই। স্বামীর ধর্মই তার ধর্ম। আপনার কোন অন্যায় তো আমি দেখছি না জাঁহাপনা।" (পৃ-৪১)

নারীর এই অবস্থান ভেঙ্গে দিয়ে কোন কোন নারী লোককাহিনীর জগতে তাদের ব্যক্তিত্ব ও কর্মে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছে। যেমন *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনীর*, 'ফৈলন খাঁ ও হরণ গুনাই'-এর হরণ গুনাই শৌর্যে-বীর্যে, সততায় সাহসে পুরুষের অনুকরণীয় চরিত্র (পৃ-২৬-৩৩)। সে বীরের মত যুদ্ধ করে স্বামীর শত্রুদের ধ্বংস করে। পূর্বোক্ত সংকলনের 'চিঙ্গিজান বাদশা' কাহিনীতে হরবোলা কন্যা শত বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করে বিজয়ী বীরের মতই স্বামীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে (পৃ-৬৪-১০৭)। বীরাঙ্গনা সখিনার কথা আমাদের সকলেরই জানা। *মানিকগঞ্জ জেলার লোকসাহিত্য* দ্বিতীয় খণ্ডের 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা' কাহিনীতে সামান্য রাখালের মেয়ে নিজ বুদ্ধিতে রাজা ও মন্ত্রীকে মুগ্ধ করে গুরুত্বপূর্ণ রাজপদে আসীন হয়। লোককাহিনীর জগতে সম্ভবত সেই একমাত্র মহিলা কূটনৈতিক যে খেটে খাওয়া মানুষের পর্যায় থেকে রাজ-আমাত্যের মর্যাদা লাভ করে। (পৃ-১৭৪)

বাংলা লোককাহিনীতে এ ধরনের নারী চরিত্র সুলভ নয়। বরং তার বিপরীত চিত্রই সাধারণ। সমকালীন ইতিহাস ও সাহিত্যে চিত্রিত নারীর প্রতিকৃতিও গুরুত্বহীন, গৃহকর্মী, পুরুষের ভোগের সামগ্রী মাত্র।

সে যুগে নারী সত্যি সত্যি পুরুষের অনুগামী ও সহযোগী হিসাবে জীবন ধারন করতো। যেন পুরুষের সংসারে কাজকর্ম করা, তার ভোগের ইচ্ছা মিটানো এবং সদা-প্রস্তুত সতী হয়ে কালযাপনই তার অদৃষ্ট লিপিতে পরিণত হয়েছিলো। পুরষ-শাসিত সমাজে পুরুষের বশীভূত, একান্ত অনুগত, পুরুষের কর্মে-ভোগে-সেবায় সদা-প্রস্তুত নারীর এই ইমেজটি কথক ও শ্রোতাদেরও আনন্দ দিতো বলেই লোককাহিনীর নারীরা এভাবে জন্ম নিয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয়, প্রাচীন ও মধ্যযুগের লোককাহিনী, সাহিত্য ও ইতিহাসে নারীর মানবেতর সামাজিক অবস্থানের প্রমাণ দেখে মনেই হয় না যে, একদিন নারীই ছিলো এ সমাজের কেন্দ্রবিন্দু, সংসারের কর্ত্রী ও সহায়-সম্পদের মালিক, একদিন তাদেরকে ঘিরেই আবর্তিত হতো কৃষিজীবি বাঙালির সামাজিক ও পারিবারিক জীবন।

[১] *মোহাম্মদ আবদুল কাইউম*. 'একতোলা কন্যার কিসসা'. *লোক-সাহিত্য সংকলন* তৃতীয় খণ্ড. বাংলা একাডেমী. ঢাকা. ১৩৭১. প-৩।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

লোককাহিনীতে বাঙালির অধ্যাত্মবোধ ও লোকসংস্কার

Dhaka University Institutional Repository

ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ধর্ম-দর্শন

লোককাহিনীর উদ্ভবকালে, সেই তিন/চার হাজার বছর কিংবা তারও আগে, যখন সভ্যতার ক্ষীণ আলো দেখা দিয়েছে মাত্র, তখন মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ধর্ম-চিন্তা যে খুব সুশৃঙ্খল রূপ লাভ করেনি তা সহজেই আন্দাজ করা যায়। হয়তো তারও হাজার বছর আগে, নিজের সপ্রাণ চলাফেরা ও কর্মক্ষমতা থেকে মানুষ উপলব্ধি করেছিলো তার মধ্যে একটি অদৃশ্য শক্তি বাস করে। এই ধারণাই ক্রমে আত্মার ধারণায় রূপান্তরিত হয়।

মানুষ তখনও প্রকৃতির ধ্বংসশক্তির কাছে অসহায়। চলার পথের বিশাল পাহাড় বা খরস্রোতা নদী, সর্বত্র কম্পন তোলে এগিয়ে আসা ঝড়-বৃষ্টি, গহন অরণ্যের বিরাট বৃক্ষ, হিংস্র জন্তু জানোয়ার সবই ছিলো তার ব্যাখার অতীত বিরুদ্ধ শক্তি। তেমনি রোগ ও কালজনিত মৃত্যুভয়ও তাকে তাড়িয়ে বেড়াতো। তখনও নিয়ত বৈরি পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় আহার সংগ্রহ, বাসস্থান নির্মাণ, অসুখ-অসুস্থতা থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় এবং আরো সহজে ও একটু ভালোভাবে বেঁচে থাকার কৌশল বের করাই ছিলো তার একমাত্র লক্ষ্য। তবু নিজের ও প্রকৃতির ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব পাওয়ার আগ্রহও তার কম ছিলো না।

নিজের প্রাণসত্তা আবিষ্কারের পর প্রকৃতির বিপুল শক্তির লীলা দেখে অভিভূত "মানুষ প্রকৃতির বাহ্যরূপ যেমন-বৃক্ষ ঝর্ণা, পাহাড়সারি, মেঘ, পাথর, নক্ষত্র প্রভৃতির উপর এক রকম প্রাণ আরোপ করে। সে যা কিছু দেখেছে সবকিছুকেই তার নিজের মতো জীবন সত্তার অধিকারী বলে মনে করেছে।" (Men attribute a kind of soul to phenomena of nature--e.g. to trees, brooks, mountains, clouds, stones, stars. Primitive Men regarded all he saw as possessing a life into his own.)।[১] মানুষের এই চিন্তাই হলো সর্বপ্রাণবাদের (Animism) প্রথম পর্যায়ের ভিত্তি।

সংক্ষেপে সর্বপ্রাণবাদ হলো আত্মা, আত্মার পুনর্জন্ম ও পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস। সর্বপ্রাণবাদী মনে করে পৃথিবীর সব কিছুরই আত্মা আছে, আত্মা বেদেহীও হতে পারে এবং দেহ বদল করতে পারে, মৃত্যুর পরও অন্যলোকে আত্মার অস্তিত্ব থাকে--গাছ-পালা, পশুপাখি, নদী-পাহাড়, আকাশ-বাতাস ইত্যাদির আত্মাও মানুষের আত্মার মতো সংবেদনশীল। এদের আত্মা মানুষের ক্ষতি করতে পারে এবং তুষ্ট হলে সাহায্য করতে পারে।

সর্বপ্রাণবাদ দুটি স্তরে বিকশিত হয়। প্রথম স্তরে আছে Animatism, দ্বিতীয় পর্যায়ে Animism।

প্রকৃতির সমস্ত কিছুতে একটি বিশেষ শক্তি বা আত্মা সক্রিয়--এ ধারণায় বিশ্বাস করার পরের স্তরে আদিম মানুষ ভাবতে থাকলো প্রতিটি প্রাকৃতিক ঘটনা, যার কাছে মানুষ অসহায় যেমন, মৃত্যু, অসুস্থতা, ঝড়, বৃষ্টি, খরার পেছনে একেকটি শক্তি বা আত্মার হাত আছে। এ থেকেই সৃষ্টি হলো পেশাজীবী দেবতাদের। যেমন ঝড়ের দেবতা, বৃষ্টির দেবতা। সুতরাং প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মৃত্যু এড়ানোর জন্য এসব দেবতাকে তুষ্ট করা অপরিহার্য। সর্বপ্রাণবাদী দর্শনের প্রধান ব্যাখ্যাতা ই. বি. টাইলর মনে করেন সর্বপ্রাণবাদ বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের নিয়ন্ত্রক শক্তি বা দেবতাদের বশ করার উপায় উদ্ভাবনের সাথে সাথে পুনর্জন্ম ও পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সক্রিয় উপাসনার জন্ম দেয়। এটিই সর্বপ্রাণবাদের সর্বশেষ স্তর ও চূড়ান্ত বিকাশ।

পণ্ডিতগণ মনে করেন, সর্বপ্রাণবাদ আদিম মানুষ থেকে শুরু করে সভ্য মানুষের ধর্মীয় দর্শনের ভিত্স্বরূপ (Animism is in fact ground work of the Philosophy of the Religion, from that of

---

[১] D. M. Edward. *The Philosophy of Religion*. London. 1909. P-63.

Dhaka University Institutional Repository

savage upto that of civilized man.)[১] থেকেই একদিকে ধর্ম, আরেক দিকে যাদু বিদ্যার উদ্ভব হয়। আমরা প্রথমে ধর্ম-দর্শন নিয়ে আলোচনা করবো।

প্রাচীনযুগে উদ্ভূত বাংলা লোককাহিনীগুলোতে, সর্বপ্রাণবাদই একমাত্র ধর্ম-দর্শন হিসাবে দেখা দিয়েছে। লোককাহিনীর মধ্যে প্রাচীনতম সৃষ্টি পশুপক্ষীর কাহিনীগুলোতে দেখা যায় মানুষ তার আশপাশের পরিচিত প্রাণী যেমন শেয়াল, বাঘ, ছাগল, গাধা, গরু, সিংহ, ইঁদুর ইত্যাদিকে মানুষের মতই গুণসম্পন্ন বলে মনে করছে। এসব কাহিনীতে মানবেতর প্রাণীগুলো কথা বলতে পারে, মানুষের মত চিন্তা করতে পারে। এরা মানুষের মতই স্নেহ-ভালবাসা, রাগ, দয়া, বিবেচনা, নৈতিকতায় তাড়িত হয় এবং বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সন্দেহ নেই লোককাহিনীর জগতের এই প্রাচীন সম্পদগুলো মানুষের প্রথম ধর্মদর্শন সর্বপ্রাণবাদের সমৃদ্ধ নজির।

বর্তমান গবেষণায় ৬৮টি পশুপাখির কাহিনী বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে প্রতিটি কাহিনীতেই আছে প্রাচীন বাঙালি সমাজের সর্বপ্রাণবাদী ধর্মচিন্তার প্রমাণ। বাংলা একাডেমীর লোক সাহিত্য সংকলন- ৩০ ও ৪২ খণ্ড দুটি মূলত প্রাণীকাহিনীর সংকলন। সে সব কাহিনীতে উপস্থিত প্রানীগুলোর চিন্তা ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি, কাজকর্ম দেখে কাহিনীগুলো পড়তে পড়তে এক সময় ভুলে যাই যে, এগুলো পশুপাখির কাহিনী মাত্র। উদ্ভাবক-কথকের সর্বপ্রাণবাদী দৃঢ়-বিশ্বাস আমাদের সামনে মানবেতর প্রাণীগুলোকে প্রাণীর মুখোশ-পরিহিত মানুষ হিসেবে উপস্থিত করে।

বাংলা একাডেমীর *লোক-সাহিত্য সংকলন* ৪২ খণ্ডের 'বক রাজার হাস্তোর' কাহিনীতে সিদুর কন্যার পিতা হিসাবে বক রাজা তার কথাবার্তায়, প্রতিজ্ঞা রক্ষায়, আচার-আচরণ ও সন্তান-বাৎসল্যে আমাদের অজান্তেই মানুষের রূপ পরিগ্রহ করে। 'শিয়াল্যা ও এক মাতারীর কিস্‌সা'য় আমরা দেখি একটি শেয়াল ধূর্ত-বুদ্ধির মানুষের মত এক মহিলার খেয়ালী কথায় প্যাঁচ ধরে শেষ পর্যন্ত মহিলার একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করতে সমর্থ হয়।

পশুপক্ষীর কাহিনীর প্রাণীগুলোর কথাবার্তাতেও মানুষের অভিব্যক্তি ফুটে উঠে। এখানে কিছু উক্তি উদ্ধৃত করছি:

এক শিয়ালনীর স্বামী মারা যাওয়ার পর অন্য শিয়ালরা তাকে নিকাহ্ করার চাপ দিতে থাকে। তখন একদিন,

"সিয়াননী কয়—তোরা যে আমারে নিকা বইবার কছ আঁর আছে বার জালা বুদ্ধি। যে সিয়াইন্যার তের জালা বুদ্ধি আছে আমি তার কাছে নিকা বইমু।"[২]

এক চতুর টোনা চাতুরীর মাধ্যমে একটি গাভী লাভ করে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পায় এক চাষী তার বউকে দিয়ে হাল চষছে। টোনা তখন বলে,

"ও মশোয়, তুমি বউ দিয়া আল চষো ক্যান ? এই আমার গাই আচে। তাই দিয়া আল চষো। তাই শুনয়া সেই ব্যাটা কলো, যদি তোমার গাই মরোয়া যায়? তাই শুনয়া টোনা কলো, মরবে না, এ্যাধটু চষেই দ্যাহ না।"[৩]

মালঞ্চমালার স্বামীকে দুধবরণ রাজার কন্যা মালা দিয়ে বরণ করার পর তার ঘোড়া পঙ্খীরাজ এসে মালঞ্চমালাকে বলে:

"কন্যা আর কি কইব! রাজার পুরী সোনার চূড়া যেথায় ছিলো মালা, সে মালা টানিয়া নিল তোমার চিকন বালা। হায় মা! কাঁদ অকারণ!"[৪]

মানবেতর প্রাণীগুলো এখানে মানুষের মতই কথা বলছে। এমনকি যেখানে তার সংলাপ চলছে মানুষের সাথে সেখানে দু'পক্ষই সমান সিরিয়াস। কথকরা যেন মানুষ চরিত্রের মুখেই সংলাপ জুড়ে দিয়েছেন, শধু তার নামটাই ভিন্ন।

---

[১] E. B. Tylor, *Religion in Primitive Culture*, Harper and Row, NY, P-10.

[২] শিয়ানো ও শিয়াননীর কিস্‌সা, *লোক সাহিত্য সংকলন*-৩০ খণ্ড, পৃ-৮৪।

[৩] টোনার চাতুরী, *লোকসাহিত্য সংকলন-৪২ খণ্ড*, পৃ-৭৪।

[৪] মালঞ্চ মালার দিব্বী, *কিংবদন্তির বাংলা*, পর্বোক্ত, প-১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন কাহিনীতে আমরা সাহায্যকারী পাখি বেঙ্গমা-বেঙ্গমী কিংবা শুক-সারী দেখা পাই। এদের আলোচনার বিষয়, কথা বলার ধরন থেকে মনে হয় অধ্যাত্ম জ্ঞান-সম্পন্ন দু'জন মানব-মানবীর সংলাপ চলছে। *ঢাকার লোককাহিনীর* 'চূড়ামণির কিস্‌সা'র প্রথম খণ্ডে দ্বীপে নির্বাসিত রাজপুত্রের জীবন রক্ষায় শুক-সারী পাখি তাদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে রাজপুত্রের বাঁচার উপায় বাৎলে দেয় (পৃ-১০)।

পশুপাখির দেহ ধারণ করে মানুষের চলাফেরা করার কাহিনীও সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাসের ইঙ্গিত দেয় । দৃষ্টান্ত-স্বরূপ *ঢাকার লোককাহিনীর* 'চূড়ামণির কিস্‌সার; চতুর্থ খণ্ডে যাদুগিরনীর নাতিদের সাপ, পাখি ও ঘোড়ার ছদ্মবেশে রাজকন্যা হরণের চেষ্টা, পঞ্চম খণ্ডে দেহ বদলের মন্ত্রের মাধ্যমে রাজপুত্র ও উজিরপুত্রের দেহবদলের কথা উল্লেখ করা যায়। জীবিত প্রাণী ছাড়াও গাছপালা, পাথর পাহাড় ইত্যাদির ওপরও প্রাণারোপের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বাংলা একাডেমী *ফোকলোর সংকলন*-৭১-এর 'গণেশের চাতুরীর কিস্‌সা'য় গণেশের দুই বৌদি একটি গাছের উপর মন্ত্র চালনা করে গাছটিকে বশ করে এবং গাছ অল্প সময়ের মধ্যে তাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আকাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছে দেয় (পৃ-৩৭)।

সর্বপ্রাণবাদের এ পর্যায়েই মানুষ আত্মার দেহান্তরে বিশ্বাস করতে থাকে। কায়া বদলের মন্ত্র পড়ে ভিন্ন শরীরে প্রবেশ এবং জীবন ধারণের ঘটনা নিয়ে বেশ কিছু কাহিনী এবং তার পাঠান্তার আছে। *ঢাকার লোককাহিনী* গ্রন্থের 'চুড়ামণির কিস্‌সা'র পঞ্চম খণ্ডে উজির পুত্র কর্তৃক রাজপুত্রের দেহ-ধারণ এবং রাজপুত্ররূপে কিছুকাল বসবাসের মধ্য দিয়ে আমরা তার দৃষ্টান্ত পাই। এই অনু-কাহিনীটি *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয়খণ্ডের 'সোনাফর বাদশাহ' কাহিনীতেও বর্ণিত হয়েছে। *লোকসাহিত্য সংকলন*-৩০ -এ 'শিয়াল ও এক রাজকন্যার কিস্‌সা'তেও দেখা যায় এক রাজপুত্র যাদুর আংটির সাহায্যে শিয়ালের রূপ ধারণ করে রাজকন্যাকে বিয়ে করে (পৃ-৯৯)। কাহিনীগুলো থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে আন্দাজ করতি পারি সে কালের বাঙালি সমাজে একমাত্র ধর্ম-বিশ্বাস হিসাবে দেখা দিয়েছিলো বিকাশমান সর্বপ্রাণবাদ।

প্রথম পর্যায়ে প্রাণী, গাছপালা ও পাহাড়-পর্বতে প্রাণারোপের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হয় বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জীবন ও জীবিকার নিয়ন্ত্রক দেবতা উদ্ভাবনের পালা। বাংলা লোককাহিনীতে এ প্রক্রিয়াটির পরিছন্ন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। তবে আরো পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবী ও যোগী সিদ্ধাদের পদচারণা থেকে ধারণা করে নেয়া যেতে পারে যে বাঙালির সর্বপ্রাণবাদী ধর্ম-বিশ্বাস ক্রমে পূর্ণাঙ্গ ধর্ম-দর্শনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো।

প্রাচীন লোককাহিনীতে যোগী সিদ্ধাদের উপস্থিতি অষ্ট্রিক-আলপিনোদের উত্তর-পুরুষ প্রাচীন বাঙালির ধর্ম-চর্চার সাথে সম্পর্কিত বলে মনে হয়। *লোক সাহিত্য সংকলন*-৪২ খণ্ডের 'বক রাজার হাস্তোর' কাহিনীতে দরিদ্র রাখাল ছেলে মনি তার স্ত্রীর সন্ধানে যেতে যেতে এক বনের ভেতর গিয়ে এক যোগীকে ধ্যানরত অবস্থায় দেখতে পায়। মনি তার ধ্যান ভাঙ্গিয়ে সাহায্যের আবেদন জানানোয় যোগী রেগে গিয়ে বলে যে তার যোগ সাধনা আর সাতদিন পরই সিদ্ধি লাভ করতো। এ অবস্থায় মনি তার ধ্যান ভাঙ্গিয়েছে বলে মনিকে সে অভিশাপ দিতে উদ্ধত হয়। কিন্তু মনির দু:খের কথা শুনে তাকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বলে যে, সামনে তার অন্য চার ভাই ধ্যান করছে। মনি যেন তাদের কাছে গিয়ে তার কথা বলে সাহায্য চায়। (পৃ- ২২)। মনি সর্বশেষ যোগীর সাহায্যে তার স্ত্রীকে ফিরে পায়।

ঢাকার লোককাহিনীর 'চূড়ামণির কিস্‌সা'র তৃতীয় খণ্ডে রাজার দরবারে 'সত্যের মুল্লুক' থেকে দুই সিদ্ধ সাধু পুরুষ এসে উপস্থিত হয়। তারা সত্যের মুল্লুকে বারো বছর সাধনা করে এসেছেন। দু'জনই বাক্যসিদ্ধি অর্জন করেছেন বলেই রাজার কান গাধার কানের মত হওয়ার অভিশাপ বাক্য কার্যকর হয় (পৃ-৩৯)।

বাংলা একাডেমীর *ফোকলোর সংকলন*-৭১-এ 'রাজা-উজির-কোতোয়াল-নাজিরের ছেলের কিস্‌সা'য় দেখা যায় চার বন্ধু দেশ ভ্রমণে বের হয়ে এক নির্জন পাহাড়ের একটি ছোট কূটীরে এক সাধুকে আবিষ্কার করে যে ইচ্ছা অনুযায়ী জীবিত মানুষকে মৃত এবং মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারে (পৃ-৯১)। তার সাধনার স্থান, ক্ষমতা ও অন্যান্য বর্ণনা থেকে উপলব্ধি করা যায় ইনিও সেই সিদ্ধা সিদ্ধ পুরুষদের সমগোত্রীয়।

যোগী সাধুদের উপস্থিতি ইঙ্গিত করে সর্বপ্রাণবাদের পর প্রাচীন বাঙালি সমাজে ধর্ম-চর্চা হিসাবে যোগ সাধনা পরিচিতি লাভ করে। যোগ হিন্দু ধর্মের ষড়দর্শনের অন্যতম প্রধান মতবাদ। খ্রিষ্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতকে পতঞ্জলী

Dhaka University Institutional Repository

'যোগসূত্র' গ্রন্থে যোগ-দর্শনের বিভিন্ন সূত্র ও নীতিসমূহ একত্রে সমন্বিত আকারে প্রকাশ করেন। পণ্ডিতদের অভিমত যোগের মূল আরো প্রাচীন এবং নি:সন্দেহ অনার্য।[১] মুহম্মদ আবদুল হাই এবং ড: আহমদ শরীফও যোগ অনার্য ধর্ম-দর্শন বলে মত ব্যক্ত করেছেন ।[২]

বাংলা লোককাহিনীতে যোগ চর্চার বর্ণনা থেকে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, আর্য হিন্দু ধর্ম এদেশে ছড়িয়ে পড়ার আগে সর্বপ্রাণবাদী ধারণা থেকে কিছু ধর্ম-মত বিকশিত হচ্ছিলো যার মধ্যে যোগ ও সাংখ্য অন্যতম। নিরীশ্বর সাংখ্যও কর্ম অনুযায়ী পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী যা সর্বপ্রাণবাদের অন্যতম মৌল নীতি।[৩]

বৌদ্ধ ধর্ম: বাংলা লোককাহিনীতে যোগ ও যোগী ছাড়া পুরানো ধর্ম দর্শনের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের কিছু উপাদান চিহ্নিত করা গেছে। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* দ্বিতীয়খণ্ডে অকুল-বকুল-এ এক রাজার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে যিনি অনেক চেষ্টার পর তার পূর্ব-জন্মের কথা জানতে পারেন। পূর্ব জন্মে তিনি এক দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। একদিন তার বাবার কাছে এক সন্ন্যাসী কিছু খাবার চাইলে তার মা ও ছোট ভাই তাদের অংশটুকু খেয়ে তার ও তার বাবার অংশটুকু সন্ন্যাসীকে দিতে বলেন। তারা অভুক্ত থেকে সন্যাসীকে খাওয়ানোর ফলে তিনি এবং তার বাবা পূনর্জন্ম নিয়ে রাজা হয়েছেন। আর তার মা মলাহারী কালো পেত্নীরূপে জন্ম নিয়েছে। (অকুল-বকুল, *বাংলাদেশের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ড/নেত্রকোনা, পৃ-১২৩)।

হিন্দু ধর্মও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। কিন্তু কাহিনীর পরিবেশ, রাজা ও সন্ন্যাসীর বর্ণনা ইত্যাদি থেকে আন্দাজ করা যায় এটি বৌদ্ধ ধর্মের পুনর্জন্মের বিশ্বাসজাত কাহিনী। তা ছাড়া কাহিনীটির বুনন জাতকের কাহিনীগুলোর অনুরূপ। জাতকের কাহিনীসমূহে বুদ্ধ নিজেই তার কর্ম অনুযায়ী বিভিন্নরূপে জন্ম নেয়ার কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার কর্তৃক টাঙ্গাইল থেকে সংগৃহীত 'মালঞ্চমালা' কাহিনীটিকেও বৌদ্ধ আমলের কাহিনী বলে মত প্রকাশ করেছেন। তার মতে কাহিনীটিতে বৌদ্ধ সমাজের রীতিনীতি ও আচার-প্রথার চিহ্ন বিদ্যমান। দীনেশচন্দ্র সেন কাহিনীটির উদ্ভবকাল দশম শতকের কাছাকাছি সময়ের বলে মনে করেন।[৪]

এসব কাহিনীতে বৌদ্ধ ধর্মমতের প্রাধান্য ইঙ্গিত করে প্রাচীন যুগের শুরুতে বাঙালি সমাজ তার সর্বপ্রাণবাদ এবং তা থেকে উদ্ভূত অন্যান্য ধর্ম-মত পরিত্যাগ করে ধীরে ধীরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়ছিলো। কিন্তু দীর্ঘদিনের সংস্কারের কারণে তাদের কাহিনীতে প্রথম যুগের সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাসের চিহ্ন তখনো বিলীন হয়নি। বাংলাদেশের বহু স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক চৈত্য,মঠ, বৌদ্ধ বিহার। লোককাহিনীর তথ্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র একত্রে মিলিয়ে পড়লে আমাদের সন্দেহ থাকে না যে গুপ্ত ও পাল শাসনামলে এবং সেন শাসনের শুরুতে বৌদ্ধই ছিলো বাঙালির প্রধান ধর্ম-মত।

হিন্দু ধর্ম: গুপ্ত অধিকারের সময় এদেশে প্রথম ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের গোড়া পত্তন হয়। সেই সাথে শুরু হয় হিন্দু ধর্ম প্রসারের সাংগঠনিক প্রচেষ্টা। রাজ-পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তর-ভারত থেকে ব্রাহ্মণ আমদানী করে এদেশে ব্রাহ্মণ বসতি গড়ে তোলা হয়। বৌদ্ধ-বিদ্বেষী শশাঙ্কের আমলে বৌদ্ধদের উপর রাজার খড়্গ নেমে এলে হিন্দু ধর্ম সমৃদ্ধির পথ ধরে। শশাঙ্ক এতটাই বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ছিলেন যে, তিনি বৌদ্ধদের,দেখা মাত্র হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৫]

শশাঙ্কের রাজ্য গৌড় খুব বৃহৎ রাজ্য ছিলো জানা যায়। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল সম্ভত গৌড়ের অধীনস্থ ছিলো না। কারণ শশাঙ্কের আগে ও পরে দক্ষিণবঙ্গে এবং কুমিল্লা অঞ্চলে কয়েকজন স্বাধীন রাজা রাজত্ব করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে শশাঙ্কের প্রায় সমসাময়িক খড়্গ বংশের নৃপতিরা সমতটে রাজত্ব করেছে। এরা বৌদ্ধ ছিলেন। ফলে শশাঙ্কের সাম্প্রদায়িক নির্যাতন সমতটে থাবা বিস্তার করতে পারেনি। তাই ধরে নেয়া যায় সেনামলের পূর্ব পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম সমতটে প্রধান ধর্ম হিসাবে টিকে ছিলো। এ ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলেও

---

১ Benjamin Walker, *The Hindu World, Vol-II*, London, 1968, p-616.

২ মুহম্মদ আবদুল হাই ও ড: আহমদ শরীফ, *'মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা'*, মাওলা ব্রাদার্স, ১৪০২, ভূমিকা-ত।

৩ অখিল বন্ধু সাহা , *সাংখ্য দর্শন ও ন্যায় দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ-৮-৯।

৪ ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, *কিংবদন্তির বাংলা*, পূর্বোক্ত, পৃ-২০০।

৫ শ্রী চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, *রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ*, পৃ- ১২৪।

জনগণের একটি অংশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত ছিলো।[1] উপরোক্ত লোককাহিনীগুলো সে কালের ধর্মমতের প্রভাব ধরে রেখেছে।

Dhaka University Institutional Repository

গুপ্ত শাসনামল থেকে শুরু করে সেন শাসনামল পর্যন্ত বাংলাদেশে ক্রমে ক্রমে হিন্দু ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিশেষত সেন আমলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু ধর্মের ব্যাপক প্রসার হয়। কিছু কিছু বাংলা লোককাহিনী আছে যাতে প্রাচীন যুগের সাংস্কৃতিক-ভৌগলিক উপাদান বিদ্যমান এবং যা প্রধানত হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের কাহিনী। ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায় সেন আমলের পূর্ব-পর্যন্ত হিন্দু ধর্ম বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের আস্থা লাভ করতে পারেনি। অতএব আন্দাজ করে নেয়া যায় হিন্দু ধর্মের গুণকীর্তনে ভরপুর এই কাহিনীগুলো সেন আমলে উদ্ভূত।

এ ধারার কাহিনীর মধ্যে *বরিশাল জেলার লোকসাহিত্যের* 'চন্দ্র শেখর' নামক কাহিনীটি প্রথমেই আলোচনাযোগ্য। এ কাহিনীর নায়ক চন্দ্রশেখর আচার-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। হবু স্ত্রীর নাম আরাধ্য দেবীর নামে হওয়ায় সে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আত্মহত্যা করতে নৌকায় করে সমুদ্রের মাঝখানে যায়। সেখানে তার দেবী ধীবর কন্যারূপে তাকে দেখা দিয়ে তার সিদ্ধান্ত পাল্টান। দেবী তাকে এই বর দেন যে, এই অথৈ সমুদ্রে একদিন স্থলভূমি জেগে উঠবে এবং চন্দ্রশেখরের নামানুসারে তার নাম হবে চন্দ্রদ্বীপ (পৃ-৩১৫)। কাহিনীটি দেড় হাজার বছরের পুরোনো বলে সম্পাদকের দাবী যুক্তিসঙ্গত না হলেও এর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সংশয় নেই।

হোসেন উদ্দিন হোসেন কর্তৃক সম্পাদিত *যশোর জেলার কিংবদন্তীর* 'তুলসীরামের ইতিকথা'য় দেখা যায় বর্তমান যশোরে বাগ্দী ও নিষাদ জাতির বসবাসকালে, তুলসীরাম নামে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়। তিনি স্থানীয়দের নিরাপত্তা ও মঙ্গল নিশ্চিত করে অন্তর্হিত হন। বর্তমান যশোর তখন বিশাল জলাভূমিতে নিমগ্ন ছিলো বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের কিংবদন্তী'র 'একটি প্রেমের জন্যে' কাহিনীটি কৃষ্ণ-দৌহিত্র অনিরুদ্ধ এবং শিব-ভক্ত জনৈক রাজার কন্যা উষাবতীর প্রেমের কাহিনী। যুবরাজ অনিরুদ্ধকে কৃষ্ণের দৌহিত্র বলে উল্লেখ করলেও পৌরাণিক চরিত্র কৃষ্ণের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিলো বলে মনে হয় না। তিনি কৃষ্ণ নামধারী কোন হিন্দু রাজার দৌহিত্র অথবা কোন কৃষ্ণভক্ত রাজার দৌহিত্র ছিলেন বলেই মনে হয়। কৃষ্ণভক্ত ও শিব-ভক্তদের চিরন্তন সংঘাতের কারণে অনিরুদ্ধকে যুদ্ধ করে উষাবতীকে দখল করতে হয়। অনিরুদ্ধের এক সহযোগী শিব-ভক্ত রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-কৌশল হিসাবে একটি মার্বেলের বৃষ নির্মান করেছিলেন। ঘটনাস্থল দিনাজপুরের জেলা পরিষদের সামনে সেই বৃষ-মূর্তিটি আজো নাকি রক্ষিত আছে (পৃ-৫০)।

লোকসাহিত্য সংকলন-৩০-এ 'এক বামন ও বাঘের কেস্সায়' এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের যজমানগিরি করে জীবিকা নির্বাহের কথা আছে (পৃ-৫০)। নুরুল ইসলাম পাটোওয়ারী কর্তৃ সংগৃহীত ও সম্পাদিত *বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি; কথকতা* গ্রন্থে 'গুইলা রাজার কিস্‌সা' থেকে জানা যায় গুইলা রাজা কুমড়োর বীজ রোপণের জায়গা না পেয়ে 'গঙ্গী মা গঙ্গী মা' ডেকে পাতালে চলে গিয়েছিলো। গঙ্গী মা তাকে সাহায্যও করেছিলেন।

উপরের কাহিনীগুলোতে আমরা পাচ্ছি হিন্দু ধর্মাবলম্বী বেশ কয়েকজন মানুষের কাহিনী। তাদের মধ্যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে প্রবল প্রতাপশালী রাজা অনিরুদ্ধও আছেন। অর্থাৎ বাঙালি সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত। এ থেকে আন্দাজ করা যায় সে সমাজে হিন্দু ধর্ম যথেষ্ট প্রভাবশালী না হলে গণ-মানসে লোককাহিনীর ভিত্তি সৃষ্টি হতো না। তখনো মুসলমানরা এদেশে প্রবেশ করেনি। বৌদ্ধদের অনেকে ধর্মান্তরিত, অন্যরা দেশ ছেড়ে তিব্বত ও নেপালে আশ্রয় নিয়েছে। ঐ সময় প্রাচীন বাঙালি সমাজে আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণ-ভেদ ও ধর্মচর্চা জায়গা করে নেয়।

যে সব কাহিনীতে হিন্দু ধর্মের পরবর্তী পর্যায়ের তথ্য পাওয়া যায় তার অনেকগুলো ঐতিহাসিক তথ্য-সম্বলিত বলে সংশ্লিষ্ট কাল নির্ণয় সহজ। *বাংলাদেশের কিংবদন্তী'র*, 'নিশিথে বাঁশরী বাজে' কাহিনীতে আমরা জানতে পারি শেরশাহ পাবনার সমাজ গ্রামে কিছুদিন অবস্থান কালে এক ব্রাহ্মণের সুন্দরী কন্যা বিয়ে করেছিলেন (পৃ- ৪২)।

---

[1] নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষেপিত সংস্করণ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি., কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩, প-৮১।

Dhaka University Institutional Repository

যশোরের কিংবদন্তীর 'রাজনটী সমাচার' কাহিনীতে দেখা যায় নবদ্বীপ এক বিরাট তীর্থ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। যশোরের নারায়ণতলাতেও এ ধরনের বড় একটি তীর্থ কেন্দ্র গড়ে উঠেছিলো যেখানে দেশ বিদেশ থেকে হিন্দুরা আসতো পুণ্য-সঞ্চয়ের জন্য। পূর্বোক্ত গ্রন্থের 'কার বাঁশী কাঁদে' কাহিনীতে জানা যায় সে আমলে হিন্দু মন্দিরগুলোতে নিয়মিত পূজা-অর্চনা চলতো, কাসঁর ঘন্টার শব্দে চার পাশ মুখরিত থাকতো, সারাক্ষণ শোনা যেত পূজারীদের মন্ত্র পাঠ। *যশোরের কিংবদন্তী'র* 'দেবদাসী' কাহিনীতে দেখি মন্দিরের এক দেবদাসী রাজপুত্র পীতাম্বরের সাথে মিলিত হওয়ায় তাকে বলি দেয়া হয়েছে। কারণ দেবদাসী শুধু দেবতার ভোগে লাগবে। অন্য কেউ তাকে স্পর্শ করলে সে নষ্ট, দেবতার অস্পৃশ্য।

বাংলাদেশের লোককাহিনীর 'অকুল-বকুল' কাহিনীতে আছে শিব ও স্বরস্বতীর বন্দনা, শনি সেখানে সম্ভবত অপদেবতা হিসাবে উল্লেখিত। কারণ কাহিনীতে শনি বহুলোক খুন করে এবং পরস্ত্রী ভোগ করে শেষ পর্যন্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। (পৃ-১০৯)।

প্রত্যক্ষ ধর্মীয় উপাদানযুক্ত কাহিনী ছাড়াও আরো কিছু কাহিনী পাওয়া যায় যেগুলো হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাহিনী। যেমন বাংলা একাডেমীর *লোক সাহিত্য সংকলন* দ্বিতীয় খণ্ডের 'ধার্মিক রাজার কিস্‌সা'। মুহম্মদ মনসুর উদ্দিনের 'শিরনী' গ্রন্থের 'মধুমালার কেচ্ছা' শুরু হয়েছে এভাবে :

"বিজয় নগরত আছিল এক রাজা। রাজার নাম বিশ্বেশ্বর চোধুরী। যই সই রাজা নয়। মস্ত বড় রাজা। হাতি ঘোড়া-নুকনস্কর-মালমাত্তা--এ গিলায় কুনয় অভাব নাই।" (পৃ-৭৩)। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* প্রথম খণ্ডের 'নবডং নবডং' (পৃ-১০৭), ও 'ধনপতি রাজার কিস্‌সা' (পৃ-১৪৭), *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'চারিরতন'(পৃ-১৭৬) হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের কাহিনী।

কিংবদন্তির বাংলা গ্রন্থের 'গ্রামের নাম ফলদা' কাহিনীতে টাঙ্গাইলে যশোধর নামে এক প্রতাপশালী হিন্দু রাজার কথা জানা যায় যার কূল দেবতারা হলেন 'কানাই বলাই' ও 'মদন-গোপাল'। তিনি সারাক্ষণ ধর্মচর্চায় নিয়োজিত থাকতেন। পূর্বোক্ত গ্রন্থের 'পোয়াতির বিল'-এ উল্লেখ আছে এক ব্রাহ্মণের স্ত্রী সন্তান না হওয়ার দু:খে আত্মহত্যা করতে গেলে দেবী দূর্গা তাকে সন্তান লাভের বর দিয়ে ফিরিয়ে দেন (পৃ-৩০)।

বাংলাদেশের লোককাহিনী প্রথম খণ্ডের 'চার দোস্তের কথা' কাহিনীতে হিন্দু রাজার বাড়িতে আয়-উন্নতির দেবী হিসাবে লক্ষী অবস্থান করেন। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনীর* দ্বিতীয় খণ্ডের 'মদন সাধু' কাহিনীতে মাঝি পঞ্চা কর্তৃক দেবী চণ্ডীকে আহবান এবং চণ্ডীর সহায়তায় পঞ্চার শক্তি বৃদ্ধির উল্লেখ আছে (পৃ-৩৭।) সে কাহিনীতে মদন সাধুর বানিজ্য যাত্রার বর্ণনায় আছে :

জয়কালী ডিঙ্গা সাধু পাছে ফালাইল।
লক্ষী ডিঙ্গায় গিয়া সাধু উঠিয়া বসিল॥
(পৃ-৩৭)

লোকসাহিত্যের কথকরা সাধারণত নিরক্ষর চাষী, খেটে খাওয়া মানুষ। এর সৃজন-প্রক্রিয়াটি স্বতস্ফূর্ত একটি বিষয় যার সাথে জড়িয়ে আছে শ্রোতা ও কথকের বিশ্বাস, আগ্রহ ও আনন্দ লাভের প্রশ্নটি। এ জন্য ধরে নেয়া যায় লোককাহিনী দানা বাঁধবে সেই সব উপকরণের আশ্রয়ে যা সংশ্লিষ্ট সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের নিজের জিনিস। উপরোক্ত লোককাহিনীগুলোয় হিন্দু ধর্মের আধিপত্য ইঙ্গিত করে যে, প্রাচীন যুগের শেষ দিক থেকে আরম্ভ করে সমগ্র মধ্যযুগ ধরে হিন্দু ধর্ম এদেশের অন্যতম প্রধান ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। বাঙালি আপদে-বিপদে তাদের দেব-দেবীদের ডেকে সাহায্য চাইতো। ধর্ম-চর্চায় তারা নিবেদিতপ্রাণ ছিলো বলেই মন্দিরগুলো সারাক্ষণ ব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণে এবং কাঁসার ঘন্টার আওয়াজে মুখরিত থাকতো।

বাংলা লোককাহিনীতে যে সব দেব-দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে চণ্ডী লৌকিক দেবী। (দ্র- ড: আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ-৪২)। অসিত কুমার বন্দ্যোপধ্যায়ও লিখেছেন, "আদিতে চণ্ডী ছিলেন অনার্য

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাধ জাতির দেবী। . . . সাপের দেবী মনসা যে আর্যমণ্ডল বহির্ভূত তাতে কোন সন্দেহ নেই।"[১] শিবকে পৌরাণিক দেবতা বলা হলেও বাংলাদেশে তার লৌকিক ইমেজই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। দূর্গা এবং গঙ্গা পৌরাণিক। লোককাহিনীর বাঙালি সমাজে হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাসে আর্য ও অনার্য প্রভাবের মিশ্রণের দৃষ্টান্ত অনেক। হয়তো প্রাচীন যুগের বাঙালিরা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করলেও তাদের নিজস্ব জিনিস তখনো ভুলেনি। তাই আর্য-ধর্মেরই আশ্রয়ে পৌরাণিক দেব-দেবীর সাথে প্রাচীনতম ধর্ম-চিন্তাও তারা ধরে রেখেছিলো ।

ইসলাম ধর্ম: বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের আরো অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার শুরু হওয়ার কিছু প্রত্যক্ষ পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। ডঃ এম. এ. রহিম, মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ পণ্ডিত আরব ঐতিহাসকগণের লেখায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে মত প্রকাশ করেছেন যে, বখতিয়ারের বঙ্গ বিজয়ের অনেক আগে--নবম-দশম শতাব্দী থেকে চট্টগ্রামসহ দক্ষিনের সমুদ্রোপকূলবর্তী বন্দর এলাকায় আরবদের বসতি স্থাপন শুরু হয় এবং সেই সুত্রে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হতে থাকে।[২] ডঃ এনামুল হক আরবী গ্রন্থসূত্রে প্রাপ্ত পরোক্ষ তথ্যের ভিত্তিতে দাবী করেছেন নবম শতকে চট্টগ্রামে একটি ছোট মুসলিম রাজ্য স্থাপিত হয়েছিলো।[৩]

উপরোক্ত পণ্ডিতদের দাবীর সাথে সাজুয্যপূর্ণ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজশাহীতে পাওয়া গেছে খলিফা হারুনুর রশীদের আমলের (৭৮৬-৮০৯) মুদ্রা। লালমনির হাট জেলার একস্থানে একটি প্রাচীন মসজিদের ভগ্নস্তুপে আরবী হরফে ৬৯ হিজরী সন লেখা ইট পাওয়া গেছে।

এসব প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সূত্রের ভিত্তিতে আমরা অনুমান করতে পারি নবম-দশম শতক থেকে এদেশে ইসলাম প্রচার শুরু হয়। তবে তখন দক্ষিনের দু'একটি সমুদ্রোপকূলবর্তী দু'একটি অঞ্চলে তা সীমাবদ্ধ ছিলো। ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পথ সুগম হয়। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে বাংলাদেশে ইসলামের ব্যাপক প্রসার হয় এবং চতুর্দশ শতকের শেষদিকে ইসলাম এদেশের মানুষের প্রধানতম ধর্মের মর্যাদা লাভ করে।

হিন্দু সেন রাজাদের সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও বর্ণ প্রথায় জর্জরিত বাঙালি সমাজে ইসলামের তৎকালীন সাম্য ও শান্তি বাদী রূপ একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করেছিলো যা চিহ্ন রেখে গেছে বাঙালির শিল্প-সাহিত্য থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে। লোককাহিনীতেও সেই জোয়ারের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়।

ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে, সঙ্গত কারনেই হিন্দু ধর্মের প্রতাপ কমে আসতে থাকে। বাঙালির ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সূচিত হয় দীর্ঘ পরিবর্তন। এ সময়ের লোককাহিনীগুলোতে আমরা ধর্মীয়-সামাজিক রদবদলের ছাপ খুঁজে পাই।

অধিত কাহিনীগুলোর মধ্যে মুসলমান চরিত্র নিয়ে সৃষ্ট কাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও ইসলামী উপাদানের প্রাধান্য ইঙ্গিত দেয় যে, তখন ইসলাম বাঙালি সমাজে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। তবে সতর্ক পাঠে লক্ষ্যণীয় যে, বাঙালির পূর্ব-ধর্ম অর্থাৎ অষ্ট্রিক-আলপিনোদের সর্বপ্রাণবাদ, যোগ, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম লোককাহিনীর ইসলাম ধর্মকে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রভাবিত করেছে। অন্যদিকে, কিছু লোককাহিনীতে ইসলামের অবিকৃত প্রকাশও লক্ষ্য করা যায়। এই পর্যবেক্ষনের ভিত্তিতে আমরা লোককাহিনীর ইসলামী উপাদানসমূহ তিনটি বৈশিষ্টের আলোকে আলোচনা করেছি।

ক. কোরআন ও সুন্নার ভিত্তিতে প্রচারিত ইসলাম : কিছু লোকাকাহিনীতে কোরআন ও সুন্নায় বর্ণিত ইসলাম মানুষের বিশ্বাস হিসাবে দেখা দিয়েছে। এসব কাহিনীর পাত্রপাত্রীগণ আল্লাহকে শেষ গন্তব্য মেনে নামাজ-

---

[১] অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, মডার্ণ বুক এজেন্সীজ প্রাইভেট লি., কলিকাতা, পুনর্মুদ্রিত নতুন সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ-৫১।

[২] ডঃ এম. এ. রহিম, *বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস-প্রথম খণ্ড*, অনু- মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, প্রথম পুনর্মুদ্রন, ১৯৯৫, পৃ-৩৬-৩৯।

[৩] এনামুল হক, *পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলাম প্রচার*, ঢাকা, ১৯৪৮, প-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

রোজা প্রভৃতি ফরজ পালন করে এবং আল্লাহর শোকরিয়া গুজার করে সন্তুষ্ট। *ঢাকার লোককাহিনীর* "রাজকুমার সফর চান ও সোবুজ নিশাপরীর কিস্‌সা'য় দেখা যায় রাজকুমার সফরচান সোবুজ নিশাপরীর খোঁজে যাত্রা করার আগে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করে নামাজ পড়া হয়। এমনকি আজানও দেয়া হয়। (পৃ-৯৫-৯৬) কোন বিশেষ কাজে যাত্রার প্রাক্কালে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নফল নামাজ পড়ে নিরাপত্ত ও সফলতার জন্য প্রার্থনার এই রেওয়াজ এখনো প্রচলিত। এর মধ্যে কোন অলৌকিকতা নেই।

বরিশাল জেলার লোকসাহিত্যের 'ছবি খাঁ' আখ্যানে দেখা যায় বাল্যকালে হারিয়ে যাওয়া ছবি খাঁ ভিনদেশী ব্যক্তির হাতে লালিত পালিত হয়ে ভুলক্রমে মাতৃসম্ভোগ করে। কিছুদিন পর মায়ের পরিচয় পেয়ে ছবি খাঁ পাপমোছনের জন্য সমস্ত সহায়-সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে মক্কায় চলে যায়। (পৃ-৩২৩)

একই গ্রন্থের 'লনি সেন' কাহিনীতে লনি সেন নামাজ পড়তে গিয়ে মসজিদে কদাচার দেখে ক্ষিপ্ত হয় এবং ঐ এলাকার লোকজনকে গাল মন্দ করে।

*যশোরের লোককহিনীতে*দেখা যায় এক নেখ্‌বখত স্বামী স্ত্রী আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে পরস্পরকে ভুলে যায় এবং হারিয়ে ফেলে। বহুদিন পর আল্লাহর রহমতে আবার তাদের মিলন হয়।

উপরোক্ত কাহিনীগুলোর ইসলাম ধর্ম বিষয়ক উপাদানসমূহের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট হলো এগুলো অলৌকিকতামুক্ত। প্রথমযুগে ইসলাম যেভাবে প্রচারিত হয়েছে এখানে তার বিকৃতি ঘটেনি।

খ. অলৌকিক ক্ষমতার উৎস হিসাবে ইসলাম : লোককাহিনীতে ইসলাম ধর্মের এ শ্রেণীর উপাদানই বেশি। এখানে ইসলাম সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধর্ম নয় শুধু, ধর্মমতে আশ্রয় গ্রহণকারীর সমৃদ্ধি, শক্তি ও নিরাপত্তার মন্ত্রও। ইসলামের এই রূপটিই অধিকাংশ লোককাহিনীতে প্রকাশ পেয়েছে। 'মদনসাধু' কাহিনীতে মদনের স্ত্রী সমলা স্বামীকে উদ্ধার ও শত্রু ধ্বংসের জন্য পাতালপুরীতে হানা দিলে:

"পতালপুরীর রাজা দেওদানবের এক বিরাট সৈন্যদল দেখিয়া বিচলিত হইল। সে সমলার অভিযানের পথে পানির বাণ ছাড়িল। পথঘাট পানিতে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। সমলা দেখিল ঢেউ তুলিয়া সমুদ্র যেন ছুটিয়া আসিতেছে। সমলা ইসমে আজম জানিত । সে আল্লার নাম লইয়া ইসমে আজম পড়িল; পানির মধ্যে রাস্তা হইয়া গেল।"[১]

'চূড়ামণির কিস্‌সা'র সপ্তম খণ্ডে উজিরের পুত্র মৃত রাজপুত্রের লাশ নিয়ে স্ত্রীর কাছে এলে তার স্ত্রী রাজপুত্রকে পুনরায় জীবিত করার জন্য দরবেশের শরণাপন্ন হয়। দরবেশ পানিতে আল্লাহর কালাম পড়ে তার হাতে দিয়ে বলেন :

"লও মা এই পানি, লাশটির ধড় আর শির এক সঙ্গে কইরা চিটাইয়া দিও। আল্লার মর্জি ভাল অইয়া যাব।"[২]

বাংলাদেশের লোককাহিনী প্রথম খণ্ড 'সাত ভাইয়ের বোন টোপা' কাহিনীতে টোপাকে হত্যা করার জন্য চুলোয় বিষধর সাপ দেয়ার পর টোপা বিসমিল্লাহ্‌ বলে চুলোয় হাত দিলে সাপ তাকে কামড় দেয় না (পৃ-৬১)।

এখানে ইসলাম ও আল্লাহ্‌র অলৌকিকতার বর্ণনাযুক্ত বহু কাহিনীর কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা হলো। প্রকৃত অর্থে যেসব লোককাহিনীর পাত্র-পাত্রী মুসলমান তার অধিকাংশ আল্লাহ্‌র এরকম অলৌকিক ক্ষমতা ও কার্যকলাপে পরিপূর্ণ। এমনকি ইসলাম-পূর্ব যুগে উদ্ভূত কিছু কাহিনীতে আল্লাহর কুদরতী ক্ষমতার দৃষ্টান্ত সংযোজিত হয়েছে। অনুমান করা যায় এই অবাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে মুসলিম কথকদের দ্বারা।

---

[১] 'মদন সাধু', *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয়খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৫।

[২] 'চূড়ামণির কিস্‌সা', *ঢাকার লোককাহিনী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮০।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) পীরবাদ: লোককাহিনীর ইসলাম ধর্মের তৃতীয় ধারাটি পীরবাদকেন্দ্রিক। বেশ কিছু লোককাহিনীতে জীবিত ও মৃত কয়েকজন পীরের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিপদে পড়ে পীরদের কাছে সাহায্য চাইলে যথাযথ সাহায্য অবধারিত। পীরগণ অলৌকিক ক্ষমতাবলে প্রার্থনাকারীকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এ রকম একজন পীর হলেন গাজী সাহেব। একটি লোককাহিনী বর্ণনায় জানা যায় এক সওদাগর বিদেশে বিপদে পড়ে গাজী পীরকে ডাকতে থাকলে :

গাজী সাহেব তখন ধ্যানে বইয়া দেহে—আরব সদাগরের পুত আলম সদাগর শহুরের বানিজ্য করত আইছে। দ্বীপচরের মাইঝে বিপদঅ মুশকিলঅ পইড়্যা ডাকতাছে। এই যে গাজী সাব আছিন—আসন না ছাইড়া মহাশুণ্যকার উড়াল দিছে রথ না লইয়া —না, রথ লইয়া উড়তে উড়তে এই দ্বীপচরের মইদ্যে গেছে। গিয়া কয় --এই রে পুত্রা কি বিপদঅ মুশকিলঅ পড়ছস ক—দুনিয়াডা পানিচালি কইরা লামু কতাক্ষানের মাইঝে।"[১]

ঢাকার লোককাহিনী, 'চূড়ামণির কিস্‌সা'র প্রথম খণ্ডে দ্বীপে নির্বাসিত রাজপুত্রের সাহায্যে এগিয়ে আসেন খোয়াজ খিজির। *কিংবদন্তির বাংলায়* আমরা জানতে পারি ইয়াকিন শাহ ও গোলাম আলী নামে দুই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পীরের কথা। (পৃ-৪৯ ও ৬২)।

গাজী, খোয়াজ খিজির ছাড়া বদর পীর ও সত্যপীরের প্রসঙ্গও পাওয়া যায়। তবে লৌকিক পীরদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুজনই বেশি প্রভাব বিস্তার করে আছেন। লোককাহিনীতে ইসলামী অলৌকিকতার এই উপাদানটির উদাহরণ খুব বেশি নেই।

নিরক্ষর মুসলমানদের সামনে ইসলামী পুরাণ জাতীয় কিছু ছিলো না। সে জন্য আমরা বাংলা লোককাহিনীতে ইসলামকেন্দ্রিক অলৌকিকতা ব্যাখ্যার জন্য দুটি উৎসকে দায়ী বলে মনে করি। তার একটি হলো হিন্দু ধর্মের দেব-দেবীর অলৌকিক ক্ষমতার বর্ণনা যা দেখে মুসলমানরা হিন্দুদের 'সমকক্ষ' হওয়ার জন্য হিন্দু পুরাণের অনুকরণে কল্পনার সাধ্য মতো কোরআনের বাণীর উপর বিচিত্র ক্ষমতা আরোপ করে ইসলাম ধর্মকে করে তুলেছে অলৌকিকতার আধার।

দ্বিতীয়তঃ প্রথম যুগের ইসলাম প্রচারক সুফী-দরবেশগণ রহস্যময় জীবন যাপনের কারণে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে কিংবদন্তীতে পরিণত হন। পরবর্তীতে এসব কিংবদন্তী অবলম্বনে মুসলমানরা ইচ্ছামতো অলৌকিক কাহিনীর জন্ম দেয়। ইসলামী অলৌকিকতার পেছনে সংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসও প্রভাব ফেলেছে। এ সম্পর্কে পরে স্বতন্ত্র আলোচনা সংযোজিত হয়েছে ।

লোককাহিনীতে ইসলামী ধর্মীয় উপদান সম্পর্কিত উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় ইসলাম প্রচারের শুরুতে লৌকিক পীরবাদ বিকশিত হয়নি। এটি পরের ঘটনা। তেমনি ধর্মরূপে ইসলাম গ্রহণ করার পরও হিন্দু ধর্মের কিছু কিছু বিশ্বাস ও সংস্কার মুসলমানদের মধ্যে থেকে গেছে। ঐসব অলৌকিক কাহিনী বুননের পেছনে এর প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না।

পূর্বোক্ত আলোচনায় দেখা যায় বাঙালির ধর্মবোধ নানা উৎসের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তেমন শাসকবর্গের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বার বার পরিবর্তিত হয়েছে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস। প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কালের সীমানা পর্যন্ত বাঙালির ধর্ম বিশ্বাস নিম্নলিখিত তিনটি ধাপে বিকশিত হয়েছে: (১) আদিকালের সর্বপ্রাণবাদী স্থানীয় ধর্মমতের বিকাশ এবং পরে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য: ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্যে এ পর্যায়টিকে আদিকাল থেকে খৃষ্টীয় দশম শতক পর্যন্ত বিস্তৃত বলে ধরা যায়। (২-ক). ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম বিস্তারের সূচনা-- দশম শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালি সমাজের অন্যতম প্রধান ধর্মমত হিসেবে বৌদ্ধ ধর্ম টিকে ছিলো বটে। কিন্তু গুপ্ত আমল থেকেই হিন্দু ধর্মের প্রসার আরম্ভ হয়। এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মের একচ্ছত্র আধিপত্য লোপ পেতে থাকে। শশাঙ্কের আমলে বৌদ্ধরা সংখ্যায় অনেক

[১] 'আলম সদাগর', *বাংলাদেশের লোককাহিনী* তৃতীয় খণ্ড , পূর্বোক্ত, পৃ-৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

হ্রাস পায়, হিন্দু জনসংখ্যা বাড়ে। বাঙালির ধর্মান্তরের এই পর্বটি বৌদ্ধ থেকে হিন্দু ধর্মে পরিবর্তনের কাল। (খ.) হিন্দু ধর্মের একচ্ছত্র আধিপত্য: সেন বংশীয় শাসনকালে বৌদ্ধ ধর্ম অতিদ্রুত নিতান্ত সংখ্যালঘুর ধর্মে পরিণত হয়। তাই প্রকৃতপক্ষে হিন্দু ধর্ম বিস্তারের মূল কালপর্বটি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত বলে ধরে নেয়া যায়। (৩-ক) ইসলাম প্রচারের সূচনা: ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতক জুড়ে বিস্তৃত এ কালটি মোটামুটি শ' দুয়েক বছর দীর্ঘ। এ পর্যায়ে হিন্দু ধর্ম ছেড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় (খ) বাঙালির অন্যতম প্রধান ধর্মমত হিসেবে ইসলামের প্রতিষ্ঠা- গবেষণায় দেখা গেছে বহুসংখ্যক লোককাহিনী পাত্র-পাত্রী থেকে শুরু করে পরিবেশ-উপকরণ পর্যন্ত মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে। এ ধরণের কাহিনীর উদ্ভব বাঙালির ধর্ম-চর্চার তৃতীয় পর্বে ঘটেছে বলে আন্দাজ করা যায়। আমদের ধারণা হিন্দু আমলে উদ্ভূত লোককাহিনীতে মুসলমান কথকের যথেচ্ছা পরিবর্তন এ পর্বেই সবচেয়ে বেশি সংঘটিত হয়ে থাকবে।

বাংলা লোককাহিনীতে বৌদ্ধ সহজিয়া ও অন্যান্য বৌদ্ধজাত ধর্মাবলম্বীদের বিরল উপস্থিতি রহস্যময়। বাংলা ভাষার উদ্ভবে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি এবং যাদের রচনায় (চর্যাপদ) পাওয়া গেছে প্রাচীন বাংলা ভাষার একমাত্র নিদর্শন তারা লোককাহিনী থেকে একেবারে যেন নির্বাসিত।

সম্ভবত সেনদের অত্যাচারে অনেক বৌদ্ধ ও বৌদ্ধজাত ধর্মের অনুসারীরা তিব্বতে পালিয়ে যাওয়ার পর অবশিষ্ট বৌদ্ধরা এখানে একেবারেই সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে। ক্রমে তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি লোপ পেতে থাকে। এবং তাদের সৃষ্ট লোককাহিনী আধুনিক কাল পর্যন্ত বহন করে নিয়ে আসার মত জনসংখ্যাও তখন হয়তো তাদের ছিলো না। এ কারণেই হয়তো লোককাহিনীতে সেই আদি বাঙালিরা অনুপস্থিত।

লোক সংস্কার

Folklore-এর পরিভাষায় কোনো একটি লোক সমাজের যুক্তিহীন বিশ্বাস এবং তার ভিত্তিতে সৃষ্ট আচার-ক্রিয়াদি— প্রথা, উৎসব, যাদু কর্মসূচী, চিকিৎসা বিদ্যা প্রভৃতিকে একত্রে লোকসংস্কার বলে। লোকসংস্কার কথাটি সাধারণত অশিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। কোন কোন ফোকলোরবিদ লোকসংস্কার-এর 'লোক' শব্দটির পরিধি আরো ব্যাপক বলে মনে করেন। কারণ লোকসংস্কার শুধু অশিক্ষিত নিরক্ষর সমাজের ব্যাপার নয়, আধুনিক সমাজের শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও সংস্কার কাজ করে। তাই লোক অর্থে জনসমাজকেই বুঝতে হবে।[১]

ফোকলোরের আলোচনায় লোকসংস্কার একটি শ্রেণী নির্দেশ করে। ড: মযহারুল ইসলাম ফোকলোরের উপাদান ও শ্রেণী বিন্যাসের আলোচনায় 'লোকাচার, বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠান ইত্যাদি কেন্দ্রিক ফোকলোর' শিরোনামে এ শ্রেণীর উপাদান নিয়ে আলোচনা করেছেন।[২] আব্দুল হাফিজের মতে "লোকবিশ্বাস লোকসংস্কারের ক্ষেত্রে একটি স্তর মাত্র। কারন লোকবিশ্বাসেও কোন বিশেষ বস্তু, ঘটনা বা মানসিক ক্রিয়ার স্বীকৃতি দেয়া হয়। অন্যদিকে, লোকবিশ্বাস যদি লোকসমাজের জীবনাচরণে কার্যকরী ভাবে প্রকাশ পায়, যদি তা ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানে রূপায়িত হয় তবে তা পরিণত হবে লোকসংস্কারে।"[৩]

কোন কোন পণ্ডিত লোকসংস্কারের আরেকটি দিক তুলে ধরেছেন। এক সমাজে যা লোক সংস্কার অন্য সমাজে হয়তো তা বিশুদ্ধ ধর্মীয় আচার। এ প্রসঙ্গে এইচ ক্রাপের ধারণা, সাধারণভাবে লোকসংস্কার অন্য সমাজের মানুষের বিশ্বাস ও আচার-ক্রিয়াদির সমষ্টিকে বোঝায়, যেহেতু তা আমাদের বিশ্বাস ও আচার-প্রথা থেকে ভিন্ন। (Superstition in

---

[১] আবদুল হাফিজ, *লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ-২।

[২] ড: মযহারুল ইসলাম, *ফোকলোর: পরিচিতি ও পঠন পাঠন*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫।

[৩] আবদুল হাফিজ, পর্বোক্ত, প-৬১।

Dhaka University Institutional Repository

common parlance, designates the sum beliefs and practises shared by other people in so far as they differ from our own.)[১]

সংস্কার শব্দটি এসেছে সংস্কৃত থেকে। এর সাধারণ অর্থ পরিশোধন, উন্নয়ন, ত্রুটি দূরীকরণ। এ ছাড়া সংস্কার বলতে এক প্রকার মানসিক ক্রিয়াদিও নির্দেশ করে যেমন প্রবণতা, ঝোঁক, ছাপ ইত্যাদি। আধুনিক জ্ঞানমতে সংস্কার হলো কোনো একটি কাজের বা মানসিক অবস্থার ফল স্বরূপ অন্য একটি ইতিবাচক অবস্থার উদ্ভব সম্পর্কে যুক্তিহীন বিশ্বাস দ্বারা তাড়িত হওয়া।

যেমন আমাদের মধ্যে বাচ্চাদের খাওয়ানোর সময় অন্যদের চোখের আড়ালে তা করার প্রবণতা আছে। এর পেছনে আছে এই বিশ্বাস যে, বাচ্চাদেরকে খাওয়ানোর সময় বাইরের লোক দেখে ফেললে বাচ্চার পেটের পীড়া হতে পারে বা তার কোনো অমঙ্গল হতে পারে। এটিই সংস্কার বা লোকসংস্কার।

আদি কালের মানুষেরা একদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, জীব জানোয়ারের আক্রমণ ও কালজনিত ক্ষয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নিরাপদ ও সমৃদ্ধ জীবন যাপনের জন্য নিজস্ব চিন্তাজাত কিছু বিশ্বাস এবং তার ভিত্তিতে কিছু ক্রিয়াকর্মের উদ্ভব ঘটায়। আবার জগত-জীবন সম্পর্কিত অসংখ্য প্রশ্নের জবাব না পেয়ে নিজেরাই কিছু ব্যাখ্যা সৃষ্টি করে। এসব ব্যাখ্যা ক্রমে তাদের সমাজের সমস্ত মানুষের সাধারণ বিশ্বাসে পরিণত হয়। এগুলো লোকসংস্কার।

প্রসঙ্গক্রমে একটি লোকসংস্কার নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সর্বপ্রাণবাদ অনুযায়ী মাটি, পানি বা ধানগাছেরও প্রাণ থাকতে হবে। এটি লোকবিশ্বাসে পরিণত হওয়ার পর প্রাচীন কালের মানুষ ভাবতে শুরু করলো যে মাটি, পানি ও ধান গাছকে স্তব করে ফলন বাড়ানো যেতে পারে। এই বিশ্বাসই হলো লোকবিশ্বাস এবং এ থেকে জন্ম নিলো একটি লোকসংস্কার। এর প্রক্রিয়াটি হলো ক্ষেতে ধানের চারা রোপণের সময় শেষ চারাটি রোপণ করার পর ক্ষেতের পানি হাতে নিয়ে ধান গাছের উপর ছিটিয়ে দিতে দিতে বলতে হয়:

"হাত ধুইয়া দিলাম পানি।
ধান হয় যেন শ' মণ খানি ॥ (নেত্রকোনা এলাকায় প্রচলিত এই সংস্কার-মূলক ছড়াটি গবেষক তার বাবার নিকট থেকে শুনেছেন।)

এ কাজটি করলে ধানের ফলন বৃদ্ধি পাবে বলেই বিশ্বাস করা হয়।

অনেকে লোকসংস্কার ও কুসংস্কারের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।আবদুল হাফিজের মতে কোনো একটি লোকসংস্কার কোনো সমাজে অপ্রচলিত হয়ে গেলে তাকে কুসংস্কার বলে আখ্যায়িত করা হয়।

লোকসংস্কারের উৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো পরিষ্কার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। জর্জ জেমস ফ্রেজার, ইবি টাইলর, ল্যাঙ প্রমুখ এ বিষয়ে প্রভূত গবেষণা করেছেন। পরবর্তীতে নৃতত্ত্বের আলোকে লোকসংস্কারের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চালান মেলিনোভস্কি, ফ্রাঞ্জ বোয়াস, রুথ বেনিডিক্ট প্রমুখ। তবে এখন পর্যন্ত ফ্রেজার-টাইলরের আলোচনা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত।

টাইলরের মতে লোকসংস্কারের উদ্ভবের মূলে আছে সর্বপ্রাণবাদ অর্থাৎ এ ধারণা যে মানুষের এবং প্রকৃতির সমস্ত কিছুরই আত্মা আছে, বাকশক্তি ইত্যাদি আছে। সর্বপ্রাণবাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, এ ধারনা অনুযায়ী প্রতিটি প্রাকৃতিক ঘটনা, অসুখ-বিসুখ, মৃত্যু প্রভৃতির পেছনে এক একজন দেবতায় বিশ্বাস করার পর সে সব দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন আচার-ক্রিয়াদির উদ্ভব হয়। টাইলর মনে করেন এভাবেই লোকসংস্কারের অন্যতম শাখা যাদুবিদ্যার উৎপত্তি। যেমন না-ধর্মী সদৃশ যাদু বিদ্যার একটি উদাহরণ হলো সন্ধ্যা বেলা ভুত প্রেত বের হয় বলে এ সময় ছোটো বাচ্চাদের কোলে নিয়ে বাইরে না যাওয়া।

---

[১] দ্রঃ Al exander H. Krappe, *The Science of Folklore*, Mecnen and Co. Ltd. ,1965.

Dhaka University Institutional Repository

লোকসংস্কারের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। আবুল হাসনাতের মতে লোকবিশ্বাস, লোকপ্রথা, লোকউৎসব, লোকাচার, শিষ্টাচার বিনিময়, মানব সম্পর্ক, যাদুবিদ্যাগত কর্মসূচী, লোকচিকিৎসাবিধি সবই লোকসংস্কার।

পৃথিবীর প্রতিটি লোককাহিনীই লোকসংস্কার বিশেষ করে যাদুবিদ্যাগত উপাদান, বিধিনিষেধ, ব্রতাচার, লোকবিশ্বাস প্রভৃতি উপাদানে ভরপুর। বাংলা লোককাহিনীতেও এ ধরণের উপাদানের প্রাচুর্য লক্ষ্য করি। সব ধরনের লোককাহিনীতেই আছে বাঙালি সমাজের নানান সংস্কারের পরিচয়। তবে পুরাণ কাহিনী, রূপকাহিনী, ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী, রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রভৃতিতে বাঙালির লোকসংস্কারের পরিচয় সবচেয়ে বেশি। বাংলা লোককাহিনীতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাঙালির লোকসংস্কারকে (ক) যাদুবিদ্যা (খ) দৈত্য-পরী-রাক্ষস ও বিদেহী আত্মায় বিশ্বাস (গ) ভবিষ্যত দর্শন ও (ঘ) চিকিৎসাবিদ্যা—এই চারটি উপ-শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে।

(ক) যাদু বিদ্যা

অতীন্দ্রিয় শক্তিকে আয়ত্ত করে তার দ্বারা কোন কিছু লাভ করার প্রক্রিয়া ও নিয়ম-পদ্ধতিকে যাদুবিদ্যা বলা যায়। যাদুবিদ্যা লোকসংস্কারের প্রধানতম অঙ্গ। যাদুর ইংরেজী প্রতিশব্দ Magic এর মূল ফার্সী Magi শব্দটি সাধারণ অর্থে প্রাচীন কালের জ্ঞানী ব্যক্তিদের বোঝায়। Magi'রা পুরোহিত শ্রেণীর, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং অতিন্দ্রীয় শক্তিকে তুষ্ট করার মতো বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরবর্তী কালে এদের আচার-ক্রিয়াকর্মকে গ্রীকরা Magic নামে অভিহিত করে। ইংরেজীতে Magic শব্দটি যাদু বোঝায়।

Standard Dictionary of Folklore-এ বলা হয়েছে যাদু বিদ্যা হলো "অতীন্দ্রীয়কে বশ করার এবং অতীন্দ্রিয় উপায়ে প্রকৃতিকে বশ করার কলা-কৌশল।" ("The art of Compulsion of the Supernatural; also, the art of controlling nature by supernatural means".[১]

ফ্রেজার বলেন মানুষের যে বিশ্বাস ও চিন্তাধারায় যাদুবিদ্যার উদ্ভব তা বিশ্লেষণ করলে উপলব্ধি করা যায় যাদুবিদ্যার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দুটো মৌলনীতির উপর। (1) Law of Similarity --সদৃশ ঘটনা সদৃশ ফল উৎপাদন করে(Like Produces Like); 2) Law of Contact or Contagin --পরস্পর সম্পৃক্ত বস্তু বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল থাকে (things which have once been in contact with each other continue to act on each other at a distance after the physical contact has been severed)।[২] এ দুটি মূলনীতি থেকে ফ্রেজার সিদ্ধান্ত করেন যাদু বিধান দুরকম :

১. **সদৃশ যাদু বিধান** : যাদুবিদ্যার এ বিধান অনুযায়ী কোন ঘটনা ঘটাবার জন্য বা আকাঙ্ক্ষা পুরনের জন্য আকাঙ্ক্ষিত বাস্তবের অনুকরণ করা হয়। যেমন, নির্দিষ্ট যাদু কর্মসূচী অনুযায়ী কোন শত্রুর মূর্তি বানিয়ে সেই মূর্তিকে আঘাত করলে শত্রু নিহত হবে। ফ্রেজারের মতে সকল তাবিজ কবজ সদৃশ যাদু বিধান অনুযায়ী তৈরি করা হয়।

২. **সংক্রামক বিধান** : এ বিধান অনুযায়ী যার উপর যাদুটি প্রয়োগ করা হবে তার ব্যবহৃত কোন কিছু বা তার সংস্পর্শে এসেছে এমন কোন কিছুর উপর যাদুটি প্রয়োগ করলে আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হবে। যেমন আমাদের দেশে এমন বিশ্বাস এখনো দেখা যায় যে, কুমারী মেয়ের চুল এনে তাতে যাদু করলে মেয়েটি যাদুকরের প্রণয়ে উন্মাদ হয়ে ছুটে আসবে।

---

[১] *Standard Dictionary of Folklore, 'Mythology and Legands'*, Ed. Maria Leach, Funk and Wgnal, NY, p-660.

[২] James George Frazer. *The Golden Bough*. Macmillan and Co ltd., London, 1950, p-11.

Dhaka University Institutional Repository

ফ্রেজার বলেন যে, যাদু শুধুই [illegible] ফসল বৃদ্ধি , সুস্বাস্থ্য অর্জন প্রভৃতি উদ্দেশ্য পুরণের জন্যও এর প্রয়োগ আছে । তিনি দেখান যে, সদৃশ যাদু বিধানের কতগুলো হাঁ-ধর্মী, কতগুলো না-ধর্মী। তাবিজ, কবজ ইত্যাদি হাঁ-ধর্মী সদৃশ যাদুর উদাহরণ। আবার অমঙ্গল এড়ানোর জন্য কিছু কিছু কাজ বা আচরণ না করার নির্দেশ যেখানে আছে তা না-ধর্মী সদৃশ যাদু বিধানের দৃষ্টান্ত। যেমন-উল্টোদিকে ঘর ঝাড়ু দেয়া মানা (এতে নাকি ভাগ্নে-ভাগ্নীদের আঙ্গুলের নখের গোড়া থেকে উল্টো চামড়া উঠে)। বিধি-নিষেধ যাদু বিদ্যাগত আবার ধর্মীয়ও হতে পারে। যাদুবিদ্যাগত বিধিনিষেধই না-ধর্মী সদৃশ যাদু বিধানের নজির।

বিস্তারিত ব্যাখ্যার পর ফ্রেজারের যাদুবিদ্যা বিষয়ক সিদ্ধান্ত কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে নিম্নরূপে বিন্যস্ত হয় :

১. তত্ত্বগত যাদুবিদ্যা
২. ফলিত যাদুবিদ্যা: (ক) হাঁ-ধর্মী যাদুবিদ্যা বা তেলেসমাতী (Sorcery) (খ) না-ধর্মী যাদুবিদ্যা বা বিধিনিষেধ (Taboo)।

ফ্রেজারের আলোচনার সার কথা হলো যাদুবিদ্যা একটি ভুয়া বিজ্ঞান ও ব্যর্থ শিল্প। (In short Magic is spurious system of natural law as fallacious guide of conduct; It is a false science as well as abortive art).[১]

পরবর্তীতে সমাজতত্ত্ব ও নৃ-তত্ত্বের আলোকে যাদুবিদ্যাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেকে ফ্রেজারের মতামতের বিরোধিতা করেন। মেলিনোভস্কি ফ্রেজারের মতবাদ খারিজ করে দিয়ে বলেন যে, যাদুবিদ্যা বিজ্ঞান নয় এবং মেকিও নয়। আদিম মানুষ নিজের শক্তি, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে কাজ করতো, যাদু দিয়ে নয়। যাদু ছিলো তাদের উদ্দীপণার উৎস, আত্ম-বিশ্বাসের মন্ত্র।

রুথ বেনেডিক্ট যাদুবিদ্যার পরোক্ষ কার্যকারিতাকে আরো বিস্তৃত করে মন্তব্য করেন:

"মানসিক ভাবাবেগ মুক্তির কার্যকর পন্থা হিসাবে যাদুবিদ্যাকে মানুষের মূল্যবান অবলম্বন মনে করা হয়। যুক্তি দেয়া হয় এটি (যাদুবিদ্যা)বিপদজনক অবদমন প্রতিহত করে সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষা করে। " (Magic has also been held to be a valuable human support as an effective emotional release, it is argued that it has prevented dangerous repression and made for the health of the social body."[2]

ফ্রেজারের সমালোচনা কতটা সঠিক তা যাচাই না করেও বলা যায় তার সমালোচকরা যাদুবিদ্যার অনেক নতুন দিক উন্মোচন করে বিষয়টি সমৃদ্ধ করেছেন। তবে মেলিনোভস্কি, ফ্রাঞ্জ বোয়াস, রুথ বেনেডিক্টসহ অনেকে যাদুবিদ্যা সম্পর্কে ফ্রেজারের মতবাদের বিরোধিতা করলেও তারা নতুন কোন সম্ভাষজনক ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে পারেননি। যাদুবিদ্যা সম্পর্কে টাইলর-ফ্রেজারের আলোচনাই এখন পর্যন্ত অধিকাংশ ফোকলোরবিদের প্রধানতম সম্বল।

বর্তমান গবেষণায় ফ্রেজার-টাইলরের মতামতকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং ফ্রেজারকৃত শ্রেণীবিন্যাস মেনে বাংলা লোককাহিনীর যাদুবিদ্যা বিষয়ক তথ্যাদি বিন্যস্ত করা হয়েছে ।

যাদুবিদ্যার উৎপত্তিকাল সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা কঠিন। ভারতে যাদুবিদ্যা প্রায় চার হাজার বছর পুরানো বিষয়। ঋকবেদে যাদুবিদ্যার উল্লেখ আছে। প্রাচীন মিশর, এসিরিয়া ও মেসোপটমিয়ার পুরাণে দেখা যায় সেখানে যাদুবিদ্যার ব্যবহার ছিলো। বাঙালি সমাজেও যাদুবিদ্যা প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ছিলো বলে আন্দাজ করা যায়।

---

[১] Jorge James Frazer, *The Golden Bough*, ibid P-11)

[২] *Encyclopaedia of the Social Sciences*, Vol-10, The Macmillan and Co. Ltd. 1951, P-43.

Dhaka University Institutional Repository

সব ধরনের লোককাহিনীতে যাদুবিদ্যার উপাদান বর্তমান। রূপকাহিনী, রোমাঞ্চকাহিনী, কিংবদন্তী ইত্যাদিতে যাদুবিদ্যাগত উপাদান সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে পশুপক্ষীর কাহিনী, নীতিকাহিনী, হাস্যরসাত্মক কাহিনীতে যাদুবিদ্যাগত উপাদান নেই বললেই চলে। বিভিন্ন লোককাহিনীতে প্রাপ্ত যাদুবিদ্যা কর্মসূচীতে ব্যবহৃত বস্তু-উপাদানেও ভিন্নতা দেখা যায়। বাংলা লোকাহিনীতে প্রাপ্ত যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ :

হ্যাঁ-ধর্মী সদৃশ যাদু বিধান :

(ক) প্রতিমূর্তিতে মূল গুণ বা প্রাণসঞ্চার—কোন কিছুর প্রতিমূর্তি বানানোর পর যাদুবলে তাতে মূল বস্তুটির গুণ বা প্রাণ সঞ্চার হওয়ার ঘটনা সম্পর্কিত বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে কিছু কাহিনীতে। যেমন:

১. কাগজের অন্ধ বাঘ অঙ্কন। পরে চোখ আঁকার সাথে সাথে তার জীবন প্রাপ্তি। (কাজফল বাদশাহ, *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী*, দ্বিতীয় খণ্ড)

২. 'দেও'-প্রদত্ত কাঠের ঘোড়ার জীবন লাভ (রূপের মনোহর, *বাংলাদেশের লোককাহিনী* তৃতীয় খণ্ড)

৩. মাটির গুলিতে রসগোল্লার স্বাদ (গোলাম আলির দরগা, *কিংবদন্তির বাংলা*)

৪. মাটিতে পিঠা রোপণ করার পর পিঠাগাছের জন্ম ও পিঠাফল দান (বুড়ি ও জোলার পিঠাগাছ, *বাংলাদেশের লোককাহিনী* প্রথমখণ্ড)

৫. কাগজের ঘুড্ডিতে সতী মায়ের পুত্র ধরলে মানুষ হয়ে আকাশে উড়ে যায় (একতোলা কন্যার কিস্‌সা, বাংলা একাডেমীর *লোক-সাহিত্য সংকলন* তৃতীয় খণ্ড)

৬. রাজপুত্র কাগজের ময়ূর বানিয়ে তাতে চড়ে রাজকন্যার সাথে দেখা করতে যায় (পূর্বোক্ত)

(খ) কোন জীবজন্তুর দেহে দৈত্য-দানবের প্রাণ সংরক্ষণ; জীবটিকে মারলে দৈত্যও মৃত্যুবরণ করবে: দৈত্য বা রাক্ষসের প্রতিটি কাহিনীতেই এই যাদুটির প্রায়োগ দেখা যায়: যেমন, *কিশোরগঞ্জের* লোককাহিনী দ্বিতীয় খণ্ডের 'সুফিয়ানী বাদশা', 'শাহশান বাদশা', *বাংলাদেশের লোককাহিনী* তৃতীয় খণ্ডের 'আয়নামতি', *পূর্ব-পাকিস্তানী লোককাহিনীর* 'বানর বাদশা' ইত্যাদিতে। প্রতিটি কাহিনীতেই রাক্ষসের প্রাণ ভ্রমরের দেহে রক্ষিত। তবে ভ্রমরটি কোথায় পানির নিচে সোনার কৌটায়, কোথাও বা সরিষার ভেতর রক্ত চন্দন কাঠের বাক্সে থাকে।

(গ) যাদুর পরিবহন : এক্ষেত্রে দেখা যায় বহনকারী জন্তু বা যানবাহনটিই যাদুর যানবাহন। তার গতিবেগ অকল্পনীয়। যেমন- *ঢাকার লোককাহিনীর* 'চূড়ামণির কিস্‌সা'র প্রথম খণ্ডে পবনের নৌকা, ষষ্ঠ খণ্ডে পঙ্খীরাজ ঘোড়া, *বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি: কথকতা'র* 'বাওন রাজা'য় কাঠের খড়ম, বাংলা একাডেমীর ফোকলোর সংকলন-৭১-এ সোয়াহাত লম্বা খাট, *বাংলাদেশের লোককাহিনী* তৃতীয় খণ্ডের 'রূপের মনোহর'-এর বৈলারানী ঘোড়া, *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী দ্বিতীয়* খণ্ডের 'সোনাফর বাদশা' কাহিনীর গরুড় পাখি; এবং লোককাহিনীর সকল পরীদের ব্যবহৃত যান 'রথ' এ ধরনের যাদুর বাহন।

(ঘ) শিথানে পৈতানে দুই যাদুবস্তু দিয়ে অজ্ঞানকরণ, বস্তু দুটি পাল্টালে জ্ঞানলাভ: এই যাদুটিও বাংলা লোককাহিনীতে প্রচুর ব্যবহৃত। সাধারণত রাক্ষস ও দৈত্যরা এই যাদুটি প্রয়োগ করে সুন্দরী রমনীদের আটকে রাখে। ব্যবহৃত যাদুবস্তুগুলো হলো সোনার কাঠি ও রূপোর কাঠি, ছোটো পাথর বড় পাথর, গোলাপ ও চম্পা ফুল, পানিভর্তি বালতি ও থালা।

(ঙ) মন্ত্রপুত ফল বা খাবার খেয়ে গর্ভ-ধারণ : এখনো গ্রাম বাংলায় এই যাদুটির প্রয়োগ আছে। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'চিঙ্গিজান বাদশা', 'কাজফল বাদশা', *ঠাকুরদাদার ঝুলি'র* মালঞ্চমালা, *শিরনী'র* মধুমালার কেচ্ছা, *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* প্রথম খণ্ডের 'তাম্বুল তরাসিনীতে' এ যাদু বিদ্যার প্রয়োগের মাধ্যমে সন্তান লাভের কথা জানা যায়।

(চ) দেহ বদলের মন্ত্র : এক দেহ থেকে অন্য দেহে আত্মার স্থানান্তর। এ ক্ষেত্রে আত্মা যে দেহে স্থানান্তরির হবে সেটি মৃত দেহ অর্থাৎ আত্মাশূন্য হতে হবে। *ঢাকার লোককাহিনীর* 'চূড়ামণির কিস্‌সা'-৫ম খণ্ড, *বাংলা একাডেমীর লোক-সাহিত্য সংকলন* ৪২ খণ্ডের 'তোতাপাখির কিস্‌সা', *ভাটিদেশের কিংবদন্তী'র* 'নদের চাঁদের

Dhaka University Institutional Repository

ঘাট' প্রভৃতি কাহিনীতে এই যাদুটির প্রয়োগ দেখা যায়। এমনও হতে পারে শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য কিংবা কোন সুবিধা আদায়ের জন্য লোককাহিনীর চরিত্রটি বিভিন্ন রূপ ধারন করছে। যেমন *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনীর* দ্বিতীয় খণ্ডের 'মদন সাধু' কাহিনীর মদন সাধুকে মালিনী ফুল, ভোমরা ও পোনা মাছ বানিয়ে হারমাদদের আক্রমণ থেকে রক্ষার চেষ্টা করে। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* তৃতীয় খণ্ডের 'সন্দি'তে সৎমা কর্তৃক সতীনকন্যা খুন হওয়ার পরও লেবুগাছ, বেলগাছ এবং শাপলা ফুল হয়ে সৎমার হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করে।

না ধর্মী সদৃশ যাদু বিধান বা বিধি-নিষেধ (Taboo)

না-ধর্মী সদৃশ যাদু বিধানে কোন মন্ত্রপুত বস্তু বা মন্ত্রের ভূমিকা নেই। এখানে কিছু কাজ থেকে বিরত থাকার মধ্য দিয়েই যাদু কর্মসূচীটি পালিত হয়। কাজটি করা হলে অমঙ্গল অবধারিত। তাই এই কাজটি নিষিদ্ধ বা ট্যাবু (Taboo)। যেমন আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে যাত্রাকালে কেউ হাঁচি দিলে বাধা বলে গণ্য করা হয়। অমঙ্গল এড়ানোর জন্য তখন না যাওয়া ভালো। তবে বিধি-নিষেধ ধর্মীয়ও হতে পারে। লোককাহিনীতে না-ধর্মী সদৃশ যাদু বিধানের দৃষ্টান্ত কম। নিচে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

১. শিশুর জন্মের পর ১২ বছর বা সাত বছর বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাকে মাটির নিচে রাখতে হবে যাতে পৃথিবী না দেখে; দেখলে দু:খ বা মৃত্যু: *বাংলাদেশের লোককাহিনী* তৃতীয় খণ্ডের 'রূপের মনোহর', *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'চিঙ্গিজান বাদশা' কাহিনীতে এর উল্লেখ আছে।

২. বিয়ের বছরে বানিজ্য যাত্রা নিষেধ : *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'মদন সাধু' ও *বাংলাদেশের লোককাহিনী* তৃতীয় খণ্ডের 'আলম সদাগর' কাহিনীতে উল্লেখ পাওয়া যায়।

৩. যাত্রাকালে পরিধানের পোষাকে পা পরা, হাঁচি শোনা ও শশ্মানগামী শব দেখলে যাওয়া উচিত নয়: এই না-ধর্মী সদৃশ যাদু বিধানটি একমাত্র *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'মদন সাধু' কাহিনীতে পাওয়া গেছে।

৪. সকালে নি:সন্তান লোকের (আঁটকুঁড়া বাদশার) মুখ দেখলে সংসারে উন্নতি হয় না: এটি এখনো বাংলাদেশের কোন কোন এলাকায় মানা হয়। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'কাজফল বাদশা'য় এর প্রয়োগ দেখা যায়।

৫. ঘনিষ্ঠ কারো বিপদের কথা জানলেও বিপদ্রগ্রস্ত লোকটির কাছে তা প্রকাশ করা যাবে না; যে প্রকাশ করবে সে মারা যাবে কিংবা পাথর হয়ে যাবে: *বাংলাদেশের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'অকুল বকুলের' নবম উপ-কাহিনীতে উজিরপুত্র ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীর কথপোকথন থেকে জানতে পারে রাজপুত্রের বিপদ এবং তা কাউকে বললে সে পাথর হয়ে যাবে। কিন্তু উজিরপুত্র নির্দেশমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করে রাজপুত্রকে রক্ষা করেও মূল ঘটনা বলতে বাধ্য হয়। ফলে সে পাথর হয়ে যায়। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* প্রথম খণ্ডের 'কুঁচবরণ কন্যা' কাহিনীতে দেখা যায় উজিরপুত্র বেঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর কথাবার্তা থেকে বিপদের কথা জেনে সাপ হত্যা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজপুত্রকে বলতে বাধ্য হয় এবং সে পাথরে পরিণত হয়।

৬. নির্দিষ্ট দিকে যাওয়া বারণ :নির্দিষ্ট একটি দিকে অগ্রসর হলে বিপদ আসতে পারে বলেই বিপদ এড়ানোর জন্য এই যাদু বিধান। যেমন *পূর্ব-পাকিস্তানের লোককাহিনীর* 'বানর বাদশা'য় দেখা যায় রাজকন্যা নায়ককে পূর্ব দিকে যেতে মানা করলেও নায়ক তা অগ্রাহ্য করে পূর্ব দিকে যায় এবং বিপদে পড়ে।

সংক্রামক যাদু বিধান

১. মন্ত্রবলে মৃতকে পুনর্জীবিত করা বা মৃত প্রাণীর হাড় থেকে প্রাণীর জীবনদান : প্রথমোক্ত যাদুর ক্ষেত্রে মৃত মানুষটির উপর মন্ত্রপুত পানি বা অন্য কিছু চিটিয়ে দিয়ে তাকে জীবিত করা হয়। যেমন *ঢাকার লোককাহিনীর* 'চূড়ামণি কিস্‌সা'র সপ্তম খণ্ডে দেখা যায় দরবেশের মন্ত্রপুত পানি চিটিয়ে শির-কাটা রাজপুত্রকে জীবিত করা হয়, *বাংলা একাডেমীর লোক সাহিত্য সংকলন*-৪২শ খণ্ডের 'বক রাজার হাস্তোর'-এ যোগী বক-কন্যা কর্তৃক ভস্মীভূত মনির দেহাবশেষ থেকে মন্ত্র বলে মনিকে পুনরায় জীবিত করেছেন। দ্বিতীয়োক্ত যাদুর প্রক্রিয়াটি

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে মৃত মানুষ বা জন্তু জানোয়ারের হাড়ের উপর একজন মন্ত্র পড়লে কঙ্কালটি তৈরি হবে। দ্বিতীয় জনের মন্ত্রে হাড়মাংস এবং তৃতীয় জনের মন্ত্রে সঞ্চারিত হবে প্রাণ। সাধারণত লোককাহিনীতে দেখা গেছে যাদুর তিন পর্যায়ের মন্ত্র তিন জনের জানা---একজন সম্পূর্ণ মন্ত্রটি জানে না। বাংলা লোককাহিনীতে এটিও একটি জনপ্রিয় যাদু। *বাংলা একাডেমীর ফোকলোর সংকলন*-৭১-এর 'রাজা-উজির-কোতোয়াল-নাজিরের পুত্রের কিস্‌সা'য়, *ঢাকার লোককাহিনী* 'চূড়ামণির কিস্‌সা' ৪র্থ খণ্ডসহ অনেক কাহিনীতে এই যাদু কর্মসূচীটি আছে।

২. <u>চুল বা আঁইশ আগুনে ধরলে ঐ বস্তুর মালিক অলৌকিক শক্তির দেও দানোর উপস্থিতি</u>: এই সংক্রামক যাদু বিধানটির নীতিটি হলো দেও-এর চুল বা অজগরের আঁইশ আগুনে ধরলে তারা সংক্রামক যাদুবিধান অনুযায়ী টের পেয়ে সাহায্যার্থে ছুটে আসে। যেমন *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'মদন সাধু' গল্পে জানা যায় সমলা মদন সাধুকে যে অলৌকিক চুল দেয় তা আগুনের কাছে ধরলে চুলের অধীনস্থ নয়লক্ষ দেও সাহায্য করার জন্য ছুটে আসে। একই গ্রন্থের 'শাহশান বাদশা' কাহিনীতে আছে অজগরের আঁইশের ব্যবহার।

৩. <u>কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত বস্তু থেকে ঐ ব্যক্তির ভালো মন্দ জানা</u>: *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনীর* 'সোনাফর বাদশা'য় সোনাফর বানিজ্য যাত্রার প্রাক্কালে স্ত্রী অতুলার মন্দিরের সামনে একটি গাছ লাগিয়ে বলে গাছটির ভালো মন্দত্ব দেখে তার অবস্থা জানা যাবে। একই গ্রন্থের 'বারিবীর রাজপুত্র সুবোধ কুমারের কিস্‌সা'য় দেখা যায় উদয়মালা তার পুত্রকে একটি ঘটি দিয়ে বলে যে ঘটিতে তার মুখ দেখা গেলে বুঝতে হবে সে ভালো আছে। যখন ঘটিতে তার মুখ আর দেখা যাবে না তখন ধরে নিতে হবে রাক্ষসী তাকে খেয়ে ফেলেছে।

বাংলা লোককাহিনীতে অনেক যাদুবিধান ও যাদু বস্তুর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যাদুর প্রক্রিয়া কাহিনীতে বর্ণিত না হওয়ার কারনে মূল যাদু-কর্মসূচীটি কিভাবে পালিত হয়েছে তা জানা যায় না। আমরা শুধু যাদু বস্তু ও তার প্রায়োগিক ফলাফল জানতে পারি। এ জন্য এসব যাদু ও যাদু বস্তুকে আলাদাভাবে আলোচনা করা হলো।

<u>বশীকরণ</u> : এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যাদুকর/যাদুকরণী তার আকাঙ্খিত মানুষকে পাওয়ার জন্য তার উপর যাদু প্রয়োগ করে তাকে বশ করছে। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'ফালিদ বাদশা' কাহিনীতে ফালিদকে মালিনী-কন্যা কর্তৃক ৩৬০ টি যাদুর মাধ্যমে বশ করার ঘটনা, *বাংলাদেশের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'তুলাল বাশ্‌শা' কাহিনীতে মালিনী কর্তৃক যাদুর মাধ্যমে তুলাল বাদশাকে বশীকরণ এ ধরনের যাদুর দৃষ্টান্ত।

<u>যাদু বস্তু</u> : বাংলা লোককাহিনীতে কিছু আশ্চর্য বস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায় যা দিয়ে অলৌকিক কাজ করা যায়। যেমন, *পূর্ব-পাকিস্তানী লোককাহিনীর* 'আনজান আরার কিস্‌সা'য় শত্রু নিধনের জন্য অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন তীর-ধনুক ও নদী পার হওয়ার জন্য তরবারী এবং 'অজগর ও রাখাল রাজা' কাহিনীতে টাকার থলের সংস্পর্শে প্রাসাদ নির্মাণ, *বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি: কথকতা*'র 'বাওন রাজা' কাহিনীতে আকাঙ্ক্ষামত খাবার-দাবার পাওয়ার জন্য যাদুর পুতুল, *যশোরের লোককাহিনীর* 'আব্দুল্লাহ বাদশা'য় থলে, বাঁশি ও ঝাঁপির প্রসঙ্গ, *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনীর* দ্বিতীয় খণ্ডের 'ফৈলন খা ও হরণ শুনাই'-এ যুদ্ধ জয়ের জন্য সোলেমানী তাজ ও দেও বশীকরণের জন্য যাদুর আংটি, *বাংলাদেশের লোককাহিনী* তৃতীয় খণ্ডের 'আলম সদাগর'-এ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভের জন্য সিদ্ধির ঝোলার ব্যবহার এ শ্রেণীর যাদুর দৃষ্টান্ত।

বাংলা লোককাহিনীতে অলৌকিক যাদু বস্তু ছাড়া নায়ক যেন অচল। প্রায় প্রতিটি রূপ কাহিনীতে ও রোমাঞ্চ কাহিনীতে যাদু বস্তু থাকবেই। এসব দৃষ্টান্ত থেকে উপলব্ধি করা যায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালি সমাজে অলৌকিক যাদু বস্তুর বিশ্বাস ভালোভাবেই শিকড় গেড়েছিলো।

যাদুর বৃক্ষ ও প্রাণী: *বাংলা একাডেমীর ফোকলোর সংকলন*-৭১-এর 'গণেশের চাতুরীর কিস্‌সা'য় জানা যায় দ্রুত পরিবহণে সক্ষম গাছ, *পূর্ব-পাকিস্তানী লোককাহিনী*'র 'বানর বাদশা'য় আঁটি ফেলামাত্রা গাছ জন্মে ও ফল ধরে এমন আম গাছ ও বড়ই গাছ, *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'চিঙ্গিজান বাদশা'য় সোনার পাখি যা গা ঝাড়লেই সোনা ঝরে পড়ে, *ঢাকার লোককাহিনীর* 'চূড়ামণির কিস্‌সা' প্রথম খণ্ডে জ্ঞানলাভের জন্য জ্ঞানবৃক্ষের পাতা, 'চূড়ামণির কিস্‌সা'-৪র্থ খণ্ডে শত্রু ধ্বংসের জন্য অব্যর্থ যাদুর তীর ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

এ ছাড়া ব্ল্যাক ম্যাজিক বা ধ্বংসাত্মক যাদুবিদ্যার প্রয়োগও পাওয়া গেছে। আব্দুল হাফিজ তেলেসমাতিকে ব্ল্যাক ম্যাজিকের একটি শাখা হিসেব বর্ণনা করেছেন । *ঢাকার লোককাহিনীর* "চূড়ামণির কিস্‌সা'র -তৃতীয় খণ্ডে সন্ন্যাসী কর্তৃক রাজার কান গাধার কানে রূপান্তর এবং ৪র্থ খণ্ডে রাজকন্যা হরণের জন্য যাদুকরনীর নাতিদ্বয়ের সাপ, পাখি ও ঘোড়ার রূপ ধারণ, *কিংবদন্তীর বাংলা*'য় 'ডাকাতমারীর বিল'-এ সন্ন্যাসী কর্তৃক সকল ডাকাতকে বৃক্ষে রূপান্তর, *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনীর দ্বিতীয় খণ্ডে* 'কাজফল বাদশা'য় পরী কর্তৃক কাজফলকে গলার হার বানিয়ে আটক রাখার অলৌকিক ঘটনা ব্ল্যাক ম্যাজিকের শ্রেণীতে পড়ে।

বাংলা লোককাহিনীতে যাদুর ছড়াছড়ি দেখে মনে হয় প্রচীন ও মধ্যযুগে বাঙালি সমাজে যাদুবিদ্যার চর্চা করা হতো। আশ্চর্যের বিষয় চাষাভূষাদের কাহিনী যেমন, অধিকাংশ হাস্য রসাত্মক কাহিনীতে যাদুবিদ্যা প্রায় অনুপস্থিত। অথচ এরাই কাহিনী বুনন করে যুগের পর যুগ তা পরিবেশন করে লোককাহিনীর সমৃদ্ধ ফসল টিকিয়ে রেখেছে। সম্ভবত যাদুবিদ্যা সর্বসাধারণের বিষয় ছিলো না, শধু সিদ্ধ ব্যক্তি বা গুণী-ওঝারা যাদুর ব্যবহার জানতো। তেমনি দরিদ্র মানুষের তুলনায় স্বচ্ছল অথবা ধনী ব্যক্তিরাই বেশি যাদুর প্রয়োগ করতো। অর্থ, সুন্দরী নারী, ক্ষমতা লাভের জন্য যাদু হয়তা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন বলে মনে হয়েছিলো।

(খ) দৈত্য-পরী-রাক্ষস ও বেদেহী আত্মায় বিশ্বাস

প্রাচীন বাঙালি সমাজের লোক-সংস্কারে দৈত্য, রাক্ষস, পরী, ভূত-প্রেত ও প্রেতাত্মার বিশ্বাস একটি বড় স্থান দখল করে আছে । বাংলা রূপকথা মানেই পরী, দৈত্যদানব আর রাক্ষসের ছড়াছড়ি, তাদের সাথে নায়কের যুদ্ধ, রাক্ষস হত্যা এবং নায়িকাসহ প্রত্যাবর্তন। এ শ্রেণীর লোকসংস্কারকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায় :

নৈর্ব্যক্তিক শক্তি : দৈত্য, রাক্ষস, পরী, ভুত-পেত্নীকে এ বিভাগের অন্তর্ভূক্ত করতে পারি। এদের মধ্যে পরীদের কাহিনী অথবা পরী এবং মানুষের কাহিনী অনেক। বস্তুত বাংলা লোককাহিনীতে পরীদের সহজ যাতায়াতের কারনে এদেরকে কখনো কখনো মানুষ বলে ভুল হয়। মানুষের মতই এদের মধ্যেও স্নেহ-মমতা, আদব-ভদ্রতা, বুদ্ধি ও বিবেকের যথাযথ সমন্বয়। বাংলা লোককাহিনীর পরীদের দুটো বৈশিষ্ট প্রধান- (১) এরা মানুষের সাথে প্রেমের সম্পর্কে সম্পর্কিত, (২) এদের কর্মকাণ্ড কদাচিত মানুষের জন্য ক্ষতিকর। *পূর্ব-পাকিস্তানী লোককাহিনীর* 'আনজান আরার কিস্‌সা', *যশোরের লোককাহিনীর* 'আব্দুল্লাহ বাদশা' *কিংবদন্তির বাংলার* 'পরী সংবাদ', *ঢাকার লোকাহিনীর* 'রাজকুমার সফর চান ও সোবুজ নিশা পরীর কিস্‌সা', *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'সুফিয়ানী বাদশা', *বরিশাল জেলার লোকসাহিত্যের* 'নকীব রাফেজা ও পরীকন্যার কিস্‌সা',*শিরনী গ্রন্থের* 'মধুমালার কেচ্ছা'সহ সহ ৩৮টি লোককাহিনী বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে অধিকাংশ কাহিনীতে পরীর সাথে মানুষের প্রেম এবং মানুষের সাহায্যার্থে পরীর ভূমিকা প্রধান উপজীব্য। কিছু কিছু কাহিনীতে দেখা যায় মানুষ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভের জন্য পরীর দ্বারস্থ হয়েছে এবং পরীর দয়ায় সে প্রার্থিত বস্তু বা মানুষটিকে লাভ করেছে। এজন্য বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে এখনো 'পরী হাসেল' করার কথা শোনা যায়। বিয়ে, মামলা নিষ্পত্তি, রোগমুক্তি প্রভৃতি উপলক্ষে নিরক্ষর সহজ সরল বাঙালি পরী হাসেলকারীদের দ্বারস্থ হয়। কেননা এই পরীর ক্ষমতার উপর তার আস্থা তো অনেক প্রাচীন--- শত শত হয়তো হাজার হাজার বছর আগেও তার পূর্ব পুরুষ পরীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেই গুণীদের কাছে যেতো, পরীদের কাহিনী শুনতে শুনতে কখনো তার উর্বর মস্তিষ্ক থেকেও ধীরে ধীরে জন্ম নিতো পরীদের অন্য কোন আশ্চর্য কাহিনী।

দৈত্য-দানব ও রাক্ষস খোক্কস--এ দুই গোত্রকে একত্রে আলোচনা করার কারন দু'ধরনের নৈর্ব্যক্তিক শক্তিই লোককাহিনীতে ভিলেন, নরমাংসভূক এবং সুন্দরী নারী হরণকারী। কখনো কখনো যাদুর সাহায্যে দৈত্যকে বশ করে মানুষের উপকারে লাগানোর কাহিনীও পাওয়া যায়।

ঢাকার লোককাহিনী'র 'রাজকুমার সফরচান ও সোবুজ নিশাপরীর কিস্‌সা'য় দৈত্য খল চরিত্র। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'সুফিয়ানী বাদশা' ও *বাংলাদেশের লোককাহিনীর* দ্বিতীয় খন্ডের 'অকুলবকুল'-এ দৈত্য মানুষের সাহায্যকারী।

Dhaka University Institutional Repository

রাক্ষসরা বরাবরই ভয়, সন্ত্রাস ও মৃত্যু নিয়ে উপস্থিত হয়। এরা সব কাহিনীতেই নরখাদক এবং বহু কাহিনীতে গোটা রাজত্ব ধংসের জন্য দায়ী। কখনো গভীর অরণ্যে, কখনো পাতালে কখনো পরিত্যক্ত জনহীন রাজ্যে এদের বাস। *পূর্ব-পাকিস্তানী লোককাহিনী'র* 'বানর বাদশা', *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'সুফিয়ানী বাদশা' ও 'শাহশান বাদশা' প্রভৃতি লোককাহিনীতে দেখা যায় রাক্ষস পুরো রাজ্যের মানুষ খেয়ে সাবাড় করে সুন্দরী রাজকন্যাকে বন্দী করে রেখেছে বিয়ে করবে বলে। শেষে রাক্ষসরা বীর নায়কের হাতে মারা পড়ছে। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* প্রথম খণ্ডের 'শুঁজা ও বুড়ি রাক্ষস'-এ জানা যায় রাক্ষসের বসবাস মানুষের প্রতিবেশী হিসাবে। পরীদের সাথে যেমন মানুষের প্রেম ও সাহায্যের সম্পর্ক তেমনি রাক্ষসদের সাথে সম্পর্কিত নরমাংস আহার ও সুন্দরী নারী বন্দী করে রাখার বিষয়।

রাক্ষস সম্পর্কিত লোক-বিশ্বাসের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব দিয়েছেন বিভিন্ন পণ্ডিত। ভ্যান গেনেপ-এর মতে আদিকালে অসভ্য নরভূক জংলীরা অর্ধ-সভ্য আর্যদের ধরে ধরে খেয়ে ফেলতো। এ জন্য জংলীরা ক্রমে রাক্ষস রূপে পরিচিতি লাভ করে। এ তত্ত্বে সত্যতা থাকতে পারে। তবে এ তত্ত্বের বর্ণবাদী উপদানটি সত্য নয়। শুধু যে অনার্যরাই নরভূক ছিলো এমন নয়। ফ্রয়েডীয় স্বপ্নবাদীরা মনে করেন স্বপ্ন থেকে রাক্ষসের উৎপত্তি।

রাক্ষস-বিষয়ক লোকসংস্কারের উৎপত্তি যাই হোক বাংলা লোককাহিনীতে প্রচুর সংখ্যক রাক্ষস থেকে ধরে নেয়া ভুল হবে না যে, এদেশে এক সময় নরভূক জাতির বাস ছিলো। তাদের কাজকর্ম পরবর্তীতে রাক্ষস বিষয়ক লোকসংস্কারটি সৃষ্টিতে সাহায্য করে থাকবে।

ভুত-পেত্নী : বাংলা লোককাহিনীতে রাক্ষস ও দৈত্য দানবদের মতো ভুত-পেত্নী সংখ্যায় এত বেশি নেই। তাছাড়া দানব ও রাক্ষস জাতির রাজ্য ও রাজত্ব আছে, ভুত-পেত্নী উদ্বাস্তু--গভীর জঙ্গলের কোন বৃক্ষ, পরিত্যক্ত বাড়ি বা শেওড়া গাছ, চিতাস্থল এদের আশ্রয়। *ঠাকুরদাদার ঝুলি'র* 'মালঞ্চমালা', *কিংবদন্তীর বাংলা'র* 'ভুতের ভিটা', *গৈ-গেরামের গল্পের আসর*-এ প্রস্তাব-২, *বাংলাদেশের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'অকুল বকুল' কাহিনীতে ভুত ও পেত্নীর বর্ণনা আছে।

বিদেহী আত্মা ও প্রেতাত্মা : এক শ্রেনীর লোককাহিনীতে এমন দেখা যায় মৃত ব্যক্তি বা জন্তুর আত্মা এসে মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে বা তাদের অনিষ্ট করছে কিংবা শুধুই ঘোরাফেরা করছে। *কিংবদন্তির বাংলার* 'ভূতের ভিটা'য় আত্মহত্যাকারী বউ রাতে ভিটাটিতে এসে কাঁদে। উক্ত গ্রন্থের 'সাগরদীঘি' কাহিনীতেও আত্মহত্যাকারী রাজপরিবারে প্রেতাত্মাদের উপস্থিতির কথা জানা যায়। *ভাটিদেশের কিংবদন্তী'র* 'কমলার দীঘি'-তে মৃত কমলা রাণী দুধের বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য প্রতি রাতে দীঘি থেকে উঠে আসে বলে জানা যায়। এসবই বাঙালির প্রাচীন লোকসংস্কারের পরিচয়।

বাংলাদেশে এখন দৈত্য ও রাক্ষসের সংস্কারটি লোপ পেয়েছে। তবে পরী, ভুত, প্রেতাত্মার বিশ্বাস এখনো অনেকটাই অটুট। বাঙালির পূর্ব-পুরুষ সর্বপ্রাণবাদী ধারণা থেকে এই সব লোকসংস্কারের জন্ম দিয়েছিলো। আদিম সমাজের প্রতিটি মানুষই দৈত্য, রাক্ষস, পরী, ভুত আর প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করতো। তা না হলে বাংলা লোককাহিনীতে দৈত্য-রাক্ষস, জ্বীন-পরী আর ভূত-প্রেতের এমন আধিপত্য সম্ভব হতো না।

(গ) ভবিষ্যৎ দর্শন

কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী দ্বিতীয় খণ্ডের 'কাজফল বাদশা' কাহিনীতে দেখা যায় শেষ রাতে ফেরেস্তা এসে নবজাতকের ভাগ্য লিপি লিখে দিয়ে যাচ্ছে। *ঠাকুরদাদার ঝুলি'র* 'মালঞ্চমালা' কাহিনীতে অনুরূপভাবে ধারা-তারা-বিধাতার এসে ভাগ্যলিপি লিখছে। ভাগ্যে বিশ্বাস এবং জৌতিষীর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ দর্শন অথবা শুক-সারি/বেঙ্গমা-বেঙ্গমী পাখির কথোপকথন থেকে ভবিষ্যৎ জানার বিষয়টি বাংলা লোককাহিনীতে প্রায়ই এসেছে। *পূর্ব পাকিস্তানী-লোককাহিনীর* 'অজগর ও রাখাল রাজা'য় দেখা যায় জ্যোতিষীর নির্দেশে এক বৃদ্ধ তার পুত্র বধুর মাংস পযন্ত খেতে চায়। কারণ পুত্র বধুর পেটে তার সৌভাগ্য অবস্থান করছে বলে গণক জানিয়েছে। জ্যোতিষীর ভূয়া গণনা নিয়ে গড়ে উঠা জোলার অনেক কিস্‌সা এবং তার একাধিক পাঠান্তর পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository
লোককাহিনীতে দেখা যায় রাজা-বাদশা বা প্রতাপশালী সওদাগরদের ছেলে মেয়ে হলেই জ্যোতিষী ডাকা হতো ভাগ্য গণনার জন্য। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* তৃতীয় খণ্ডের 'রূপের মনোহর' কাহিনীতে রূপের মনোহর জন্মাবার পূর্বেই তার ভাগ্য গণনা করে জানা যায় যে রূপের মনোহরকে জন্মের পর থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীর আলো দেখানো যাবে না। নিষেধ ভঙ্গ করলে সে বারো বছরের দু:খ-কষ্টে পতিত হবে। এমন অনেক কাহিনীতে রাজা-বাদশার সন্ত ানদের ভাগ্য গণনার প্রসঙ্গ আছে। রাজসভায় রাজ-জ্যোতিষী নামে একটি পদই ছিলো।

শুক-সারি, বেঙ্গমা-বেঙ্গমি কর্তৃক ভবিষ্যৎ বিপদ জ্ঞাপনের কথা বর্ণিত হয়েছে বহু কাহিনীতে। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* প্রথম খণ্ডের 'মিছিরের বাদশা'য় জ্যোতিষীর গণনার কথা জানা যায়। গণনা ও ভবিষ্যৎ দর্শন-এ বিশ্বাস আমাদের সমাজে এখনো এতটাই অক্ষুন্ন আছে যে, একে লোকসংস্কার না বলে আধুনিক মানুষের সংস্কার বলাই মনে হয় ভাল।

(ঘ) চিকিৎসা বিদ্যা

প্রাচীনকালের বাঙালির চিকিৎসা বিদ্যার নমুনা পাওয়া যায় কিছু কিছু লোককাহিনীতে। যেমন *কিংবদন্তির বাংলার* 'বখতিয়ার খাঁর দিঘী'-তে জনৈক মওলানা জারফুকের মাধ্যমে দিঘীটি জ্বীন মুক্ত করেন বলে ঐ অঞ্চলের লোক-বিশ্বাসের উল্লেখ আছে। একই গ্রন্থের 'গোলাম আলীর দরগা'য় আল্লার জিকিরের মাধ্যমে গ্রামকে কলেরা মুক্ত করেন গোলাম আলী ফকির, *বাংলাদেশের লোককাহিনী দ্বিতীয় খণ্ডের* 'টেডন ও পরধান্যার কিস্‌সা'য় জানা যায় পরধান্যার পেট ব্যাথ্যা কমানোর জন্য 'ডিটপোড়ার' প্রস্তাব করা হয়। *বাংলাদেশের লোককাহিনীর* প্রথম খণ্ডের 'রাজা-উজির-নাজির-কোতোয়ালের পুত্রের কিস্‌সায়' পাই গাছের শিকড়ের ব্যবহারে সাপে কাটা লোক ভালো হয়ে যেতো। এসব লোককাহিনীতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালি সমাজের চিকিৎসা বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। ডাক্তার নাই--হাসপাতাল বা দ্রুত কার্যক্ষম রাসায়নিক ঔষধ নাই। সে সময় জারফুঁক ও শিকড়বাকর ছিলো অসুখে বিসুখে বাঙালির নির্ভর।

বাঙালির লোক-সংস্কারের প্রকৃত জগত হয়তো আরো বিস্তৃত ছিলো, তাতে ছিলো বহুদিনের ধ্যান-ধারণা, অভিজ্ঞতা-কল্পনার বিচিত্র বর্ণের সমাহার। অন্যান্য উৎস--যেমন- ধর্মগ্রন্থ, সিদ্ধাচার্যদের রচনা ইত্যাদিতে আরো নানা লোকসংস্কারে কথা জানা যায়। বাংলা লোককাহিনীতে হয়তো সেই বিশাল বর্ণময় জগতের প্রভাবশালী বিষয়গুলোই ছায়াপাত করেছে শধু; ছোটো খাটো সংস্কার-কুসংস্কারের কথা সেখানে জানা যায় না। তবু লোককাহিনীতে প্রাপ্ত তথ্য সুবিন্যস্ত করে আমরা এখানে লোকসংস্কারের যে রূপটি পাচ্ছি তা হয়তো খুঁটিনাটি তথ্য ধারণ করে না। তবে তা বাঙালির লোকসংস্কারের জগতটির একটি সামগ্রিক পরিচয় যে তুলে ধরে তেমন দাবী করা অযৌক্তিক নয় বলেই আমাদের বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

লোককাহিনীতে বাঙালির ঘর-গৃহস্থালী ও জীবনযাত্রা

Dhaka University Institutional Repository

গৃহ ও পরিবেশ

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এখনো দেখা যায় শণের বা খড়ের ছানি দেয়া দোচালা চৌচালা ঘর, বাঁশের চাঁচের বেড়া, পরিষ্কার করে লেপামোছা ভিট-বারান্দা আর ছোট এক টুকরো উঠান---সম্পদ আর জৌলুস নয়, নির্জনতা আর শান্তি নিয়ে ছোট্ট একটা বাড়ি। মধ্যযুগ এমনকি প্রাচীন যুগেও এই-ই ছিলো শান্তিপ্রিয় বাঙালির বাসস্থান। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন:

"সাম্প্রতিক বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে আজও বাঁশ বা কাঠের খুঁটির উপর চতুষ্কোণ নকশার ভিত্তিতে মাটির দেয়াল বা বাঁশের চাঁচারীর বেড়ায় ঘেরা যে ধরনের ধনুকাকৃতি দোচালা, চৌচালা, আটচালা ঘর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ধরনের বাঙলা ঘর রচনাই ছিলো প্রাচীন রীতি।"[১]

রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও এ ধরনের ঘরের উল্লেখ করেছেন:

"বাংলা দেশে বেশিরভাগ বাঁশের খুঁটি ও খড়ের চাল দিয়া ঘর তৈয়ারী হইত। দোচালা ও চারচালা সাধারণত ঘরের এই দুই শ্রেণী।"[২]

খড়ের ছানি দেয়া চাল, দোচালা/চৌচালা ঘর এখনো গ্রামাঞ্চলের সিংহভাগ বাঙালির বাসস্থান। মাটি দিয়ে একটু উঁচু আয়তাকার ভিট তৈরির পর বাঁশের খুঁটিতে প্রস্তুত হয় নিচের কাঠামো; তার উপর উঠে বাঁশের তৈরি চালের কাঠামো। শন বা খড় দিয়ে ছানি দেয়া হয় চালের উপরের অংশ। বাঁশের বেতের চাঁচ দিয়ে তৈরি হয় বেড়া। অতি দরিদ্ররা হোগলা দিয়ে বেড়া আর বিভিন্ন পাতা দিয়ে ঘরের চাল ছানি দেয়ার কাজ চালায়।

বাংলা লোককাহিনীতে সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ির বর্ণনা কম। অধিকাংশ লোককাহিনীর কারবারই তো রাজা-উজিরদের নিয়ে। সেখানে থাকে বিরাট পুরী, সাত দেয়াল, সোনার মন্দির আর সোনা-রূপার খাট পালঙ্কের কথা। এর মধ্যেও কিছু কিছু কাহিনীতে বাঙালি কথক রাজা-উজিরদের কথা বলার অবসরে জানিয়ে গেছে নিজের কথা--তার পরিবেশ ও প্রতিবেশীর কথা। সে সব কাহিনীতেই পাওয়া যায় বাঙালির ঐতিহ্যবাহী বাসগৃহ 'কুঁড়েঘর'-এর বর্ণনা।

বাংলা একাডেমীর *লোক-সাহিত্য সংকলন*-৮ম খণ্ডের 'জোলার কিস্‌সা (মোমনেশাহী)'-তে চাল ছানি দেয়ার বর্ণনা আছে। চালের উপর জোলা ছানি দিচ্ছে, নিচে ঘরের ভেতর পিঠা বানাচ্ছে তার স্ত্রী। তেলের উপর কাঁচা পিঠা পড়তেই ছেঁৎ ছেঁৎ শব্দ হচ্ছে। শব্দ শুনে জোলা শুনে দেখছিলো কয়টি পিঠা বানানো হয়েছে।

সাধারণত কুঁড়েঘর হলেই চাষীরা নিজ হতে চালের ছানি দিতে পারে। টিন বা এ জাতীয় কোন কিছুর চাল নিজে ছানি দেয়া সম্ভব নয়, যেহেতু এর সাথে কারিগরি দক্ষতার প্রশ্নটি জড়িত। কুঁড়েঘরের চাল ছানি দেয়ার জন্যও দক্ষ লোক আছে যাদেরকে ভাড়া করে আনা হয় সুন্দর ও নিখুঁত ছানির জন্য। এদেরকে বলা হয় 'ছাপরবন' বা 'ছাপ্পরবন'। দরিদ্র লোকেরা সাধারণত ছাপ্পরবনের পেছনে টাকা নষ্ট না করে নিজেরাই চাল ছেয়ে নেয়। জোলাও ছাপ্পরবনের খরচ বাঁচানোর জন্য নিজেই চালের ছানি দিচ্ছিলো। (পৃ-২০)।

শামসুল ইসলামের *বাংলাদেশের কিংবদন্তী'র*, 'ফুল কুমারীর ভিটা' কাহিনীতে আমরা জানতে পারি বংশাই তীরে ছোট কুঁড়ে ঘরে মেয়ে ফুলকুমারীকে নিয়ে কাজেম আলী পাটনীর সংসার (পৃ-২০)। লোকাহিনীতে যেখানে কাঠুরিয়া আছে

---

[১] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব*-২য় খণ্ড, স্বাক্ষরতা প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ-৮৫৬।

[২] রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত *বাংলাদেশের ইতিহাস* মধ্যযুগ, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিকেশন্স লি. কলিকাতা, ১৯৭৩; পৃ-৪৩১।

Dhaka University Institutional Repository

সেখানেই এসেছে জঙ্গলের ধারে ছোট একটা কুঁড়েঘর বেঁধে তার বসবাসের প্রসঙ্গ। *বরিশাল জেলার লোকসাহিত্য*-এর 'নকীব নাফেজা ও পরীর কিস্‌সা'র কাঠুরিয়া এবং *বাংলাদেশের লোককাহিনী* তৃতীয় খণ্ডের 'আলম সদাগর' কাহিনীর কাঠুরিয়া বনের ধারে কুঁড়েতেই বাস করে। 'আলম সদাগর'-এ রৈমণ কন্যা যে কাঠুরিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করে তার একটি মাত্র কুঁড়েঘরই সম্বল। তাই রৈমণ কন্যাকে আশ্রয় দিয়ে তাকে সস্ত্রীক বাইরে রাত কাটাতে হয়।

গৃহস্থরা কুঁড়েঘরে বাস করলেও তাদের বাড়িতে একাধিক ঘর থাকতো। স্বচ্ছল গৃহস্থরা চর এলাকায় তাদের রাখালদেরও কুড়েঘরের অস্থায়ী আস্তানা বানিয়ে দিতো। বাংলা একাডেমীর *লোক সাহিত্য সংকলন-৪২-এর* 'বক রাজার হাস্তোর' কাহিনীতে দেখা যায় গৃহস্থ তার বউকে বলছে:

"চরার মোদে যে বাড়ি আছে ঐসব বাড়ির কাছে একটা গর তুইল্যা দেই। চাইল ডাইল সব দিয়্যা দেই, নিজে পাক কোইর‍্যা খাইবো আর গরুবাচুর লিয়্যা থাইকপো। তহন মনির গিরাস্তো মনিকে চরার মোদে একটো থাহার ঘর আর একটো গরুর গোয়াল বানায়া দিল।"[১]

গ্রামের চাষীরা কুঁড়েঘরে বাস করলেও তাদের দুটো তিনটে ঘর থাকতো। নিজেদের বাসগৃহ, পাকঘর, গোয়াল ঘর, মেহমানদের জন্য বাংলা ঘর--এইসব নিয়ে গড়ে উঠতো তাদের বাড়ি। বাড়ির বর্হিভাগে মেহমানদের ঘর, একপাশে গোয়াল ঘর, মাঝখানে উঠান, তারপর বাসগৃহ, বাসগৃহের পাশেই থাকতো ছোট রান্নাঘর। *বাংলাদেশের লোককাহিনীর* প্রথম খণ্ডের 'আগের গীত মাঘে গায়', 'প্রতিশোধ' ও অন্যান্য লোককাহিনী থেকে সাধারণ বাঙালির বাড়ির এমন একটা কাঠামো আন্দাজ করে নেয়া যায়।

অপেক্ষাকৃত ধনী লোকদের বাড়ির বর্ণনায় দেখা যায় পুকুর, কুয়া ইত্যাদি আছে। কারো কারো বাড়িতে দালান কোটার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। *বাংলাদেশের লোককাহিনীর* প্রথম খণ্ডে 'পুষ্করিণী চলে বলদে দুধ দেয়' কাহিনীতে নাগার্চির সুখের সংসারের কথা বলতে গিয়ে গোয়াল ভরা গরু, উঠান ভরা ধান আর আটচালা ঘরের সাথে মিঠা পানির বড় পুকুরের কথা উল্লেখ করতে ভুল হয়নি কথকের।

গৃহের পরিবেশেরও কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। বাংলা একাডেমীর *লোকসাহিত্য সংকলন*-৮ম খণ্ডে 'জোলার কিস্‌সা(মোমেনশাহী)'-তে দেখা যায় জোলার বাড়ির পেছনেই বাঁশ ঝাড়, এরপর জঙ্গল। বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে আজও জ্বালানি সংগ্রহ ও অন্যান্য প্রয়োজনে বাড়ির পেছনে ছোট এক টুকরো জঙ্গল সংরক্ষণ করতে দেখা যায়।

রাজা-বাদশা ও সওদাগরদের বাড়ির বর্ণনায় জৌলুসের চিহ্ন ফুটে উঠে। 'আলম সদাগর'-এর কাহিনীতে দেখা যায় তার প্রাসাদের বর্ণনায় 'তেমালা দালান', 'অন্দর মহাল' এবং কাছারি বাড়ির উল্লেখ আছে। নদীর তীরে আছে 'শানে বান্ধাইল ঘাট'। সেখানে নববিবাহিত আলম সদাগরের জন্য আলাদা মহল তৈরি করা হয়, তার মহলের পাশে আছে ফুলবাগান। গরুড় পাখি এবং আলম সদাগরের কথাবার্তায় আমরা তা জানতে পারি:

"(গরুড় পাখি) : এই রে পুত্রারে! দেক তর এই বাড়ি নি।
(আলম সদাগর) : তালৈ এইডা-ই আমার রৈমণ কন্যার মহল।
(গরুড় পাখি) : যাও তোমার কাজ তুমি গিয়া সিদ্ধি কর। আমি তোমার ফুল বাগানের মাইঝে যাই।"[২]

কোন কোন সদাগরের নামে নগর প্রতিষ্ঠিত হতেও দেখা যায়। যেমন *বাংলাদেশের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'মতিলাল বাশ্‌শা' কাহিনীতে তালেব সদাগর তার প্রাসাদকে ঘিরে গড়ে তুলেছিলো তালেবপুর শহর।

---

[১] মোহাম্মদ ইসহাক আলী (সম্পা),*লোক সাহিত্য সংকলন-৪২*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫; পৃ- ১০।

[২] মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান, 'আলম সদাগর', *বাংলাদেশের লোককাহিনী* তৃতীয় খণ্ড, গ্রন্থ সুহৃদ প্রকাশনী, নরসিংদী, ১৯৯৮, পৃ-৯২।

Dhaka University Institutional Repository

অপেক্ষাকৃত প্রাচীন লোককাহিনীগুলোর বর্ণনা থেকে মনে হয় তখন রাজার রাজ প্রাসাদ ছিলো সাদামাটা। বাংলা একাডেমীর *লোক-সাহিত্য সংকলন*- ৮ম খণ্ড, 'জোলার কিস্‌সা (মোমেনশাহী)'-এ রাজবাড়িতে 'গোবরের টাল'-এর বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু এ ধরনের রাজবাড়ির বর্ণনা খুব বেশি কাহিনীতে পাওয়া যায় না।

পরবর্তী সময়ের রাজা-বাদাশাহদের রাজবাড়ির বর্ণনা পড়ে মনে হয় শাসকদের শান শওকত ও অবস্থানে উন্নতি হয়েছে। এমনকি সওদাগরদের বাড়িও বিরাট রাজপ্রাসাদের মত। যেমন *ঢাকার লোককাহিনীর* 'রাজকুমার সফর চান ও সোবুজ নিশা পরীর কিস্‌সা'য় রাজকুমার একদিন পুকুরের শানে বসে হাওয়া খাওয়ার সময় পরীর দেখা পায়।

রাজা/বাদশাদের দরবারের বর্ণনা থেকেও তাদের ঠাঁটের আন্দাজ করা যায়:

"তার পরের দিন রাজ দরবারে লোকের ঠাঁই পাওয়া যায় না। রাজা সিংহাসনে বসে আছে। উজির নাজির, বীরবল, কোতোয়াল সব হাজির.....। দাসীকে রং মহলে পাঠাইল রানীকে আনতে। দেখতে দেখতে রানী আইসা রাজার বাম দিকের সিংহাসনে বইল।[১]

রাজবাড়ীর বর্ণনায় যেসব মহলের উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলো হলো- অন্দর মহল, নাচ মহল, রং মহল, দরবার, অতিথিশালা, অস্ত্রশালা, কারাগার, দাসীমহল ইত্যাদি। বর্ণনা থেকে আন্দাজ করা যায় নিরক্ষর কাহিনীকারদের কাছে রাজপ্রাসাদ ছিল আশ্চর্য এক বস্তু। সওদাগরদের বাড়ী-ঘরের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাও রাজপুরীর কাছাকাছি। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* তৃতীয় খণ্ডের 'আলম সদাগর' কাহিনীর আলম সওদাগর ছোটখাটো রাজার মতোই জীবন নির্বাহ করে। রাজাদের পরই ছিল তাদের বাড়ী-ঘরের জৌলুস। এরপর ধনী লোকদের, সবশেষে বাঙালির কুঁড়েঘর। যে ঐতিহ্য এখনও বহন করে চলেছে আমাদের গ্রামীন সমাজ।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

প্রাচীনকালে সাধারণ মানুষ পদব্রজে এবং বিত্তশালীরা ঘোড়ায় চড়ে যাতায়াত করত। তখনকার দিনে আজকের মতো বহু ব্যবহৃত পথ-ঘাট ছিল না। অধিকাংশ স্থান জঙ্গলাকীর্ণ থাকার কারণে রাস্তা ছিল বিপদঙ্কুল। এর মধ্য দিয়েই বাঙালি সমাজের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ যাতায়াত করতে পায়ে হেঁটে।

একটি লোককাহিনীতে এক সাধুর ভ্রমণ সম্পর্কে বলা হয়েছে:

"গ্রীষ্মের প্রচন্ড তাপ, তার উপর অনেক পথ হেঁটেছেন। ক্লান্ত হয়ে এক সময় খানিক বিশ্রামের জন্য প্রকান্ড এক বট গাছের ছাঁয়ায় গিয়ে বসেছেন। সেখানে বিশ্রাম নিতে বসেছে আরো অনেক পথচারী" (পৃ-৫৭)।[২]

আরেকটি কাহিনীতে জানা যায় মুর্খের দেশের পণ্ডিত মনের দুঃখে দেশ ছেড়ে অন্য দেশের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যায়:

"চলিতে চলিতে এই দেশ ছাড়াইয়া আর দেশে যাইয়া পৌঁছিল। হাঁটিতে হাঁটিতে তার পায়ে ব্যাথা ধরিয়াছে। তিনি একটি বট গাছের ছায়ায় জিরাইতে বসিলেন"।[৩]

প্রাচীনকালে এটি ছিল এক সাধারণ দৃশ্য। স্থলপথে পায়ে হেঁটেই এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে এমনকি এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে পাড়ি জমাতো মানুষ। পথি মধ্যে শ্রান্ত হয়ে বিশ্রাম নিত বড় কোন গাছের নীচে। সেখানে অন্যান্য ক্লান্ত পথিকের সাথে আলাপ পরিচয় হতো। তারপর চলে যেত যে যার পথে।

---

[১] *ঢাকার লোক কাহিনী*, পূর্বোক্ত, চূড়ামনির কিস্‌সা-৩য় খন্ড, পৃ-৪৪।

[২] দেওয়ান গোলাম মোর্তজা, *গৈ গেরামের গল্পের আসর*, প্রস্তাব-৯, পৃ-৫৭।

[৩] *বাংলাদেশের লোক কাহিনী* প্রথম খন্ড, 'পন্ডিত দেশের মুর্খ আর মুর্খ দেশের পণ্ডিত' পূর্বোক্ত, পৃ-১২৬।

Dhaka University Institutional Repository

পায়ে হাঁটা ছাড়া বাঙালির যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্বিতীয় বাহন ছিল নৌকা। *বরিশাল জেলার লোক-সাহিত্যে* 'চন্দ্রশেখর' কাহিনীর নায়ক আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল নৌকায় করে। *বাংলাদেশের কিংবদন্তীর* 'একটি প্রেমের' জন্য কাহিনীতে কৃষ্ণের দৌহিত্র যুবরাজ অনিরুদ্ধ নৌকা পথে দিনাজপুরের মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় সে রাজ্যের রাজকন্যা উষাবতীর প্রেমে পড়ে (পৃ-৪৯)।

সে আমলে ছোট ছোট নৌকা চালাতে হতো বৈঠা বেয়ে। বড় নৌকায় থাকত দাঁড়। হাল তো ছিলই। আর বাতাস পেলে তুলে দেয়া হতো রং বেরংয়ের পাল। যাদের নৌকা ছিল না, তারা নৌকার বিকল্প কলার ভেলা ব্যবহার করত। *কিংবন্তির বাংলায়* 'গোলাম আলীর দরগা' কাহিনী থেকে জানা যায় কোথাও যাওয়ার প্রাক্কালে সঙ্গীরা গোলাম আলীকে রেখেই নৌকা নিয়ে চলে গেলে তিনি কলার ভেলায় করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে গন্তব্যে পৌছান (পৃ-৫৫)।

ঢাকার লোককাহিনীর 'চূড়ামনির কিস্‌সার' প্রথম খণ্ডে অকুল সাগরের এক দ্বীপে পরিত্যাক্ত রাজপুত্র "হঠাৎ একদিন দেখিল কেলা গাছের ভেলা ভাইসা আসিতেছে। রাজার ছাওয়াল তখন কেলার ভেলাটা ধরিতে গেল। কেলার ভেলাটাও ভাইসা তার কাছে আইল।"[১]

ভাটি অঞ্চলে কলা গাছের ভেলার ব্যবহার এখনও আছে। প্রাচীনকালের মতই দরিদ্র লোকজন অর্থের অভাবে নৌকা বানাতে না পারলে কলা গাছের ভেলা দিয়েই নৌকার কাজ চালায়।

নৌকার সওদাগরি সংস্করণ হলো ডিঙ্গা। আজকাল ডিঙ্গা বলতে ছোট নৌকা বুঝায়। কিন্তু সে আমলে ডিঙ্গাগুলো ছিল সওদাগরদের বিলাসী বাহন। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'মদন সাধু' কাহিনীতে দেখা যায় মদন সাধু চৌদ্দটি বড় বড় ডিঙ্গার বিরাট এক বহর নিয়ে বানিজ্যে যাত্রা করছে। ডিঙ্গা গুলোর আবার বিভিন্ন নাম ছিল যেমন- লক্ষী ডিঙ্গা, কালি ডিঙ্গা ইত্যাদি। লক্ষী ডিঙ্গা সওদাগরের খাস বাহন। 'চূড়ামনির কিস্‌সার' ২য় খন্ডে পাওয়া যায় সওদাগরের সাত পুত্রের বাণিজ্য যাত্রার বর্ণনা:

গাব-গোবর দিয়া ডিঙ্গা করিল সাজন।
হইলা নীল, সাদা লাল
রং বেরংয়ের উঠায় পাল
ষাট কাহন ডিঙ্গাতে তখন।[২]

এ ধরনের রং বেরংয়ের পাল তুলে যাওয়ার সময় নগরবাসী, পাড়া প্রতিবেশী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতো। সওদাগরের ধন সম্পদ আর ঠাঁট পাটের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই ডিঙ্গা তৈরী হতো। সে ডিঙ্গা গাব কালি দিয়ে সাজানো হতো। সম্ভবত: আলকাতরা ছিল না বলে গাবচূর্ণের সাথে কালি মিশিয়ে কাঠের তক্তার জোড়াগুলোয় পানি উঠার পথ বন্ধ করা হতো।

রাজারা যে নৌকা ব্যবহার করতেন তার দৃষ্টান্ত একটু আগেই দেয়া হয়েছে। *কিংবদন্তীর বাংলার* 'রতন রাজার ঘাট' কাহিনীতে রাজার বিলাস ভ্রমণের জন্য ব্যবহৃত ময়ূরপঙ্খীর কথা জানা যায় যাতে চড়ে আত্মহত্যা করেছিল রাজপরিবার (পৃ-৩৬-৩৭)। রাজা-বাদশাদের নৌকা ছিল বিলাসী বাহন। সঙ্গী সাথীদের নিয়ে অনেক লোক হতো বলে প্রয়োজন ছিল এমন বড় নৌকার যাতে সবার স্থান সংকুলান হয়। এমন নৌকার বর্ণনা পাওয়া যায় ডাকাতমারির বিলে :

"একদিন দুর্বা রাজার রানী দূর্গা সুন্দরী সেই বিলের পথ দিয়ে ময়ূরপঙ্খী করে বাপের দেশে যাচ্ছেন। সঙ্গে আছে পাইক বকন্দাজ আর তার গুরু সন্ন্যাসী ঠাকুর.....। রানীর ময়ূরপঙ্খী সাত দাঁড় ফেলে তরতর করে এগিয়ে চলেছে।"[৩]

---

[১] চূড়ামণির কিস্‌সা- প্রথম খণ্ড, *ঢাকার লোককাহিনী*, পূর্বোক্ত, পৃ-১২।
[২] চূড়ামণির কিস্‌সা, পূর্বোক্ত, পৃ-২২।
[৩] ডাকাতমারীর বিল, *কিংবদন্তীর বাংলা*, পূর্বোক্ত, পৃ-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

আসলে লোককাহিনীতে নৌকা একটি অতি সাধারণ বস্তু বলে গণ্য হওয়ার কারণে প্রায়ই এর উল্লেখ দেখা যায়। নদী মাতৃক বাংলাদেশে বর্ষাকালে যেখানে পা ফেলতেই জল সেখানে প্রাচীন বাংলার চাষী থেকে শুরু করে রাজা পর্যন্ত নৌকার উপর নির্ভরশীল হবেন তাই তো স্বাভাবিক।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাঙালি সমাজের আর এক বিলাসী বাহন হলো ঘোড়া। অবশ্য রাজা-বাদশা, সওদাগর-মহাজন ছাড়া অন্যদের হয়ত ঘোড়া ব্যবহারের সামর্থ ছিল না। সাধারণ মানুষের কাছে ঘোড়া যে মূল্যবান বাহন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলা একাডেমীর *লোক-সাহিত্য সংকলন-৪২-এ* 'বাঘ ও টাঘের কিস্‌সা'য় জোলার হাস্যকর কান্ড থেকে। জোলা তার মায়ের কাছ থেকে তিন টাকা নিয়ে গিয়ে এক ঠকের পাল্লায় পড়ে ঘোড়ার বদলে ঘোড়ার ডিম মনে করে ভাংগি কিনে নিয়ে আসে(পৃ-৮৫-৮৬)। ঘোড়া কেনার প্রতি জোলার অতি আগ্রহ দেখে আন্দাজ করা যায় ঘোড়া সাধারণ মানুষের কাছে বিলাসী বাহন ও দামী বস্তু হিসেবে গণ্য হতো।

রাজা বাদশাদের অবশ্য হাতী ছিল রাজকীয় বাহন। পাট হাতী তার নিজের জন্য, অন্যদের জন্য ছিল অন্যান্য হাতী। *গৈ গেরামের গল্পের আসর* প্রস্তাব-৪-এ পাওয়া যায় "রাজার ইঙ্গিতে উজিরের হাতীও তৈরী করে আনা হলো। রাজা তার হাতীর উপর কোলের কাছে মন্ত্রীর ছেলেকে নিয়ে চলেছেন আগে আগে। পেছনে পেছনে চলছে মন্ত্রীর হাতী। লোক লস্কর চলছে সাথে সাথে (পৃ-৩৫)।" *বাংলাদেশের লোককাহিনীর* 'অকুল বকুল' ৪র্থ খন্ডে দেখি এক দেশের রাজা মারা যাওয়ার পর নতুন রাজা খুঁজে বের করার জন্য পাট হাতী ছেড়ে দেয়া হয়েছে কপালে সিঁদুর দিয়ে (পৃ-১৪০)।

অন্যান্য রাজকীয় কর্মচারীদের ও ধনী সওদাগরদের স্থলপথের সাধারণ বাহন ছিল ঘোড়া। *ঢাকার লোককাহিনী* চূড়ামনির কিস্‌সার ৪র্থ খন্ডে রাজা, উজির, নাজির ও কোতোয়ালের চার পুত্র রাগ করে বাড়ী থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং "চার জনের মধ্যে যে যত পারে টাকা পয়সা নিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া ঘোড়া ছাইড়া দিল" (পৃ-৫১)। এই কাহিনীর সপ্তম খন্ডে দেখি রাজার পুত্র শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার উদ্দেশ্যে "সারাদিন ঘোড়া চালাইয়া সন্ধ্যার দিকে শ্বশুর বাড়ীর দেশে হাজির হইল (পৃ-৭১)। *কিংবদন্তীর বাংলা*'য় 'রতন রাজার ঘাট' রাজার যুদ্ধ যাত্রার বর্ণনা এরূপ:

"রাজা একে একে পিতামাতা রানী এবং ছ'মাসের দুধের শিশু, আত্মীয়-স্বজন, গ্রাম পরিজন, আমলা নফর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে লোক-লস্কর সৈন্য সিপাইসহ চতুরঙ্গ সাজিয়ে পঙ্খীরাজ ঘোড়ায় চেপে গৌড়ে রওনা হয়ে গেলেন।"[১]

ঘোড়া শুধু বাংলাদেশেই নয় পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন জাতির কাছেও অতুলনীয় বাহন ছিল। এজন্য যদিও নিরক্ষর কথকরা জীবনে ঘোড়ায় চড়ার সুযোগ পায়নি তবুও তাদের মুখের বর্ণনাতেই ঘোড়া এ রকম জীবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে।

কিছু কিছু লোককাহিনীর বর্ণনায় গরুর গাড়ীর উল্লেখ পাওয়া যায়। *যশোরের লোককাহিনী'র* 'চারটি জ্ঞানের কথা' নামক কাহিনীর ছোট ভাইয়ের অস্থায়ী পেশা ছিল ভাড়ায় গরুর গাড়ী চালানো। এছাড়া রাজা বাদশারা পাল্কী বা চৌদোলাতেও চড়তেন ।

বিয়ের পর নতুন বৌকে সোয়ারি বা পাল্কী দিয়ে আনার রেওয়াজ ছিল। *ঢাকার লোককাহিনীর* 'চূড়ামনির কিস্‌সা'র ৪র্থ খন্ডে রাজপুত্র একদিন জেদের বশে এমনি এক পাল্কীর পর্দা তুলে নতুন বৌকে দেখার অপরাধে শাস্তি পেয়েছিল (পৃ-৫০-৫১)।

[১] 'রতন রাজার ঘাট', *কিংবদন্তির বাংলা*, পূর্বোক্ত পৃ-৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জা, অলংকার

প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত শাড়ী বাঙালি নারীর প্রধান পোষাক। সেই আদি কালে রাজ প্রাসাদের অন্তপুর বাসিনীরা যেমন হিয়া, গঙ্গা জল, পবন দূত ইত্যাদি নানা রঙের শাড়ি পরে তাদেরকে আকর্ষনীয় করে তুলতো। তেমনি এখনও উৎসব অনুষ্ঠানে বাঙালি নারীর শাড়ীর মধ্যেই খুঁজে পায় তার সুন্দরতম সাজ। বিশ শতকে এসে পোষাকের ধরণ অনেকটা পাল্টে গেছে এবং পাল্টে যাচ্ছে। কিন্ত এককালে বাঙালি নারীর শাড়ী এবং পুরুষের ধুতি ছিল প্রিয় পোষাক । এজন্যই নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন "পুরুষদের অধবাস যেমন ধুতি, মেয়েদের তেমনি শাড়ী। ধুতি ও শাড়ীই প্রাচীন বাঙালির প্রধান বেশ বাস।"[১] অবশ্য বাংলা লোককাহিনীতে মেয়েদের পোষাক হিসেবে শাড়ী ছাড়া আর কোন কিছুর উল্লেখ পাওয়া যায় না। শাড়ীর আবার রকমফের ছিল, ছিল নানা নাম। যেমন- গুয়া কুল, গঙ্গা জল, গন্ধরাজ, হিয়া, অগ্নীপাট ইত্যাদি (দ্র: *বাংলাদেশের কিংবদন্তী* 'একটি প্রেমের জন্য')।

কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী দ্বিতীয় খণ্ডের 'চিঙ্গিজান বাদশা' কাহিনীতে দেখা যায় হরবোলা সুন্দরী বিয়ের সাজে সজ্জিত হচ্ছে। প্রথমে গঙ্গা জল. গন্ধরাজ ইত্যাদি শাড়ী পরে পছন্দ না হওয়ায় সব খুলে ফেলে শেষে হিয়া নামের শাড়ী পরে তার সাজ-সজ্জা শেষ হলো (পৃ-৮৪)।

নামের সাথে শাড়ীর বৈশিষ্ট্যেরও মিল আছে। যেমন গঙ্গাজল শাড়ীটি নখের উপর রাখলে টলমল করতো। সে জন্যেই বুঝি নাম গঙ্গাজল। কিন্তু দরিদ্র মানুষদের পক্ষে এসব শাড়ী কেনা সম্ভব হতো না। বাংলা একাডেমীর *লোক-সাহিত্য সংকলন-৪২*-এর 'বক রাজার হাস্তর'-এ আমরা দেখি মনির স্ত্রী বাপের বাড়ী যাওয়ার সময় একটি সাধারণ শাড়ী ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে চিহ্ন রেখে যাচ্ছে এবং বলছে, "আমি আমার এই শাড়ী কাপড় লিয়্যা গ্যালাম। যে পত দিয়া আমি যাব হেই পথেই কাপড় এটু এটু কইরা ছিড়্যা ফ্যালা দিয়া যামু" (পৃ-২১)।

মধ্যযুগে বাঙালি ছেলেদের পোষাক ছিল ধুতি। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* তৃতীয় খন্ডের 'রূপের মনোহর' কাহিনীতে দেখা যায় রূপ মনোহর শ্বশুর বাড়ী থেকে পালাবার সময় একটা দশ হাতি ধুতি নিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে তার গমন পথে ফেলে রাখে যাতে তার স্ত্রী পথ চিনে আসতে পারে (পৃ-৪৪)। পরবর্তী সময়ে বাঙালি পুরুষের পোষাকে তহবন এবং ইজের যোগ হয়। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* তৃতীয় খন্ডের 'আলম সদাগর' কাহিনীতে দেখা যায় সন্ন্যাসীরূপী আলম সওদাগরকে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে গোসল করানোর আদেশ দেয় তার স্ত্রী। অতপর, "গোসল করাই সারছে পরে কৈন্যা একটা তবন ইডাল দিয়া ফ্যালাইয়া দিছে দাসীর উপরে। যহন তবন খান দিছে তহন সন্যাসী কয় না না আমি তবন পিনতাম না। আমার সন্ন্যাসীর কাপড়ই আছে" (পৃ-২১)।

লোককাহিনীতে বাঙালি পুরুষের পোষাকে তেমন বৈচিত্র্য পাওয়া যায় না। তবে রাজা-বাদশা, সওদাগর, উজির, সৈনিক প্রমুখের নির্দিষ্ট ধাঁচের পোষাক ছিল বলে মনে হয়। বিভিন্ন লোককাহিনীতে বাদশাহী লেবাস ('পরীকন্যার কিস্‌সা', *ঢাকার লোককাহিনী*), সওদাগরের লেবাস (পূর্বোক্ত, চূড়ামনির কিস্‌সা- ষষ্ঠ খণ্ড) ইত্যাদি উল্লেখ থেকে বুঝা যায় পদবী অনুযায়ী পোষাকও ভিন্ন হতো। রাজা বাদশাদের পোষাকে থাকতো দামী পাথরের ও সোনা-রূপার অলংকরণ। তার পরেই হয়ত উজিরদের অবস্থান ছিল। সৈনিকেরও নির্দিষ্ট পোষাক ছিল যা হয়ত যুদ্ধে তার গাত্র রক্ষায় সমর্থ ছিল। তবে সাধারণ বাঙালিদের মধ্যে শাড়ী আর ধুতি ছিল জনপ্রিয় পোষাক।

রূপচর্চা ও সাজ-সজ্জা এবং অলংকার সম্পর্কেও আকর্ষণীয় তথ্য পাওয়া যায়। *বাংলাদেশের কিংবদন্তী'র* 'একটি প্রেমের জন্যে' কাহিনীতে জানা যায় সকালবেলা রাজকন্যা উষাবতীকে স্নানের পূর্বে পাত্রে রক্ষিত তরল চন্দনে চর্চিত করা হলো। কস্তুরির আরক দেয়া হলো মুখে, নিমের মিহি পরাগ রেণুতে দাঁত মাজা হলো, অতপর রাজকুমারী জলে নামলো (পৃ-৫২)।

---

[১] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, সুভাষ মুখোপাধ্যায়-কৃত সংক্ষেপিত সংস্করণ, পূর্বোক্ত, পৃ-১০১।

Dhaka University Institutional Repository

এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় চিঙ্গিজান বাদশার হরবোলা কন্যার সাজ-সজ্জায়: স্নান করে বেশরের ঝাপি খুলে আবের কাংখই বের করা হলো। মুখে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে প্রসাদনের সাহায্যে চুল গোটা গোটা করা হলো, স্টাইলের নাম বেহার। এ স্টাইলে বাঁধা খোঁপায় নয়টি কেওয়ার অর্থাৎ দরজা মতো সজ্জা থাকে। অতপর হিয়া নামক শাড়ী পরিধান করে হাতে কাঁকন, গলায় হাঁসুলি, পায়ে সোনালী ঘুংঘুর, কপালে সিদুর সবশেষে মুখে পান দিয়ে তার সাজ-সজ্জা শেষ হলো।('চিঙ্গিজান বাদশা', *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী,* দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-৮৪-৮৫)।

বাঙালি রমনীর সাজ-সজ্জার বর্ণনা এখানে পাওয়া যাচ্ছে। আবার *বাংলাদেশের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'অকুল বকুল' কাহিনীতে দেখি অসচ্চরিত্র রাজাকে জব্দ করার জন্য নাজিরের স্ত্রী তার দাসীকে সাজিয়ে গুছিয়ে বসিয়ে রাখে যাতে রাজা দাসীকে নাজিরের স্ত্রী মনে করে রং তামাশা করে চলে যায়। তখন এ কথা ফাস করলে রাজার আর মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না। এ উদ্দেশ্যে দাসী "নিলাম্বরী শাড়ী পরিল, গায়ে অষ্ট অলংকার জড়াইল, তাম্বুলে মুখ রাঙাইল" (পৃ-১৪৪)।

কিন্তু গৃহস্থ বাড়ীর মেয়ের সাজ-সজ্জায় এ রকম জৌলুসের চিহ্ন নেই। তাদের বিয়ের সময় গ্রামের তাঁতি কর্তৃক বোনা সুন্দর শাড়ী, বেনের বানানো কিছু জেওর, মেহেদী, আলতা ইত্যাদিই যথেষ্ট (পান পাতা, *বাংলাদেশের লোককাহিনী* প্রথম খণ্ড, পৃ-৫৪)। *ঢাকার লোককাহিনীর* 'চূড়ামনি কিস্‌সার' ৪র্থ খণ্ডে উজির-নাজির, কোতোয়ালের ছেলে যে ছবি কুড়িয়ে পায় রাস্তায় সেই মেয়ের বর্ণনায় আছে যে, কালনাগিনীর চেয়ে কালো তার মাথার চুল; দু'কানে করমচার ফুল পরেছে অলংকারস্বরূপ।

অলংকার ব্যবহারে বৈচিত্র্য ছিল। গলার হার, হাঁসুলী, কানের দুল, নাকের নথ, বাজুবন্দ, চুড়ি, বালা, কঙ্কন ইত্যাদির বর্ণনা পাওয়া যায়। অলংকারের প্রতি বাঙালি মেয়ের দুর্বলতাও ছিল। *ঢাকার লোককাহিনী'র* 'চূড়ামনির কিস্‌সা'র ৬ষ্ঠ খন্ডে হীরা, জহরত, পান্নাযুক্ত একটি সুন্দর ও দামী হার দিয়েই রাজপুত্র তার অচেনা স্ত্রীর মন জয় করে নিয়েছিল (পৃ-৭৩)। অলংকার হিসেবে ফুলের ব্যবহারও ছিল। এজন্যই অনেক লোককাহিনীতে দেখা যায় মালিনী বিনা সুতার মালা সরবরাহ করছে রাজকন্যা তার খোঁপায় পরবে বলে।

আংটি ছেলে-মেয়ে উভয়ই পরতো। যাদুর আংটি রূপকথায় ও রোমাঞ্চ কথায় একটি বহু-ব্যবহৃত উপাদান। এছাড়া রাজা বাদশারা তাদের মুকুটে দামী পাথর পরতেন। *ঢাকার লোককাহিনী'র* 'চূড়ামনির কিস্‌সা'র ৩য় খন্ডে রাজার কান গাধার কানের মতো হওয়ায় তা ঢাকার জন্য রাজা "সোনা দানা, মতি-পান্না, হীরা-মানিক, লাল-জহরত দিয়া বড় কইরা একটি মুকুট" তৈরী করল (পৃ-৩৯)। লোককাহিনীর বর্ণনায় দেখা যায় মেয়েরা বিভিন্ন অলংকার পরছে। সাজ-সজ্জায় যে বাঙালি মেয়ে পটু ছিল তার উদাহরণ আগেই দিয়েছি। বিভিন্ন ভেষজ প্রসাধনী যেমন- হলুদ, চন্দন, সুগন্ধী, আরক ইত্যাদির ব্যবহার ছিল। অলংকারের প্রতিও ছিল তাদের দুর্নিবার আকর্ষণ। প্রিয় শাড়ীটি পরে পছন্দ মতো অলংকার জড়িয়ে তাম্বুল রাগে মুখ রঞ্জিত করে শেষ হতো বাঙালি রমনীর সাজ-সজ্জা। পোষাক, অলংকার আর রূপ চর্চার এই ঐতিহ্য উনিশ শতক পর্যন্ত চলে আসছিলো ।

আহার ও পানীয়

'ভাতে মাছে বাঙালি' প্রবাদটির সাথে জড়িয়ে আছে বাঙালি সমাজের খাদ্যাভ্যাসের এক দীর্ঘ ঐতিহ্য। প্রাচীনকাল থেকেই মাছ আর ভাত বাঙালির প্রিয় খাদ্য। সম্ভবত তারও আগে বাঙালির পূর্ব পুরুষ কৃষিজীবী অষ্ট্রিক-আলপিনোরাও ভাত আর মাছকে তাদের খাদ্য তালিকার প্রথমে স্থান দিয়েছিল। তবে বাঙালির খাবার হিসাবে ভাতের সর্ব প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় চর্যাপদের ৩৩নং চর্যায় ঢেণ্ঢন পাদের রচনায়। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন "উত্তর ভারতের

Dhaka University Institutional Repository

লোকদের যেমন সাধারণভাবে রুটি, বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রশায়ী সমতল ভূমির লোকদের এমনি ভাতই প্রধান খাদ্য" (পৃ-১১)।[১]

বাঙালির প্রিয় খাদ্য হিসাবে ভাতের প্রসঙ্গ বিভিন্ন লোককাহিনীতে ঘুরে ফিরে এসেছে। বাংলা একাডেমীর *ফোকলর সংকলন* ৭১-এর গবরার কিস্‌সায় জানা যায় ভাতের প্রতি বাঙালির প্রতিনিধি গবরার মনোভাব- "এই হোবরী কেলা আর ঘন কইর‍্যা দুধ জাল দিয়া আউষের চাইলের ভাত গরম গরম ফুপারে আর খায়, তাতে কি মজা হে কথা আর কি কমু" (পৃ-১৪)। *বাংলাদেশের লোককাহিনীর* মতিলাল বাশ্‌শাতেও দেখা যায় জৈঙ্গিয়া মাঝির প্রিয় খাবার সকালে পান্তা ভাত, দুপুরে গরম ভাত (পৃ-৮৭)। *ভাটি দেশের কিংবদন্তীতে* জানা যায় কালো সুফীর জন্যে ভাত তরকারী শান্তিতে সাজিয়ে পিড়ি পেতে বসে থাকে অম্বরী বিবি (একটি সঙ্গীতের জন্য, পৃ-৯৯)। দুইখ্যার বাপ ভাত খেতে এসে "ডাই উজলাইয়া দেহে কুদে কুঁড়ার জাউ" (*বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি: কথকথা*, পৃ-১২৫)। প্রিয় খাবার ভাত না পেয়ে তার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

মাছ মারার প্রসঙ্গও আছে লোককাহিনীতে। বাংলা একাডেমীর *লোক সাহিত্য সংকলন* ৮ম খন্ডে 'যুইগ্যা যুগিনীর কিস্‌সায়' যুইগ্যা মাছ ধরে পলো দিয়া। যুগিনী তা রান্না করে ওকে খাওয়ায়। ভাতের মূল অর্থাৎ ধানেরও রকম ফের ছিল। যেমন- কালা মানিক, আউষ, কালিজিরা, বিন্নী, পঙ্খীরাজ, শাইল, গন্ধবাস, বাসমতি ইত্যাদি। কৃষি প্রধান বাংলাদেশের চাষীরা খেটে খুটে এই সব সোনার মত ধান ফলাতো, তাদের বৌরা ঢেকিতে ধান ভেনে চাল করে রান্না করে রাখতো। সঙ্গে থাকতো মাছ তরিতরকারী। এভাবেই তৈরী হতো বাঙালি পরিবারের প্রিয় খাবারটি। এজন্যই ভাতের সাথে বাঙালির নাড়ীর যোগ এখনও কাটেনি। আধুনিককালে ঘর থেকে বের হলেই হরেক রকমের খাবার কিনতে পাওয়া যায়। আমরা তা কিনে খাইও। তবু ভাতই আমাদের প্রধান খাদ্য।

ভাতের প্রতি বাঙালির লোভ থাকলেও সফরকারীরা চিড়া ও গুড়ই সম্বল করে চলতেন। *ঢাকার লোককাহিনী* চূড়ামনির কিস্‌সায় প্রতিটি খণ্ডে দেখা যায় কিস্‌সাগুলোর কথক গুরু প্রায়ই তার শিষ্যকে দোকান থেকে চিড়া গুড় আনতে বলছেন। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* তৃতীয় খণ্ডে 'আলম সদাগর' কাহিনীতে দেখি দিনরাত নৌকা বেয়ে পরিশ্রান্ত মাঝিদেরকে খাওয়ার জন্যে " এক বস্তা চিড়া আর এক চাটকি গুড় দেয়া হয়েছে" (পৃ-৮৫)। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* 'মদন সাধু'র মাঝি পঞ্চাও একটানে চল্লিশ মন চিড়া ও আশি মন গুড় খেয়ে ফেলে। প্রাচীনকালে যেখানে পদব্রজে চলতে হতো, যখন এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাওয়ার জন্য কয়েকদিন ক নো কখনো কয়েক সপ্তাহও পর্যন্ত লেগে যেত সেখানে পথে রান্নার বাসন-কোসন ধোয়ার ঝামেলা এড়ানোর জন্যে বাঙালি চিড়া গুড় সম্বল করেই রাস্তায় বের হতো।

দরিদ্ররা সব সময় যে ভাতই খেতে পেত এমন নয়। নিতান্ত দরিদ্ররা কাঞ্জির জাউ খেত। বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতি কথকথায় দেখা যায় "দুইখ্যার বাপ ভাত খেতে এসে খুদে কুড়ার জাউ পায়। *ঢাকার লোককাহিনীর* 'চূড়ামনির কিস্‌সার' ৪র্থ খন্ডে রাজা, উজির, নাজির, কোতোয়ালের ছেলেরা যেতে যেতে যে বুড়ির বেড়ায় আশ্রয় নেয় সে বুড়িও কাঞ্জির জাউ খেয়ে দিন নির্বাহ করে (পৃ-৫৩)। গরীব মানুষের খুদ কুড়ার জাউ খাওয়ার প্রসঙ্গ আছে *বাংলাদেশের লোককাহিনী* তৃতীয় খণ্ডের 'বাদশার মার চালাকী' গল্পে। সেখানে বাদশা আগে ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। তখন শুঁটকি ভর্তা আর জাউ খেয়ে তার দিন নির্বাহ হতো। পরে বাদশা হয়ে তার এই প্রিয় খাবারটি খেতে না পারায় তার খুব আফসোস হয়। অতপর বাদশার মা চালাকী করে তার ছেলের জন্যে এ খাবারের বন্দোবস্ত করে।

ভাতের পরে পিঠা ছিল বাঙালির মজার খাবার। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* প্রথম খণ্ডের এক জোলা পিঠা এতোই ভালবাসতো যে, তার কাছে "পিঠার মতো মজার জিনিস আর দুনিয়ায় নাই (পৃ-৪৯)। তাই সে পিঠা গাছ রোপণ করে যাতে গাছ হয়ে ফল ধরলে প্রতিদিন পিঠা খেতে পারে। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'টেডন ও পরধ্যান্যা' কাহিনীতে পরধ্যান্যা পুলি পিঠা খায় বলে উল্লেখ আছে। বাংলা একাডেমীর *লোক সাহিত্য সংকলন ৮ম* খন্ডে 'হাজারী মালের কিস্‌সা'য় হাজারী মালের সফর সম্বল হলো চিতল পিঠা। একই সংকলনের 'জোলা জোলনির কিস্‌সা (ফরিদপুর)'-এ পিঠার উপকরণ বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, তাল ও উঁচা চালের গুড়ি দিয়া পিঠা বানানো হয়।

---

[১] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, সুভাষ মুখোপাধ্যায়-কৃত সংক্ষেপিত সংস্করণ, পূর্বোক্ত, পৃ-১০১।

Dhaka University Institutional Repository

পিঠা ছাড়া বাঙালির অন্যান্য খাবারের মধ্যে মিষ্টি জাতীয় খাবারের তালিকায় আছে আতপ চাল ও চিনির খির, দুধ, ঘি, পান্তা ভাত, মাঠা, মুড়ি, লাড়ু, মোয়া, খিচুড়ি, ছোলার ছাতু ইত্যাদি। মিষ্টির প্রসঙ্গ আছে *শিরনি* গ্রন্থের 'শিরনী' কাহিনীতে। সেখানে রহিম বাদশার গাঁথা মালায় সন্তুষ্ট হয়ে "সেই দিবস ধামা ভর‍্যা জিলাপি, মন্ডা, সন্দেশ ইত্যাদি অনেক দিল। তা দেখে মালিনী বড়ই রাগারাগি করবার লাগলো। কি ছাই ভস্ম দিয়া আমার ধামা ভর‍্যা দিল (পৃ-৩৩)"।

ফলের মধ্যে নারিকেল, লেবু, কামরাঙ্গা, সুপারি, বাদাম, খিরা, বাঙ্গী, আম, কাঁঠাল, জাম, কলা, শশা, আখ, আতাফল ইত্যাদির নাম পাওয়া যায়। সবজির মধ্যে লাউ, বেগুণ, কুমড়া, মুলা, আলু, ঝিঙ্গা, মাছ আলু, কচু, মানকচু ইত্যাদির নাম পাওয়া যায়।

বাঙালির খাবার তালিকায় এখনও ভাত-মাছ প্রধান। এরপরে আছে পিঠা। প্রাচীনকালেও তাই ছিল। মিষ্টি দ্রব্য বাঙালির প্রিয় খাবার তালিকায় জায়গা করে নিয়েছিল। নেশা দ্রব্যের মধ্যে তামাক ও পানের কথা জানা যায়। *ঢাকার লোককাহিনীর* 'চূড়ামনির কিস্‌সার' দ্বিতীয় খণ্ডে সাধু প্রকাশ্যে গঞ্জিকা সেবন করে। পান খাওয়া মেয়েদের মধ্যে খুব প্রচলিত ছিলো। বাঙালি রমনীদের বেলায় পানের লাল রসে ঠোঁট রাঙানোর বিষয়টি সাজ-সজ্জার পর্যায়ে পড়তো। আফিমের প্রচলন ছিল। ধনী লোকেরা আফিমে আসক্ত ছিল বলে মনে হয়। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডে আফিখোরদের নিয়ে বেশ কয়েকটি হাস্যরসাত্মক গল্প আছে। রাজা-বাদশারা সুরা পান করতেন। তাদের প্রাসাদে নাচমহল নামে একটি আলাদা মহলই ছিলো যাতে চলতে নাচগান, সুরা পান আর আমোদ-ফুর্তি।

নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যাদি

প্রাচীনকালে বাঙালির প্রতিদিনের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির বেশিরভাগই তৈরি হতো মাটি ও বাঁশ-কাঠ দিয়ে । মাটির তৈজসপত্র তৈরি করতো যারা তারা কুমার নামে পরিচিত ছিল। মাটির তৈজসপত্রের মধ্যে ভাত-তরকারী পাক করার জন্য হাঁড়ি-পাতিল ও ঠুলি, পানি রাখার জন্য কাচলা, গামলা, চাঁড়ি, ঘটি, পানি আনার জন্য কলসী, গাগরি, চাল ইত্যাদি জিনিষ রাখার জন্যে মটকা, কাচলা, তাগারি, চাল ধোয়ার জন্যে খাড়ি এবং ভাত খাওয়ার জন্য সানকি, বাটি এবং কাপড়-চোপড় ইত্যাদি রাখার জন্য সিন্দুক, ঝাপি, বাক্স, পেট্রেরা, ঝোলা ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায়।ইত্যাদি ব্যবহৃত হতো বলে লোককাহিনীতে উল্লেখ পাওয়া যায়।

ধান ভানার ও পিঠা কোটার জন্যে ঢেঁকি ও গাইল–সেহাইট-এর ব্যবহার ছিল। চাষাবাদের জন্যে লাঙ্গল, জোয়াল, মই, দড়ি, কাঁচি, কোদাল, বিন্না, সাবল, গাইতি, খন্তি ইত্যাদি ব্যবহার হতো। ফসল রাখার পাত্র হিসাবে ডুলি, ডোল ইত্যাদির উল্লেখ দেখা যায়। বাতাস করার জন্য ছিল বিচুন। মাছ ধরার জন্য জাল, পোলো ইত্যাদি ছিল। গরীবের ঘরে খাট-পালঙ্ক ছিল না। তাই গোপ গাই পাহাড়া দেওয়ার জন্য বলে "গোয়াল ঘরঅ একটা উগার বান্দঅ"।[১] এই উগার জিনিসটি এখনো কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত আছে। এতে মাটিতে শক্ত বাঁশের ছয়টি অথবা নয়টি খুঁটি তিন সারিতে পুঁতে তার উপর সুপারি গাঝ কিংবা বাঁশের বেতের তৈরি পাটাতন বিছিয়ে চৌকির রূপ দেয়া হয়। তার উপর পাতা হয় বিছানা। অত্যন্ত গরিব মানুষেরা উগার তৈরি করে তাতে শোয়। গ্রাম বাংলায় সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়িতে ধানের ডুলি এবং অন্যান্য বাক্স পেটরা রাখার জন্যও উগার তৈরি করতে দেখা যায়।

মাটি বহনের জন্য বাঁশের বেতের তৈরী উঁড়া, বসার জন্য পিড়ি ও মোড়া, শোয়ার জন্য চাটাই, কাঁথা, বালিশ, মাছ ধরার ওচা, ঝাড়ু দেয়ার জন্য হাচুন, ঝাঁটা, দরজা আটকানোর জন্য বেন্দা, পরিমাপের জন্য কুচি, কাঠা, শিকারের জন্য তীর, ধনুক, বল্লম, বর্শা, লেজা সড়কি, গোলাইল ও ফাঁদ ছিল। যেমন- বাংলা একাডেমীর *লোক-সাহিত্য সংকলন-৪২-*

---

[১] মতিলাল বাশ্‌শা , *বাংলাদেশের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ-৮১।

Dhaka University Institutional Repository

এর 'বক রাজার হাস্তর' কাহিনীতে ফাঁদ দিয়ে বক মারা হয় বলে জানা যায়। 'শিয়ালের কিস্‌সায়' বাঘ মারা ফাঁদে শিয়াল ধরা পড়ে। উপরে বর্ণিত শিকারের অস্ত্রগুলোর মধ্যে ফাঁদ ছাড়া বাকিগুলো আবার যুদ্ধাস্ত্র হিসাবেও ব্যবহৃত হতো।

রাজা-সওদাগরদের ব্যবহৃত জিনিষ ছিলো দামী। তাদের কাহিনীতে সোনা-রূপার পালঙ্ক, রূপোর পানদান, রূপার হুক্কা ইত্যাদির বর্ণনা পাওয়া যায়। রাজবাড়ীর বর্ণনায় সোনার পালঙ্কের প্রসঙ্গ আসবেই। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* প্রথম খণ্ডের 'তাম্বুল তরাসিনী' কাহিনীতে তাম্বুল তরাসিনী সওদাগরের ঘরে উঁকি দিয়ে "জরির পর্দার ফাঁকে সে দেখিল সোনার পালঙ্কে এক সুন্দর যুবা পুরুষ ঘুমাইতেছে" (পৃ-২১)।

বাংলাদেশের লোককাহিনী প্রথম খণ্ডের 'নবডং নবডং' কাহিনীতে আমরা পাই এক পাগল রাত্রিতে "কন্যার মন্দিরের দুয়ারের পাশে পরিয়া রহিল। কন্যা শিয়ড়ে সোনার প্রদীপ জ্বালাইয়া সোনার পালঙে হেলান দিয়ে শুইয়া রহিয়াছে আর মাঝে মাঝে সোনার পানদান হইতে সাজানো পান খাইতেছে"।[১]

লোককাহিনীতে বাঙালির ঘর-গৃহস্থালী ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে যতটুকু তথ্য পাওয়া গেছে তার সাথে আজকের দিনের পল্লী অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার কিছুটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তবে বিশ শতকে পুঁজিবাদী সভ্যতার প্রসার, শিল্পের বিকাশ প্রভৃতি কারণে সারা পৃথিবীতেই মানুষের জীবন যাপনের ধরন বদলে গেছে। সেই বদলের হাওয়ায় আধুনিক বাঙালি সমাজও তার বহুদিনের ঐতিহ্য থেকে সরে গিয়ে নুতন জীবন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে; বিশেষ করে শহর এবং শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলের ক্ষেত্রে এ কথা আরো বেশি প্রযোজ্য। সেখানে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালির জীবনযাত্রা ও জীবন-উপকরণ দুর্লভ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

---

[১] 'নবডং নবডং' *বাংলাদেশের লোককাহিনী*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ-১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

লোককাহিনীতে বাঙালির শিল্পচর্চা ও বিনোদন

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প-সাহিত্য

আধুনিক যুগে শিল্পকলার যে বিচিত্র জটিল রূপ দেখা যায় আদি ও মধ্যযুগের মানব সমাজে তার অস্তিত্ব ছিলো না। পদ্ধতিগত শিক্ষা ব্যবস্থা, সহজলভ্য উপকরণ, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে গত দু'শ বছরে শিল্পকলার সুক্ষ্মতর বিকাশ ঘটেছে। এবং সেই সঙ্গে এসেছে তার বৈচিত্র্য ও জটিল শ্রেণীধর্ম। সে তুলনায় আদি ও মধ্যযুগের শিল্পকলা নিতান্তই সরলধর্মী ।

আদি ও মধ্যযুগের সাধরণ মানুষ তার জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সব কিছুর জন্যই নির্ভর করতো দুটো হাত-পা এর শ্রম, মস্তিষ্কের বুদ্ধি আর ঐতিহ্যগত অভিজ্ঞতার উপর। আজকের মতো যান্ত্রিক সহায়তা সে সময় ছিলো না। ছিলো না প্রকৃতির বিরুদ্ধ শক্তি প্রতিরোধের জন্য পৃথিবীব্যাপী সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা । জীবন নিবার্হ এবং তাকে আরও সুন্দর ও আকষণীয় করার জন্য মানুষ নিজস্ব শ্রমের উপরই নির্ভরশীল ছিলো। তেমনি আত্মার সৃজনশীল উদ্দীপনায় সাড়া দেয়ার প্রক্রিয়াটিও ছিলো অনিকাংশে ব্যক্তি-নির্ভর। তাই জীবন নির্বাহ অর্থাৎ বেচেঁ থাকা এবং জীবন সাজানো অর্থাৎ তাকে সৌন্দর্যময় করে তোলা ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করা --এ উভয়বিধ তাড়না অনেক ক্ষেত্রে এক হয়ে প্রকাশ পেত।

আদি ও মধ্যত্রযুগের মানুষের রান্নাবান্না ও জিনিসপত্র রাখার জন্য প্রয়োজন হতো মাটির হাড়ি পাতিলের। কুমার তা নির্মাণ করে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতো। এ ব্যবহারিক শ্রমের মধ্যেও ফুটে উঠতো তার সোন্দৌর্যবোধ ও সৃষ্টিশীলতা। ফলে এর মধ্যেই বিকশিত হয় মৃৎপাত্র নির্মাণের শিল্পকলা যা পরে মৃৎশিল্প নামে অভিহিত হয়েছে। সুতরাং কুমারের হাতে বিকশিত এই শিল্প ব্যহারিক শিল্প। অর্থাৎ এর বিকাশ ঘটেছে প্রয়োজনে।

জীবন নির্বাহের অত্যাবশ্যকীয় কর্মকাণ্ড ছাড়াও মানুষ আরো কিছু করতো, করার প্রয়োজন বোধ করতো। যার পেছনে সক্রিয় ছিলো আত্মার উদ্দীপনা । তার মনের জন্য প্রয়োজন ছিলো আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্র। জীবনকে অনুকরণের জন্য প্রকাশ ক্ষমতা রপ্ত করার দরকার ছিলো তার। তা ছাড়া বিনোদনের প্রশ্নটিও জড়িত ছিলো। এসব কারণে ব্যবহারিক প্রয়োজন ছাড়াও মনের তাগিদে অন্য ক্ষেত্রেও মানুষের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে। এগুলো হলো চিত্রকলা, সঙ্গীত, ভাস্কর্য ইত্যাদি। এগুলো ব্যবহারিক শিল্প নয় বরং বলা যায় মিানস-শিল্প। তাই বাংলা লোককাহিনীতে আদি ও মধ্যযুগের বাঙালির শিল্পচার্চা তথ্য অনুসন্ধানের জন্য সে সময়ের শিল্প কলাকে দুভাগে ভাগ করে নেয়া হয়েছে: (১) **মানস-শিল্প**: সঙ্গীত, চিত্রকলা, সাহিত্য, ভাস্কর্য, নৃত্যকলা, অভিনয় প্রভৃতি। (২) **ব্যবহারিক শিল্প**: মৃৎ শিল্প, কাষ্ঠ শিল্প অলংকার শিল্প, বস্ত্রও শিল্প ইত্যাদি।

মানস-শিল্প :

সঙ্গীত ও নৃত্যকলা : প্রাচীন বাঙালি সমাজে সঙ্গীত ছিলো সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বিকশিত শিল্প। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ যে গীত হতো তার প্রমাণ পাওয়া যায় চর্যাগুলোতে রাগ-তালের উল্লেখ দেখে। মধ্যযুগের বেশ কিছু সাহিত্যিক নিদর্শনেও গানের উল্লেখ আছে। মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত হয় সঙ্গীত বিষয়ক বেশ কিছু গ্রন্থ।

সঙ্গীতের প্রতি বাঙালির আদিকালের অনুরাগ বিভিন্ন লোককাহিনীতেও প্রকাশ পেয়েছে। লোককাহিনীতে একদিকে গীতের মাধ্যমে নায়ক-নায়িকার প্রেমার্তি প্রকাশ করার প্রবণতা, অন্যদিকে, শুধু শিল্পকলা হিসাবেই সঙ্গীত সাধনা ও সঙ্গীতানুরাগের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। *ঢাকার লোককাহিনী'র* 'রাজকুমার সফর চান ও সোবুজ নিশাপরীর কিস্‌সা',

Dhaka University Institutional Repository
বাংলাদেশের লোককাহিনী তৃতীয় খণ্ডের 'আয়নামতি', *ঠাকুরদাদার ঝুলি'র* 'মালঞ্চমালা' প্রভৃতি জনপ্রিয় কিস্‌সাগুলোয় নায়ক-নায়িকা গানের মাধ্যমে তাদের ভাব প্রকাশ করে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়।

বেশ কিছু লোককাহিনী আছে যেখানে সঙ্গীত এককভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। সেখানে কণ্ঠসঙ্গীত এবং যন্ত্র-সঙ্গীত উভয়েই স্ব স্ব মহিমায় উজ্জ্বল। *বাংলা একাডেমীর লোকসাহিত্য সংকলন -৪২-* এর 'ময়ূর কাতারের কিস্‌সা'য় আমরা জানতে পারি এক রাজকুমার মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও সঙ্গীতের মধুর সুরে সৈন্যদের মোহিত করে প্রাণ রক্ষার সুযোগ পেয়েছিলো। রাজকুমার ভিনদেশের এক রাজকুমারীর সাথে প্রেম করতে গিয়ে ধরা পড়ে। তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া এবং তা কার্যকর করার জন্য কবর খনন করা হয়। তখন রাজকুমার গানের সুরে তার পোষা ময়ূরের সাহায্য চাওয়ার গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে সৈনিকদের কাছে একটি গান গাওয়ার অনুমতি চায়। অনুমতি পাওয়ার পর " সেই ছেলেটি কবরের দুই পাড়ে দুই পা রেখে গান শুরু করলো।-----ছেলেটির কণ্ঠস্বর এত মধুর ছিলো যে সৈন্যরা তার গানের সুরে তন্ময় হয়ে রইল "(পৃ-৪৯)।

পূর্ব-পাকিস্তানী লোককাহিনীর 'বানর বাদশা' কাহিনীতে বানর বাদশা পণ্ডিতকে সঙ্গীতের সুরে মোহিত করে পাঠশালায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় (পৃ-৭৫)। *ভাটিদেশের কিংবদন্তীর* 'নদী ফুলেশ্বরী' কাহিনীতে প্রখ্যাত কবি দ্বীজ বংশীদাস তার মধুর কণ্ঠে পালাগান শুনিয়ে দস্যু কেনারামকে চিরতরে ভালো মানুষে রূপান্তরিত করেন।

রাজ-রাজড়াদের কাছেও সঙ্গীতের বিশেষ গুরুত্ব ছিলো। *শিরনী* গ্রন্থের 'সাত শ তোতার কিস্‌সায়' দেখা যায় এক বেশ্যা দু'মাস ধরে কীর্তন শিখে এসে সাতদিন ধরে কীর্তন শুনিয়ে রাজাকে মোহমুগ্ধ করে (পৃ-৯৯)। *কিংবদন্তির বাংলা'র* 'নই রাজা' কাহিনী থেকে জানা যায় এক রাজা সঙ্গীতে বিহ্বল হয়ে রাজকীয় কাযকর্মে শৈথিল্য প্রদর্শনের কারনে শেষ পর্যন্ত রাজ্যহারা হন। তার নাম নই রাজা। তার সঙ্গীতানুরাগের বর্ণনায় বলা হয়েছে:

"নই রাজা গানের খুব ভক্ত ছিলেন। তার নই মহলে দিন রাত্রি বিভিন্ন গায়কদের সমাগম ছিলো। তিনি নিজে গান জানতেন না। কিন্তু গায়কগণ গান ধরলে তিনি ভাবে বিহ্বল হয়ে মাথা নাড়তেন আর বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তর্জনীতে তুড়ি দিতেন।"[১]

শুধু নই রাজা নয় লোকাকাহিনীর প্রায় প্রতিটি রাজা বাদশাই সঙ্গীতের ভক্তরূপে চিত্রিত হয়েছেন। তাদের দরবারে সঙ্গীত-শিল্পীরা এসে সঙ্গীত পরিবেশন করতো। রাজা বাদশারা সঙ্গীতশিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

কণ্ঠশিল্পের মতই যন্ত্রসঙ্গীতও সমানভাবে আদৃত ছিলো। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বাঁশি ছিলো সবচেয়ে জনপ্রিয়। *ঢাকার লোককাহিনী'র* 'চুড়ামণির কিস্‌সা'র তৃতীয় খণ্ডে সত্য মুল্লুকের দুই সন্ন্যাসীর একজন রাজাকে গান শোনান, অন্যজন তাকে বাঁশি বাজিয়ে শুনিয়েছিলেন। সন্ন্যাসীদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বাঁশির বাজনা অধিকতর সমুধুর বলে রায় দিয়েছিলেন (পৃ-৩৯)।

বাংলাদেশের কিংবদন্তীর 'নিশিথে বাঁশরী বাজে' কাহিনীতে শেরশাহর বেগম জোবেদা ফকিরের বাঁশীর শব্দে উতলা হয়ে ঘর ছেড়েছিলেন। *বাংলাদেশের লোককাহিনীর* দ্বিতীয় খণ্ডের 'অকুল বকুল'-এ অষ্টসিদ্ধ রাজার বাঁশির সুরে মোহিত হয়ে এক চাষী-বউ তার স্বামীকে হত্যা করে রাজার সাথে মিলিত হতে এসেছিলো। লোককাহিনীতে এমন অনেক উদাহরণই ছড়িয়ে আছে।

বাঁশি ছাড়া আর যে সব বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলো হলো লাউ, ডুগডুগি, কোল, করতাল, ঢোল, জুরি, একতারা, দোতারা, সারিন্দা, সেতার, ডগর, শানাই ইত্যাদি।

সঙ্গীতের সাথে সাথে নৃত্যও বাঙালি সমাজে জনপ্রিয় ছিলো। *বাংলাদেশের লোককাহিনী* তৃতীয় খণ্ডের 'আয়নামতি'-তে দেখি আয়নামতির দিক থেকে হিরণ বাশ্‌শার মন ফেরানোর জন্য নাচে গানে পটু ১২ জন সুন্দরী যুবতী এনে হিরণ-এর সামনে সারাদিন ধরে নাচগান পরিবেশন করানো হয় (পৃ-৫২)। *বরিশাল জেলার লোকসাহিত্য-এ* 'নকীব রাফেজা ও

---

[১] আশরাফ সিদ্দিকী, *কিংবদন্তির বাংলা*, পূর্বোক্ত 'নই রাজা', *পৃ-১৬৫।*

Dhaka University Institutional Repository

পরীর কিস্‌সা'য় আমরা পরী রাজ্যে বিরাট নাচগানের বাৎসরিক অনুষ্ঠানের কথা জানতে পারি। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'সোনাফর বাদশা' কাহিনী'-তে জানা যায় নাচগানকে পেশা করে বাঈজীরা জীবন নির্বাহ করতো।

লোককাহিনীর এসব তথ্য থেকে আন্দাজ করা যায় সঙ্গীত ও নৃত্য সে সমাজে জনপ্রিয় ছিলো। রাজা বাদশারা প্রতিদিন সঙ্গীত শোনার জন্য সভায় কণ্ঠশিল্পী রাখতেন। এরা নৃত্যেও পটু হতো। 'নাচমহাল' বলে যে একটি রাজকীয় মহলের উল্লেখ দেখা যায় তা ছিলো রাজা বাদশাহদের নাচগান উপভোগ ও সুরা পানের আস্তানা।

সাধারণ বাঙালিও যে সঙ্গীতে অনুরক্ত ছিলো তা একটু আগে উল্লেখিত ময়ূর কাতারের কিস্‌সা, অষ্টসিদ্ধ রাজার কাহিনী এবং বানর বাদশা কাহিনী থেকে ধারণা করা যায়।

চিত্র-শিল্প : *ঢাকার লোককাহিনীর* 'চূড়ামণির কিস্‌সা'র ৪র্থ খণ্ডে আমরা পাই উজির-নাজির কোতোয়ালের ছেলে এক সওদাগর বাড়িতে আশ্রয় নিতে চাইলে দারোয়ান তাদেরকে জানায় যে এখানে আশ্রয়নিতে হলে নতুন কোন একটি জিনিস দেখাতে হয়। তখন কোতোয়ালের পুত্র বলে, "রাস্তা দিয়া আসবার সময় এক যুবতী মাইয়ার ছবি আমি পাইছি। এমন সুন্দরী মাইয়ার ছবি আর আমি জীবনে দেহি নাই" (পৃ-৫৭)। ছবিটির বর্ণনায় জানা যায় যে এটি এতই সুপরিস্ফুটিত একটি চিত্র যে মেয়েটির কানে যুক্ত করমচার ফুল পর্যন্ত সনাক্ত করা যায়।

উপরোক্ত কাহিনীটির কাল নির্ণয় কঠিন। শব্দ ব্যবহার ছাড়া কাহিনীটিতে কোন মুসলিম উপাদান নেই। পরিবেশ বর্ণনায় দেখা যায় গভীর জঙ্গলে আবৃত চারপাশ। এ ছাড়া আছে এমন কিছু যাদুর মোটিফ যা প্রাচীন কালেরই সৃষ্টি। এসব তথ্য থেকে কাহিনীটির সঠিক সময় নির্দেশ করা কঠিন হলেও এর প্রাচীনতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। কাহিনীটির উদ্ভব বড় জোর ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত পিছিয়ে নেয়া যেতে পারে। এবং তা সঠিক হলে লোককাহিনীর বাঙালি সমাজের চিত্র-শিল্পও অন্তত সাত শ' বছরের পুরানো বলে মনে হয়। পরবর্তী সময়ের অনেক কাহিনীতে চিত্র বা পটের উল্লেখ পাওয়া যায়। *ঢাকার লোককাহিনী'র* 'রাজকুমার সফরচান ও সোবুজ নিশা পরীরর কিস্‌সা'য় সফর চান শাড়ির মধ্যে অঙ্কিত পট দেখেই তার প্রেমিকার প্রেমে পড়েছিলো । *যশোরের লোককাহিনীর* 'বিভাস কন্যা' কিস্‌সায় দেখি রাজপুত্রের দোস্ত বানিজ্য থেকে ফেরার সময় রাজপুত্রের ফরমাশ মতো বিভাস নিয়ে এসেছে। আসলে বিভাস হচ্ছে এক রাজকন্যার নাম, মন্ত্রীপুত্র তার ছবি নিয়ে এসে উপহার দিয়েছিলো বন্ধুকে।

বরিশাল জেলার লোকসাহিত্যে 'নকীব, রাফেজা ও পরীর কিস্‌সা'য় আমরা লক্ষ্য করি নকীবের বিয়ের খোঁজ না পেয়ে বাদশা নকীবের অনেকগুলো পট তৈরি করে বিভিন্ন রাজ্যে পাঠিয়ে দেয়। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'চিঙ্গিজান বাদশা' কাহিনীতেও উজির হরবোলা সুন্দরীর পট নিয়ে এসেছিলো বাদশার ছেলেকে দেখানোর উদ্দেশ্যে।

চিত্র শিল্পের উল্লেখ অবশ্য কম। রাজা-বাদশাদের গল্পেই এর সীমিত বিচরণ। হয়তো পট আঁকার জন্য পটুয়াকে যে পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয়ার প্রয়োজন হতো তা সাধারণ বাঙালির সাধ্যের মধ্যে ছিলো না। কিন্তু লোককাহিনীতে পটের উল্লেখ থেকে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে চিত্র শিল্প তখন গণ-মাধ্যম হয়ে না উঠলেও রাজা-বাদশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছিলো।

ভাস্কর্য : ভাস্কর্যের উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র দুটি লোককাহিনীতে। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'পাঁচতোলা কন্যার কিস্‌সা'য় জানা যায় তখন পতুল নির্মাণকলা পরিচিত ও প্রচলিত ছিলো; বলা নিস্প্রয়োজন যে তা মাটির পুতুল নয়। কারণ শত্রু রাজ্য থেকে প্রদত্ত তিনটি পুতুল পেয়ে রাজার কনিষ্ঠ পুত্র পুতুলের কান দিয়ে সুতো ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে দেখে তা পুতুলের পেট অবধি যায় কি না। মাটির পুতুল ভেতরে এতটা ফাঁপা হতে পারে না। তবে পুতুলগুলো পাথরের ভাস্কর্যও নয়। হয়তো এমন এক মাধ্যমে সেগুলো নির্মিত যা ক্রমে লোপ পেয়েছে। *বাংলাদেশের কিংবদন্তীর* 'একটি প্রেমের জন্য' কাহিনীতে জানতে পারি যুবরাজ অনিরুদ্ধ প্রেমিকা উষাবতীকে লাভ করার জন্য উষাবতীর বাবার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে যুদ্ধ জয়ের কৌশল হিসাবে তার সহকারী গ্রীক সেনাপতি মার্বেল দিয়ে একটি বৃষ নির্মাণ করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য : সুকুমার কলার মধ্যে মৌখিক সাহিত্যের বিকাশের প্রমাণ পাওয়া যায়। যে লোককাহিনী আমাদের আলোচ্য বিষয় তাতেও কিস্‌সা (অর্থাৎ লোককাহিনী) বলার রেওয়াজ চালু ছিলো বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। *যশোরের লোককাহিনীর* 'বিভাস কন্যা'য় জানা যায় বিভাস কন্যা কিস্‌সার আসর বসিয়ে তাতে কিস্‌সা বলে তার স্বামীর সাথে পরিচিত হয়। বিনোদনের প্রয়োজনেই কিস্‌সা বলা হতো। প্রাচীনকালের বাঙালি সমাজে বিকশিত মৌখিক সাহিত্যের বড় প্রমাণ অদ্যাবধি প্রচলিত হাজার হাজার লোককাহিনী। তাই এ বিষয়টি নিয়ে আলাদাভাবে বিস্তৃত আলোচনা করার প্রয়োজন নেই বলে মনে করি।

ব্যবহারিক শিল্প

ব্যবহারিক শিল্প তা-ই যা প্রাচীন যুগের মানুষের প্রয়োজন মেটাতে বিকশিত হয়েছে। মানুষ আশ্রয়ের জন্য গৃহ, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার জন্য নিত্য ব্যবহার্য্য তৈজসপত্র, লজ্জা নিবারন ও সৌন্দর্য বিকাশের জন্য বস্ত্র-অলংকারাদি ও প্রসাধন সামগ্রী তৈরি করা শিখে। কিন্ত প্রয়োজনে উদ্ভাবিত এই নিমার্ণ শিল্পের মধ্যেও ফুটে উঠতো দক্ষতা, সুক্ষতা, সৌন্দর্যবোধ-- তাদের সৃষ্টিশীল আত্মর স্পন্দন।

ব্যবহারিক শিল্পের মধ্যে বাঙালির গৃহ নির্মাণ শৈলি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এখানে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালি সমাজের বস্ত্র-শিল্প, কাঠ-শিল্প এবং অলংকার নির্মাণকলার পরিচয় দেয়া হয়েছে।

বস্ত্র-শিল্প: বস্ত্র শিল্পে বাঙালির সুনাম অনেক দিনের। এমনকি প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বাঙালির মসলিনের প্রশংসা করে লিখেছেন যে, এই বস্ত্র পৃথিবী বিখ্যাত ছিলো। মধ্যযুগেও ঢাকার মসলিনের সুনামই ছিলো আলাদা। বাংলা লোককাহিনীতে বাঙালির বস্ত্র-শিল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে অনেক কাহিনীতেই তাঁতীর উল্লেখ দেখি। *বাংলাদেশে লোককাহিনী* প্রথম খণ্ডে 'পানপাতা' কিস্‌সায় এবং বাংলা একাডেমীর *লোক সাহিত্য সংকলন-৮*-এর 'এক যুইগ্য ও যুগিনীর' কিস্‌সা থেকে জানা যায় গ্রামেই বস্ত্রশিল্প গড়ে উঠেছিলো এবং এ পেশার সাথে জড়িতদেরকে যুগী বা তাঁতী বলা হতো।

তাঁতীরা বিভিন্ন মানের কাপড় তৈরি করতো। ক্রয়ক্ষমতা অনুযায়ী, গৃহস্থ, মহাজন, সওদাগর, ও রাজ-রাজড়ারা তা পরিধান করতো। স্বভাবতই পদবী ও ক্রয় ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন পেশার লোকদের জন্য তৈরি কাপড়ের মানও ভিন্ন হতো।

রাজা-বাদশাদের স্ত্রী-কন্যাদের ব্যবহার্য শাড়ির অনেক ধরন ছিলো। এর মধ্যে অগ্নিপাষ্ট, গঙ্গাজল, গন্ধবাস, হিয়া ইত্যাদি বিখ্যাত ছিলো। এগুলো ছিলো দামী শাড়ি। *কিশোরগঞ্জের লোকাহিনী'র* দ্বিতীয় খণ্ডের 'চিঙ্গিজান বাদশার কাহিনী'তে জানা যায় গুয়াকুল শাড়ি অমূল্য জিনিস---কথকের মতে এর দাম 'হাজার টেহা'।

ছেলেদের পোষাক নির্মাণে ব্যবহার্য বস্ত্রের মধ্যেও উৎকর্ষগত বিভাজন ছিলো। এ জন্য লোককাহিনীতে 'বাশ্‌শাহী পোষাক' , 'সদাগরী লেবাস', 'সৈন্যের পোষাক' কথাগুলোর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

মধ্যযুগে জরীযুক্ত কাপড়ও উদ্ভাবিত হয়েছিলো বলেই মনে হয়। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী'র* দ্বিতীয় খণ্ডের 'তাম্বুল-তরাসিনীতে' দেখা যায় নদীর ঘাটে সওদাগরের নৌকা ভিড়লে তাম্বুল তরাসিনী উঁকি দেয় এবং:

"জরীর পর্দার ফাকে সে এক কামরায় দেখিল সোনার পালঙ্কে এক সুন্দর যুবা পুরুষ ঘুমাইতেছে।" (পৃ-২০)।

অন্যান্য কাপড়ের মধ্যে ধূতি, রুমাল ও তহবন্দ, ইজের, টুপি, পাগড়ি ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

মৃৎ শিল্প : বাঙালির মৃৎ শিল্পের ঐতিহ্য অনেক দিনের। মৃৎ শিল্পের এবং এর সাথে জড়িত পেশাজীবীদের সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। তবে আমরা জানতে পারি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম ব্যবস্থায় প্রয়োজনে মৃৎ শিল্পের বিকাশ ঘটেছিলো। লোককাহিনীতে মাটির তৈরি বিভিন্ন তৈজসপত্রের উল্লেখ থেকে আন্দাজ করা যায় বাঙালির নিত্য দিনের জীবনযাত্রা অনেকটাই মৃৎ শিল্পের উপর নির্ভরশীল ছিলো। তারা যেসব জিনিসপত্র ব্যবহার করতো তার অধিকাংশই ছিলো মাটি দিয়ে তৈরি। মাটির নির্মিত বিভিন্ন তৈজসপত্রের মধ্যে প্রদীপ, তৈলাধার, তাগারি, কাছলা, চাঁড়ি, শানকি, বাটি, হাড়ি-পাতিল, ঠুলি, মটকা-মটকি, ঘটি ইত্যাদি প্রধান। তৈলাধার তেল রাখার জন্য, তাগারি বড় গামলার মতো--জিনিস পত্র রাখা ও পরিবহনের জন্য, কাছলা বড় ডেকচির মতো--ধানচাল কিংবা পানি রাখার জন্য, চাঁড়ি পানি সংরক্ষণ এবং গরুর পানি ও খাবার দেয়ার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতো। এ ছাড়া আছে মাটির মূর্তি যা একদিকে হিন্দুদের ধর্ম-চর্চার উপকরণ এবং অন্যদিকে সৃজনশীল আবেগের প্রকাশ হিসাবে চিহ্নিত।

কাঠ-শিল্প: বাঙালি তার প্রয়োজনেই কাঠ শিল্পেও দক্ষতা অর্জন করেছিলো। লোককাহিনীতে আমরা বিভিন্ন কারুকাজময় খাট-পালঙ্ক, দরজা-জানালা, সিংহীদরজা, সোয়ারী ইত্যাদির পরিচয় জানতে পারি। সাধারণের ব্যবহার্য কাঠের দ্রব্যের মধ্যে ঢেঁকী, গাইল-সেহাইট, পিঁড়ি, ঢেওয়া ও হাতা (চামচ জাতীয়), ছোটে ছোটে কৌটা, বাক্স, সিন্দুক ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়।

অলংকার শিল্প: অলংকার শিল্প ছিলো মুল্যবান বিষয়। লোককাহিনীতে প্রধানত স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত অলংকারের কথাই জানা যায়। এর সাথে জড়িত বেনে নামে পরিচিত গোষ্ঠীটি মোটামুটি অর্থ-বিত্তের মালিক ছিলো। অলংকার রাজা-বাদশা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের কাছে প্রিয় বস্তু ছিলো বিধায় বেনেদের কদর ছিলো। রূপকাহিনীগুলোত দেখা যায় সোনার পালঙ্কের প্রসঙ্গ বার বার আসছে। আন্দাজ করা যেতে পারে তখন রাজাদের খাট-পালঙ্কে সোনার কাজ থাকতো। এছাড়া মাথার মকুট, পোষাক ইত্যাদিতেও দামী স্বর্ণ অথবা দামী পাথর ব্যবহারের রেওয়াজ ছিলো।

মেয়েদের গলার হার ছিলো খুবই জনপ্রিয়। গলার হার নির্মাণেও দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং সৃজনশীল চিন্তার প্রয়েজন হতো। *ঢাকার লোককাহিনী'র* 'চূড়ামণির কিস্‌সার' ষষ্ঠ খণ্ডে আমরা দেখি রাজার ছেলে হীরা, মতি পান্না দিয়ে এমন এক হার বানায় যাতে তার অচেনা স্ত্রী হারের লোভে তাকে একটি চুম্বনের সুযোগ দেয়। এসব জিনিসের সৌন্দর্যের বর্ননা থেকে বোঝা যায় বেনেরা এসব কাজে দক্ষ ছিলো।

লোককাহিনীর তথ্য থেকে আমরা জানতে পারছি একদিকে বাঙালি তার প্রয়োজন মেটাবার জন্য জন্ম দিয়েছিলো ব্যবহারিক শিল্পের যা সৌন্দর্যবোধের সাথে মিলে ক্রমে কালজয়ী শিল্পে উত্তীর্ণ হয়। অন্যদিকে তার, মনের সৃষ্টিশীল তাড়নায় সাড়া দিয়ে সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা ইত্যাদি সকুমার কলায় খুঁজে পেয়েছিলো তার অভিব্যক্তির পথ। বাংলা লোককাহিনীর তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি বাঙালির সঙ্গীত ও শিল্পচর্চার ঐতিহ্য অনেক দিনের। মৃৎ শিল্প, বস্ত্র শিল্প, কাঠ শিল্প প্রভৃতি শিল্পে তারা পৃথিবীর আর সব সভ্য জাতির মতই সমৃদ্ধ ছিলো। আধুনিক কালে পুঁজির বিকাশ এবং পুঁজিবাদী সমাজের বস্তুবাদী মনোভঙ্গির কারণে বাঙালির সেই গৌরবের দিন লোপ পেয়েছে কিন্তু তার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে লোককাহিনীর ভাঁজে ভাঁজে।

ক্রীড়া ও বিনোদন

লোককাহিনীতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালি সমাজের বিনোদন ও আনন্দ-উল্লাসের কথা জানা যায়। এর মধ্যে খেলাধূলা, নাচগান, যাদু বা ভেলকিবাজী, শিকার ইত্যাদি প্রধান। নগর ও গ্রামাঞ্চলের মানুষের বিনোদনের উপায় ও উপকরণের মধ্যে পার্থক্য ছিলো। রাজা-বাদশাদের বিনোদনের পন্থা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানেও তাদের অর্থ-বিত্তের প্রকাশটা প্রকট।

Dhaka University Institutional Repository

শিকারঃ বিনোদনের উপায় হিসাবে শিকার রাজা বাদশাদের নিকট প্রিয় ছিলো। রাজা বাদশাদের নিয়ে সৃষ্ট লোককাহিনীর প্রায় প্রতিটিতেই দেখা যায় রাজা শিকারে যাচ্ছেন। সঙ্গে উজির, সেনাপতি,সভাষদদের অনেকে। আর আছে সাধারন সৈনিক, তাবু, খানাপিনা ও অন্যান্য জিনিসপত্রসহ নফরের দল। যাতে তার আরাম আয়েসের ঘাটতি না হয়। কারন শিকারও তাদের কাছে এক ধরণের বিলাসিতা।

বাংলাদেশের লোককাহিনী দ্বিতীয় খণ্ডের 'বেভুল ছিপাই'-এ আমরা এক বাদশার আয়েসী শিকার অভিযানের কথা জানতে পারি (পৃ-৪৮)। *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'চিঙ্গিজান বাদশা' কাহিনীতেও ফালিদ বাদশার শিকার অভিযানের উল্লেখ আছে (৭১)। সে কাহিনীতে জানা যায় ফালিদ বাদশা শিকারে বের হয়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে যায় এবং শেষে এক 'বেঘুর' জঙ্গলে গিয়ে উপস্থিত হয়। তখন শিকারের উপলক্ষে প্রকৃতির শোভা-সমৃদ্ধ বনাঞ্চলে ভ্রমণের কাজটিও সম্পন্ন হতো। *যশোরের লোককাহিনীর* 'আব্দুল্লা বাদশা'-তেও শিকারের প্রসঙ্গ আছে।

বাংলাদেশের লোককাহিনী তৃতীয় খণ্ডের 'আয়নামতি' কাহিনীর নায়ক হিরণ শিকারে একরকম নেশাগ্রস্ত। সে প্রায় প্রতিদিনই গুলাইল নিয়ে শিকারে যেত। এ রকম নিত্য শিকার অভিযানেই একদিন সে আয়নামতির দেখা পায় (পৃ-৫১-৫২)।

শিকার ছিলো একেবারেই রাজকীয় ব্যাপার। হাতী-ঘোড়া, লোক-লস্করসহ এক রাজ্য ছেড়ে আরেক শিকার শিকার অভিযানে বের হওয়ার সঙ্গতি সাধারণ মানুষের ছিলো না। নিষাদ ও ব্যাধ জাতি যে শিকার করতো তা ছিলো তাদের পেশা--নিত্য দিনের কর্ম। সেখানে বিনোদনের কিছু ছিলো না।

নাচগানঃ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, বিনোদনের উপায় হিসাবে নগর পর্যায়ে নাচগান প্রচলিত ছিলো। বস্তুত সঙ্গীত ও নৃত্য রাজা-বাদশাসহ সাধারণ মানুষের কাছেও জনপ্রিয় ছিলো। রাজারা রাজসভায় নর্তকী রাখতেন। রাজপ্রাসাদে আলাদা নাচমহল ছিলো। চিত্ত বিনোদনের জন্য রাজা-বাদশারা বাঈজীর গান শুনতেন বা নর্তকীদের নাচ উপভোগ করতেন। *কিংবদন্তির বাংলার* 'নই রাজা' কাহিনীর নই রাজা নৃত্য ও সঙ্গীতে ডুবে থাকতেন বলে জানা যায়।

কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী দ্বিতীয় খণ্ডের 'সুফিয়ানী বাদশা'য় শাহজাদা জহুর পরীকন্যা আলম আরার প্রেমে অর্ধ-উন্মত্ত অবস্থা ধারণ করলে চিত্ত বিনোদনের মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য রূপসী নাম্নী নৃত-গীতে পটু এক যুবতীর প্রাণান্ত চেষ্টার কথা উল্লেখ আছে।

পূর্বোক্ত সংকলনের 'শাহশান বাদশা' কাহিনীতে দেখা যায় শাহশানের পিতার এক বন্ধু স্থানীয় সওদাগরের শহরে আমোদ-প্রমোদের অনেক ব্যবস্থা ছিলো যার মধ্যে নাচ-গানের উল্লেখ আছে।

বরিশাল জেলার লোকসাহিত্যে 'নকীব, রাফেজা ও পরীর কিস্‌সা'য় দেখা যায় পরীস্থানে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিরাট নাচগানের আয়োজন করা হতো। আমরা ধরে নিতে পারি এ অনুষ্ঠান আসলে পরী সমাজের গণ-বিনোদনের উপায়।

চিত্ত-বিনোদনের উপায় হিসাবে কিস্‌সার আসরের কথাও আমরা জানতে পারি। বাংলা একাডেমীর *লোক-সাহিত্য সংকলন* দ্বিতীয় খণ্ডের 'ধার্মিক রাজার কিস্‌সা'য় জাহাজের পাহারারত দুই ভাইয়ের ছোট ভই বড় ভাইকে কিস্‌সা বলার অনুরোধ করে যাতে ঘুম না আসে।

একটি লোককাহিনীতে জনৈক জোলা তার স্ত্রীর পরামর্শে রাজবাড়িতে কথা শুনিয়ে রোজগার করতে গিয়েছিলো বলে উল্লেখ আছে। কাহিনীটিতে রাজার চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায় তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

Dhaka University Institutional Repository

" জোলা রাজ দরবারে পৌছিয়া দেখিল লোকজনে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে। কেহ গান গাহিয়া, কেহ কিস্‌সা কাহিনী শুনাইয়া, কেহ হাসি ঠাট্টা করিয়া রাজাকে আনন্দ দিতেছে। জোলা এত আজ্ঞাম দেখিয়া মনমরা হইয়া দরবারের এক কোণে বসিয়া রহিল।"[১]

সে যুগের বাঙালি সমাজে রাজা-বাদশারা শিকার, নর্তকী-বাঈজী আর সুরার মধ্যে চিত্ত বিনোদনের উপায় খুঁজতেন। অন্যদিকে, সাধারণ মানুষ খেলাধূলা, লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত, কিস্‌সার আসর প্রভৃতির মধ্য দিয়েই তাদের আনন্দের খোরাক বুঝে নিতেন।

ক্রীড়া: বাংলাদেশে অনেক খেলাধূলা ছিলো যা শত শত বছর আগে থেকেই সাধারণ বাঙালির বিনোদনের উপায় হিসাব চলে আসছিলো। এই কিছুদিন পূর্বেও গ্রামাঞ্চলে পুরানো আমলের খেলাধূলার চর্চা ছিলো।*বাংলাদেশের লোকাকাহিনী* দ্বিতীয় খণ্ডের 'মতিলাল বাশ্‌শা' কাহিনীতে ষোল গুঁটি পাইতের খেলার কথা উল্লেখ আছে। গ্রামাঞ্চলে ষোলগুটি এবং পাইতের আলাদা দুটো খেলা এখনো প্রচলিত আছে।

যশোর জেলার কিংবদন্তী (দ্বিতীয় পর্ব)-এর 'অমানুষের মধ্যে মানুষ' কাহিনীতে লাঠি খেলা, তরবারী খেলা ইত্যাদির উল্লেখ আছে। লাঠি খেলা ছিলো বাঙালির জনপ্রিয় একটি খেলা। এ খেলাটি এখন গ্রামাঞ্চলে কদাচিত দেখা যায়।

বাংলাদেশের লোককাহিনী দ্বিতীয় খণ্ডের 'অকুলবকুল'-এ সাত ডাকাতের বোনের সাথে উজির-পুত্র ঘনিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করে "ফুলদোল" খেলার প্রস্তাব দেয়।

কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী দ্বিতীয় খণ্ডের 'চিঙ্গিজান বাদশা' কাহিনীতে মালঞ্চী কন্যার তিনটি যাদুকে বলা হয়েছে 'তিনটি খেলা'। 'সোনাফর বাদশা' কাহিনীতে দেহ বদলের যাদুর নাম 'কাকাদরী খেলা' বলে জানা যায়। দুটো কাহিনীতেই যাদুকে খেলা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের হাটে বাজারে এখনো দেখা যায় যাদুকররা যাদু দেখিয়ে লোকের মনোরঞ্জন করছে, বিনিময়ে দর্শকরা যার যার ক্ষমতা অনুযায়ী টাকা পয়সা দিচ্ছে। সম্ভবত, ক্ষতিকর নয় এমন যাদু সাধারণ মানুষের চিত্ত বিনোদনের জন্য খেলা হিসাবেই দেখানো হতো।

আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, অধিকাংশ লোককাহিনীই প্রাচীন ও মধ্যযুগে সৃষ্ট। তাই লোককাহিনীতে বাঙালির শিল্প-চর্চা সম্পর্কিত তথ্যও কম। কারণ সে সময় শিল্প-কলার বিচিত্র বিকাশ ঘটেনি। আধুনিক যুগে শিল্প-কলার যে সব মাধ্যম দেখা দিয়েছে প্রাচীন কালে তার অস্তিত্ব ছিলো না। তখন ব্যবহারিক শিল্প-কলা ছিলো সবচেয়ে প্রচলিত। তার পাশাপাশি সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সাহিত্য ইত্যাদির বিকাশ ঘটলেও এগুলো অনেকাংশে কোর্ট-কালচার বা দরবারী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ছিলো। একমাত্র সঙ্গীতই সাধারণ মানুষের বিষয় হয়ে হয়ে উঠেছিলো। এ ছাড়া ব্যবহারিক শিল্প-কলা ছিলো গণ-মানসের কাছাকাছি। প্রয়োজনের তাগিদে গড়ে উঠা এই শিল্প এখনো সাধারণ বাঙালির জিনিস । তাঁত-শিল্প, নকশি কাঁথা, মৃৎ শিল্প, কাঠ-শিল্প, অলংকার -শিল্প--এই সব মিলিয়েই আধুনিক বাঙালির হস্তশিল্প---যার মধ্যে এখনো বেঁচে আছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালি সমাজের শিল্প-চর্চার ঐতিহ্য ও গৌরব।

[১] না জানিয়া পণ্ডিত *বাংলাদেশের লোককাহিনী* প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ-৪১।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

বাংলা লোককাহিনী ও বাঙালির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা লোককাহিনী ও বাঙালির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য

একটি জাতি বা মানবগোষ্ঠীর জীবন-যাপন পদ্ধতি, অতীত-ঐতিহ্য ও চিন্তা-চেতনার সামগ্রিক রূপ খুঁজে পাওয়া যায় তার সংস্কৃতিতে। সেই মানবগোষ্ঠীর সমাজ-কাঠামো, আচার-প্রথা, সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক, উৎপাদন-ব্যবস্থা, গৃহ-নির্মাণকলা, পোষাক-আশাক, খাদ্যাভ্যাস এবং তার মানস সম্পদ--শিল্প-সাহিত্য, অধ্যাত্মবোধ, নৈতিকতা সব এক সর্বজনীন রূপের অনুবর্তী হয়ে প্রকাশ পায় সংস্কৃতিতে। এ জন্য কেউ কেউ সংস্কৃতিতে বলেছেন জীবনের প্রকাশিত রূপ।[১]

তাহলে প্রশ্ন আসে সংস্কৃতি কি কেবলই একটি নিষ্ক্রিয় বিষয় ? আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক ও ভৌগলিক পরিপার্শ্বের মধ্যে জীবন যেভাবে যাপিত হয় সেভাবেই কি নির্মিত হয় তার সংস্কৃতি ? তাহলে কোন একটি জাতি বা মানবগোষ্ঠীর বিকাশে ও তার প্রাত্যহিক জীবনে সংস্কৃতির ভূমিকা কি ?

মানব সভ্যতার ইতিহাসের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে সংস্কৃতি কেবল নিষ্ক্রিয় প্রকাশরূপে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সংস্কৃতি যেমন জীবনের প্রকাশরূপ--সভ্যতার সার-নির্যাস, তেমনি তা সভ্যতার প্রভাবক বা অনুঘটকও। সংস্কৃতির সাথে মানুষের জীবনের সমস্ত বিষয়ের মিথষ্ক্রিয়ার একটি দিক রয়ে গেছে। অর্থাৎ সংস্কৃতি তার প্রভাবককেও প্রভাবিত করে।

আদিম মানুষ তার বৈরি পরিবেশ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একদিন গৃহ নির্মাণ করে দল বেঁধে বসবাস শুরু করে। তার বাস গৃহের কারু-কাজের মধ্যে, বারান্দা ও আঙ্গিনার বিন্যাস ও পরিচ্ছন্নতার ভেতর সৌন্দর্য বা ভালোলাগার বোধ উপলব্ধি করার পর তার বাসগৃহের ঐ নির্দিষ্ট ধরণটি বংশ পরম্পরায় অব্যাহত থাকতে শুরু করে। এ-ই তার বাসস্থানের সংস্কৃতি। বাসস্থান সম্পর্কিত এই সৌন্দর্যবোধ বা ভালোলাগার বোধ তার পরবর্তী প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে জন্ম দিয়েছিলো ঐ নির্দিষ্ট ধাঁচের গৃহনির্মাণ ও আঙ্গিনা বিন্যাসের ঝোঁক। এবং এর ফলে গৃহ-নির্মাণের এই সংস্কৃতি যেমন স্থায়িত্ব পায় তেমনি সংশ্লিষ্ট মানব-গোষ্ঠীটির গৃহ-সংস্থান কৌশল ঐ সংস্কৃতির সাথে সাজুয্যপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ক্রমশ উন্নততর হতে থাকে। অন্য দিকে, ভালোলাগা বা মন্দলাগার বোধ গৃহের অবস্থান ও পরিবেশ বাছাইয়েও প্রভাব ফেলে। এভাবেই সংস্কৃতি মানুষের জীবন যাপন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে শুরু করে। ক্রমে নৃ-তাত্ত্বিক, আর্থ-সামাজিক ও ভৌগলিক পরিবেশের কারণে এক একটি অঞ্চলের মানুষকে ঘিরে সংস্কৃতির ব্যবধান রচিত হয়। এক একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে সৃজিত হতে থাকে এক এক ধরণের সংস্কৃতি। এভাবে মানুষের সংস্কৃতি যত বিকশিত ও সংগঠিত হয়েছে তার প্রভাবন ক্ষমতাও ততবেশি বেড়েছে। আমরা দেখেছি বিশ শতকে এসে সংস্কৃতি বিচিত্র আগ্রাসনের সহায়ক উপায় হিসাবেও ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে আমেরিকাসহ পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর যে অপ্রতিরোধ্য প্রভাব তার পেছনে ভোগ-প্রধান পশ্চিমা সংস্কৃতির ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়।

সংস্কৃতির এ ক্ষমতা অনুধাবন করতে পারার কারণেই উনিশ ও বিশ শতকে প্রগতিশীল সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এ থেকে উপলব্ধি করা যায় সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব বিস্তারে সংস্কৃতি যেমন ব্যবহৃত হতে পারে তেমনি একটি জাতির মানস ও বৈষয়িক উন্নয়নেও তার সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কেননা সংস্কৃতি কেবল জীবন-যাপনের প্রকাশরূপ নয়, মানুষের বহু কর্মের প্রেরণাদাতা ও চালিকা শক্তি--ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সৌন্দর্য-অসৌন্দর্য প্রভৃতি বোধ-এর উৎসও।

---

[১] Humayun Kabir, *The Indian Heritage*, Bombay, 1962, P 37-38।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও চরিত্র গঠনে তার সাংস্কৃতিক পরিবেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গৃহ ও পরিপার্শ্ব, পারিবারিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ ও সামাজিক সম্পর্ক, আচার-প্রথা, বিনোদন, শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত, চলচ্চিত্র ও প্রচার মাধ্যম নতুন প্রজন্মের মানস গঠনে অপ্রতিরোধ্য প্রভাব ফেলে। তাই নৈতিকভাবে উন্নত এবং সর্বজনীন ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ কর্মতৎপর জাতি গঠনের জন্য অনুকুল সাংস্কৃতিক পরিবেশ প্রয়োজন। যে জাতির সংস্কৃতি (উন্নততর জাতিগুলোর তুলনায়) অবিকশিত, মানবতাবাদী-চিন্তা-বর্জিত, নীতিবোধহীন, ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থচিন্তায় আক্রান্ত সে জাতি দিন দিন অধপতনের দিকেই পিছিয়ে যাবে। জাতি হিসাবে বাঙালির অধপতনের জন্য সাংস্কৃতিক বিপর্যয় অনেকখানিই দায়ী।

১৭৫৭ সালের যুদ্ধ ও পালাবদলের মধ্য দিয়ে ইংরেজরা এদেশের শাসন ক্ষমতা দখল করার পর ইংরেজদের ঘৃণা ও উপেক্ষা, শোষণ-নির্যাতন, পৃষ্ঠপোষণের অভাব ইত্যাদি মিলিয়ে যে বৈরি পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাতে বাঙালি সংস্কৃতির স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ হয়ে যায়।[১] ইংরেজরা স্বার্থ উদ্ধার ও শোষণ-শাসন পাকাপোক্ত করার জন্য ক্রমে প্রশাসন, ব্যবসা-বানিজ্য ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে স্বার্থান্ধ বাঙালিদের নিয়ে একটি মোসাহেব শ্রেণীর সৃষ্টি করে। এ শ্রেণীর বাঙালিরা তাদের ব্যক্তিস্বার্থকেই বড় করে দেখতো। দেশপ্রেম, স্বাধিকারবোধ, স্বজাত্যভিমান বিসর্জন দিয়ে তারা ইংরেজদের সহযোগিতা করার মাধ্যমে ক্রমে অর্থ-বিত্তের মালিক হয়ে সমাজের উপরতলায় অবস্থান গ্রহণ করে। এরা এবং এদের বংশধররাই পরবর্তী ষাট/সত্তর বছর বাঙালির রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতির প্রবক্তা-পৃষ্ঠপোষক হিসাবে অধিষ্ঠিত ছিলো। এদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালি সংস্কৃতি পরিবর্তিত-বিবর্তিত হয়ে যে রূপ গ্রহণ করে তা ব্যক্তি-স্বার্থের বাহক, স্থুল ভোগবাদী---জাতীয় মর্যাদা, ঐক্যবোধ ও সর্বজনীন উন্নয়নের পরিপন্থী।

অবশ্য এর পরবর্তী পর্যায়ে ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়ে শিক্ষিত, জ্ঞানানুরাগী, প্রতিভাবান বাঙালিরা সমাজ সংস্কার ও ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন এবং আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতিকে নব-পর্যায়ে উন্নীত করেন। তবে এ সময় অন্য দু'একটি বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিভেদের বীজও রোপিত হয়। একদিকে ইউরোপ আমেরিকার সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণে প্রবণতা অন্যদিকে, সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের চিন্তা বর্জন করে রক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে আত্মবৃত্তে অবস্থানের চিন্তাভাবনা আমাদের সংস্কৃতির যথাযথ বিকাশ বাধাগ্রস্ত করেছে। এ সময় বাঙালির জাতীয় জীবনে সবচেয়ে তীব্র যে ক্ষয়ের সূচনা হয় তা ছিলো সংস্কৃতির প্রশ্নে ধর্ম-কেন্দ্রিক বিপরীতমুখী দুটি চিন্তাস্রোতের জন্ম।

ধর্ম কেন্দ্রিক ব্যবধানজনিত কারণে আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় নিয়ে যে টানাপোড়েন শুরু হয়েছিলো তা প্রথম থেকেই আমাদের জাতীয় ঐক্যবোধ বিনষ্ট করে ফেলেছিলো। সেই সাংস্কৃতিক বিরোধ বা পার্থক্যবোধের জের উনিশ শতক থেকে বিশ শতক পর্যন্ত গড়িয়েছে। এমনকি বলা যায় বাঙালি মুসলমানের মধ্যে সংস্কৃতি সম্পর্কিত মানস-পার্থক্য এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং এখনো তা জাতীয় শক্তি ও সামর্থ্যকে দ্বিধা-বিভক্ত করে আমাদেরকে পেছনে টেনে রাখছে।

সাংস্কৃতিক পরিচয় নিয়ে দীর্ঘ সময়ের বিতর্কের কারণে আমাদের নতুন প্রজন্মের নাগরিকদের মধ্যে সর্বজনীন সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ জাগিয়ে তোলার মত সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ হয়েছে কম। বৃটিশ আমল থেকেই সুযোগ সন্ধান, বৈধ-অবৈধ উপায়ে ব্যক্তি-স্বার্থ হাসিলকরণ, মিথ্যাচার, অর্থহীন ঈর্ষা, লোভ, সন্দেহ, অবিশ্বাস প্রভৃতি আমাদের জাতীয় চরিত্রের অঙ্গীভূত হয়। এর বিপরীতে এখনো সম্মিলিত ও জাতীয় স্বার্থ-চিন্তা, সত্য ও শুভ চিন্তার সংস্কৃতি আমরা সৃষ্টি করতে পারিনি। ফলত জাতি হিসাবে আমাদের আজকের দুর্বলতার অনেকখানি সাংস্কৃতিক জীবনের ব্যর্থতার ফল।

সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রশ্নে দ্বিধা-বিভক্তি, সন্দেহ, বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে হরেক রকম বক্তব্য একটা সময়ে গোটা জাতিকেই বিভ্রান্ত করে ফেলে। নিজ নিজ বক্তব্যের সমর্থনে নিত্য-নতুন তথ্য ও তত্ত্বের উদ্ভাবনও হয়েছে সাংস্কৃতিক প্রবক্তাদের মধ্যে। এ ধরণের বক্তব্যও দেখা দেয় যে, বাঙালির সংস্কৃতি হলো আসলে বহু

[১] গোপাল হালদার, *সংস্কৃতির রূপান্তর*, মুক্তধারা ১৯৭৪, ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য ।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতির সংমিশ্রণ মাত্র; বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি বলে কিছু নেই। এ বিষয়ে আর্য সংস্কৃতির প্রাধান্যের দাবীও একসময় প্রবলতর হয়ে দেখা দিয়েছিলো। এ সময় আমাদের সাংস্কৃতিক পরিশুদ্ধির অভিযানে বিসর্জিত হয়েছে অনেক খাঁটি দেশীয় উপাদানও। এই সমস্ত কারণ মিলিয়ে সংস্কৃতির প্রশ্নে আমাদের মধ্যে এক ধরণের হীনমন্যতাবোধও জন্ম নেয়। এভাবে গোটা সাংস্কৃতিক পরিবেশেটিই জাতীয় উন্নয়ন ও মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনার পরিপন্থী হয়ে দাড়াঁয়।

ইংরেজ আমলের শেষ দিকে নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রাচীন লিখিত সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে সব তথ্য উদঘাটিত হয়েছে তা থেকে দেখা যায় জাতি হিসাবে বাঙালি দীর্ঘ ঐতিহ্যের অধিকারী। তার আছে এক ঋদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস। এও সত্য যে প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগের প্রারম্ভ পর্যন্ত বিভিন্ন জাতি-ধর্মের মানুষ এদেশে এসে আবাস স্থাপন করেছে, শাসন-শোষণ করেছে। তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রভাবিত করেছে আমাদের সংস্কৃতিকে। কিন্তু এতে বাঙালি সংস্কৃতি বর্জিত হয়নি, নতুন কিছু বৈশিষ্ট গ্রহণ করেছে মাত্র।

আদি ও মধ্যযুগে বাঙালি সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো সৃজিত হয়েছে সাধারণ মানুষের স্বত:স্ফূর্ত আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে। এই সাধারণ মানুষগুলো ছিলো অনেকাংশে খাঁটি বাঙালি, বিশেষ করে আদিযুগে। এ জন্য তাদের সংস্কৃতির মধ্যে খাঁটি বাঙালি উপাদানও বেশি। ঐ সময়ের বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা নি:সন্দেহে কঠিন কাজ। তবে দীনেশচন্দ্র সেন, নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখের মত কেউ কেউ বিভিন্ন উৎস যেমন ––নৃ-তত্ত্ব, পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, ইতিহাসের উপাদান এবং লিখিত সাহিত্যের তথ্য বিশ্লেষণ করে আদি ও মধ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় লাভের চেষ্টা করেছেন। তাদের কেউ মৌখিক সাহিত্যের প্রতি তেমন নজর দেননি। কিন্তু লোককাহিনী, ছড়া, লোকসঙ্গীত ইত্যাদি মৌখিক সাহিত্য বাঙালি সংস্কৃতির সমৃদ্ধ তথ্য-প্রমাণ বহন করে এসেছে দীর্ঘকাল ধরে। মৌখিক সাহিত্যে প্রতিফলিত সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে সযত্ন ও ব্যাপক আকারে গবেষণা হলে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নির্ণয়ে সে সব উপাদান আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযোজিত করতে পারে।

বর্তমান গবেষণায় লোককাহিনীতে বাঙালি সংস্কৃতির উপাদান অনুসন্ধান করতে গিয়ে এমন অনেক তথ্য পাওয়া গেছে যা আমাদের পূর্ববর্তী ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে। যেমন স্বয়ম্বর প্রথা সম্পর্কে আমাদের ধারণা হলো এটি আর্য হিন্দুদের বৈবাহিক প্রথা। কিন্তু এমন কয়েকটি লোককাহিনী পাওয়া গেছে যেগুলোর উৎপত্তি বাংলাদেশে আর্যদের প্রভাব বিস্তারের পূর্বের ব্যাপার বলে আন্দাজ করা যায়।[১] তাছাড়া এসব কাহিনীর অন্যান্য উপাদান বিশ্লেষণ করে জানা যায় এগুলোর উৎপত্তি এই বাংলাদেশেই। এ থেকে উপলব্ধি করা যায় স্বয়ম্বর প্রথা আদি বাঙালির সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বিষয় এবং সম্ভবত পরবর্তী কালে তাদের নিকট থেকেই আর্যরা এই বৈবাহিক প্রথাটি অর্জন করেছে। কোন কোন পণ্ডিতও এ মত সমর্থন করেন।[২] আদিযুগের বাঙালির রাজ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায় যা প্রচলিত ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বাঙালির নৈতিকতা সম্পর্কেও কিছু বিপরীতধর্মী তথ্য আমাদের প্রচলিত সাংস্কৃতিক ধারণাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে। লোককাহিনীতে বাঙালির যে নৈতিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা অপরাপর জাতির নৈতিক বৈশিষ্ট থেকে নানা দিক দিয়ে স্বতন্ত্র।

বর্তমান গবেষণায় ৬২২টি লোককাহিনীর তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর বাইরে রয়ে গেছে বহুসংখ্যক মুদ্রিত ও অমুদ্রিত কাহিনী এবং তাদের পাঠান্তর। সে সব কাহিনী বিশ্লেষণ করলে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক তথ্য ও উপাদান পাওয়া যাবে। তার সাথে নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, লিখিত সাহিত্য, বিদেশীদের রচনা মিলিয়ে পাঠ করলে বাঙালির সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক জীবনের সামগ্রিক পরিচয় লাভ সম্ভব হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সেই সাথে আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে দীর্ঘদিনের বিতর্ক, হীনমন্যতাবোধ, বিভেদ কাটিয়ে উঠে সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ সৃষ্টি করা সহজ হবে। জাতীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টির প্রয়োজনে লোকসাহিত্য ও লোক-সংস্কৃতির অনেক উপাদান কাজে লাগতে পারে।

---

[১] মোহাম্মদ সাইদুর, শিয়াল্যা ও রাজকন্যার কিস্‌সা, *লোকসাহিত্য সংকলন- ৩০ খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ।

[২] Benjamin Walker, *Hindu World Vol-II*, George Allan and Unwin Ltd. London 1968, p-468।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি জাতির উন্নয়নের পেছনে অন্যান্য বিষয়ের সাথে তাদের সাংস্কৃতিক একতাবোধ ও অহংবোধও অনেকখানি প্রেরণা যোগায়। কোন জাতির সংস্কৃতি নিয়ে যদি সন্দেহ, হীনমন্যতাবোধ, বিতর্ক থাকে তাহলে সে জাতির প্রাণশক্তি ও জাতীয় চিন্তাচেতনা হয়ে পড়ে বিভক্ত, জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রেরণা সেখানে থাকে না। বাঙলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনে এ সমস্যা দীর্ঘ দিনের; এবং বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এ বিশৃঙ্খলার সূত্র ধরেই আমাদের সমাজে জায়গা করে নিয়েছে অসুস্থ সাংস্কৃতিক প্রবণতাসমূহ। দেশের সকল মানুষের মধ্যে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের অনুকূল মানবতাবাদী সাংস্কৃতিক চিন্তা-ভাবনা ও চর্চা শুরু হলে বাঙালি জাতির বর্তমান পতন রোধ করার পথ অনেক সহজ হয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

মূল লোককাহিনী সংগ্রহ: সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

আনোয়ার হোসেন খান : *লোকসাহিত্য সংকলন- ৩২শ খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

আশরাফ সিদ্দিকী : *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫।

: *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী*, দ্বিতীয় খণ্ড বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫।

কিংবদন্তির বাংলা, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ঢাকা, ১৩৮২।

এ. কে. এম. যাকারিয়া *গ্রাম বাংলার হাসির গল্প*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৫।

খোদেজা খাতুন *বগুড়ার লোকসাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭০।

জসীম উদ্‌দীন *বাঙ্গালীর হাসির গল্প*, প্রথম খণ্ড, তিতাস বুক, ঢাকা, ১৯৬০।

দেওয়ান গোলাম মোর্তজা *গৈ-গেরামের গল্পের আসর*, ফারযানা প্রকাশনী, হবিগঞ্জ, ১৯৮৯।

নুরুল আলম খান ও সৈকত আসগর : *মানিকগঞ্জ জেলার লোকসাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড)* মানিকগঞ্জ জেলা সাহিত্য পরিষদ, মানিকগঞ্জ, ১৯৮৯।

নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী : *বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি: কথকতা* ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬।

মযহারুল ইসলাম : *পূর্ব-পাকিস্তানী লোককাহিনী* রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন : *শিরনী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮১।

মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান *বাংলাদেশের লোককাহিনী*, প্রথম খণ্ড, নরসিংদী গ্রন্থ সুহৃদ প্রকাশনী, নরসিংদী, ১৯৯৬।

: *বাংলাদেশের লোককাহিনী*, দ্বিতীয় খণ্ড, নেত্রকোনা গ্রন্থ সুহৃদ প্রকাশনী, নরসিংদী, ১৯৯৭।

: *বাংলাদেশের লোককাহিনী*, তৃতীয় খণ্ড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গ্রন্থ সুহৃদ প্রকাশনী, নরসিংদী, ১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

মোমেন চৌধুরী ও জান্নাতুন আরা আহমেদ : *লোকসাহিত্য সংকলন*, ২৪শ খণ্ড
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম : *লোকসাহিত্য সংকলন*, ৩য় খণ্ড
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৭১।

: *লোকসাহিত্য সংকলন*, ৬ষ্ঠ খণ্ড
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৬।

: *লোকসাহিত্য সংকলন*, ৮ম খণ্ড
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯।

মোহাম্মদ ইসহাক আলী : *লোকসাহিত্য সংকলন*, ৪২শ খণ্ড
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান *ঢাকার লোককাহিনী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,
দ্বিতীয় প্রকাশ- প্রথম পুনর্মুদ্রণ-১৯৯২।

যশোরের লোককাহিনী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪।

লোকসাহিত্য সংকলন, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৭০।

মোহাম্মদ সাইদুর *লোকসাহিত্য সংকলন*, ৩০শ খণ্ড
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন ও সৈকত আসগর *বরিশাল জেলার লোকসাহিত্য*
ফোকলোর ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৯।

রওশন ইজদানী *মোমেনশাহীর লোক-সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৬৪।

শামসুল ইসলাম *ভাটিদেশের কিংবদন্তী*, বুক সোসাইটি, ঢাকা, ১৩৮৬।

বাংলাদেশের কিংবদন্তী, বুক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৭৬।

শাহিদা খাতুন ও ইসহাক আলী *ফোকলোর সংকলন*-৭১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮।

হোসেন উদ্দিন হোসেন : *যশোর জেলার কিংবদন্তী* (দ্বিতীয় পর্ব),
বুক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

আতোয়ার রহমান : *লোকসাহিত্যের কথা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪।

আবদুল হাফিজ : *বাঙলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫।

: *লোককাহিনীর দিক-দিগন্ত*, দ্বিতীয় সংস্করণ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬।

: *লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪।

আবদুস সাত্তার : *গারোদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮০।

আবুল আহসান চৌধুরী : *লোকসংস্কৃতি বিবেচনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

আলমগীর জলীল : বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতি, ব্রাক, ঢাকা, ১৯৮৫।

আশরাফ সিদ্দিকী : *লোকসাহিত্য* প্রথমখন্ড, পরিমার্জিত সংস্করণ, মল্লিকব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৪।

: *আবহমান বাংলা*, বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদ, ঢাকা, ১৯৮৭।

: *লোকায়ত বাংলা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮।

আশুতোষ ভট্টচার্য : *বাংলার লোকসাহিত্য* প্রথমখন্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ২য় সংস্করন, ১৯৫৭।

ওয়াকিল আহমদ : *বাংলার লোকসংস্কৃতি* , বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪।

খগেশ কিরণ তালুকদার : *বাংলাদেশের লোকায়ত শিল্পকলা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭

তোফায়েল আহমদ : *লোক-শিল্প*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

মফিজুল ইসলাম : *লোককাহিনী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

মযহারুল ইসলাম : *ফোকলোরঃ পরিচিতি ও পঠন-পাঠন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। দ্বিতীয় সংস্করন -প্রথম পুনর্মুদ্রন, ১৯৯৩।

মুহম্মদ আবদুল খালেক: : *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক-উপাদান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

রওশন ইজদানী : *মোমেনশাহীর লোক-সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	:	*লোকসাহিত্য*, রবীন্দ্র-রচনাবলী- ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩৬৫, বিশ্বভারতী, ভারত।
শামসুজ্জামান খান ও মোমেন চৌধুরী	:	*বাংলাদেশের ফোকলোর রচনাপঞ্জী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭।
Alen Dundes	:	*The Study of Folklore*, Barkely, 1965.
Alexander H. Krappe	:	*The Science of Folklore*, Macmillan & Co. Ltd. London, 1951.
Archar Taylor	:	*Folklore and the Student of Literature*, Vol-2 Pacific Spectator, 1948.
Mazharul Islam	:	*Folklore: The Pulse of the People*, Concept Publishing Co, Newdelhi, 1985.
	:	*A History of Folktale Collections*, Bangla Academy, Dhaka, 1970.
Richard M. Dorson	:	*American Folklore*, Chicago, 1959.
Stith Thompson	:	*The Folktale*, Dryden Press, NewYork,1951.
T. W. Rhys Davids	:	*Buddist Birth Stories*, London, 1878.

সহায়ক গ্রন্থাবলী

অখিল বন্ধু সাহা	:	*সাংখ্য দর্শন ও ন্যায় দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২।
অজয় রায়	:	*বাঙলা ও বাঙালী*, খান ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৩৭৬।
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	:	*বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত* মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লি., কলিকাতা, ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

আনিসুজ্জমান : *স্বরূপের সন্ধানে*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া : *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪।

এবনে গোলাম সামাদ : *নৃতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২।

এম. এ. রহিম : *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*,
অনু: মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান,বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২।

গোপাল হালদার : *সংস্কৃতির রূপান্তর*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৪।

জে. ম্যানচিপ হোয়াইট : *নৃ-তত্ত্বের সহজ পাঠ*, অনু- মাহমুদা ইসলাম
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২।

নীহাররঞ্জন রায় : *বাঙালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব
প্রথম দেজ সংস্করণ, কলকাতা, বৈশাখ, ১৪০০।

: *বাঙালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব
(সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষেপিত সংস্করণ)
নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি., কলিকাতা
দ্বিতীয় সংস্করন, ১৯৮৩।

বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর : *বাংলাদেশের লোক-শিল্প*, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮২।

মমতাজুর রহমান তরফদার : *বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ ও সম্ভাবনা*, বাংলা একাডেমী,
ঢাকা, ১৯৯৪।

মুহম্মদ আবদুল হাই
ও আহমদ শরীফ : *মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৪০২।

মুহম্মদ এনামুল হক : *মণীষা-মঞ্জুষা* প্রথম খন্ড, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৫।

: *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা,
দ্বিতীয় সংস্করন, ১৯৬৫।

: *পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলাম প্রচার*, আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৪৮।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, মাওলা ব্রাদার্স , ঢাকা, ১৯৯৮।

মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান : *প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন: উয়ারী-বটেশ্বর*,
গ্রন্থ-সুহৃদ প্রকাশনী, নরসিংদী, ১৯৮৯।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : *বাংলা ও বাংগালী, মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা*
সৃজন প্রকাশনী লি, ঢাকা, ১৩৯৭।

রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পা) : *বাংলাদেশের ইতিহাস* আদিযুগ
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লি:, কলিকাতা
পঞ্চম সংস্করন, ১৯৭১ ।

Dhaka University Institutional Repository

রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পা) : *বাংলাদেশের ইতিহাস* মধ্যযুগ
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স, প্রাইভেট লি:, কলিকাতা
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করন, ১৩৮০ ।

রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় : *বাঙ্গালার ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা
পুনর্বিন্যস্ত দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪০২।

: *বাঙ্গালার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত।

শহীদুল্লাহ মৃধা : *মহাস্থবীর শীলভদ্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪।

সি.সি. বন্দোপাধ্যায় (সম্পা) : *রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরান* , কলিকাতা, ১৩৩৬।

সুকুমার সেন : *ভাষার ইতিবৃত্ত*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা, ১৯৯৪।

: *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, ১৪০২।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : *ভারত সংস্কৃতি*, কলিকাতা, ১৩৭০।

সৈয়দমোহাম্মদ শাহেদ : *ছড়ায় বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি*
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা , ১৯৮৮।

Benjamin Walker : *The Hindu World* Vol-I & II,
Allen and Unwin Ltd, London, 1968.

B. S. Guha : *An outline of Racial Ethnology in India*
Calcutta Asiatic Soceity of Bengal, 1873.

Claude Levi-Strauss : *Structural Anthropology*, Vol-2,
Penguin Books, 1978.

D. N. Majumdar : *Races and Culture of India*, Bombay, 1961.

E. B. Tylor : *Primitive Culture*, London, 1873.

Edward Wester Mark : *The History of Human Marriage*,
London, 1901.

George James Frazer : *The Golden Bough*, Vol-1,
Macmillan & Co. Ltd, London, 1960

Henry Luis Morgan : *Ancient Society*, London, 1877.

Herbert Risley : *The People of India*, Thacker Spink & Co.
Calcutta, 1908.

Dhaka University Institutional Repository

Humayun Kabir : *The Indian Heritage*, Bombay, 1962.

Ibn Battuta : *Travels in Asia & Africa.*
Routledge & Kegan Pual Ltd. London, 1953

Kamruddin Ahmed : *A Social History of East Pakistan.*
Crescent Book Centre, Dhaka, 1967.

M. J. Harscovits : *Man and His Works*, NewYork, 1948.

Martin Heidegger : *On Way to the Language*, Happer & Row, 1971.

Rama Prasad Chanda : *The Indo-Aryan Races,*
Rajshahi Varendra Research Society, 1916.

Raymond Williams : *Problems in Materialism & Culture*
Verso, London, 1982.

Roland Berth : *To write an Intransative Verb*
Maclay and Donald, Paris/London, 1972.

Sonia Cole : *The Neolithic Revolution,*
British Museum, London, 1970.

পত্র-পত্রিকা, সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ

কর্ষণ। অক্টোবর ২০০০; আবুল কাসেম ফজলুল হক, *সংস্কৃতি: পুরাতন ও নতুন নিরিখে* ।

বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পত্রিকা, ঢাকা। প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শরৎ ১৩৭৭; ওয়াকিল আহমদ, *রাজপ্রশস্তি ও দরবার সংস্কৃতি।*

লোকায়ত, ঢাকা। ষোড়শ বর্ষ - চতুর্থ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮; আবুল কাসেম ফজলুল হক, *পঁচিশ বছরের সংস্কৃতি চর্চা।*

সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পঁয়ত্রিশ বর্ষ - তৃতীয় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৯৯; মনোয়ারা হোসেন, *চর্যাপদের শব্দ : উৎস পর্যালোচনা।*

সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আটত্রিশ বর্ষ -তৃতীয় সংখ্যা, আষাঢ় ১৪০২; রফিকুল ইসলাম, *বাংলা ভাষায় অনার্য শব্দ* ।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আটত্রিশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্তিক ১৪০১; ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসাহিত্য: শতাব্দীর সাধনা*।

সাহিত্যিকী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৭৪; আব্দুল হাফিজ, *যাদুবিদ্যার যুগ-যুগান্ত*।

জাতীয় সংস্কৃতি কমিশন রিপোর্ট ১৯৮৯, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়।

Journal of the Asiatic Society of Bengal, Dhaka. Vol-4 No-1, June 1995; Syed Jamil Ahmed, *Buddhist Theatre in Ancient Bengal.*

New Literary History, John Hopkins University, USA. Vol-23 No-3, Summer 1992; Maria Sevtsova, *Dialogism in the Novel and Bakhtin's Theory of Culture.*

Encyclopaedia of Social Sciences, Vol-10, The Macmillan & Co. Ltd. London, 1951.